সওদা

গোরাচাঁদ মিত্র

শঙ্খ প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন, ১৩৭১

প্রকাশক
মনোরঞ্জন মজুমদার
শঙ্খ প্রকাশন
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর
শ্রীনিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

খড়ের মানুষ

মনে পড়ে খুব ছেলেবেলায় আমরা সবাই মিলে একবার চড়ুইভাতি করতে গিয়েছিলাম। বরদা ভবনের আমাদের সেই প্রথম আর সেটাই শেষ চড়ুইভাতি ছিল। ডায়মণ্ডহারবারের কাছাকাছি, নদীর ধারে জায়গা, আমার বাবাই ব্যবস্থা করেছিলেন। বাবা তখন মাঝেমাঝেই ডায়মণ্ডহারবার যেতেন। সেখান থেকে কাকদ্বীপ, নামখানা, ক্যানিং মৌসুনী, বাঘডাঙা, ফ্রেজারগঞ্জ, আরও অনেক দ্বীপে যেতেন তিনি।

জয়কালীমাতা প্রেসের মালিক বটকৃষ্ণ নস্করের প্রেস ছাড়াও অনেক রকম ব্যবসা ছিল। কিছু কিছু দ্বীপে ওঁর ধানজমি ছিল। মাছের ভেড়ি ছিল। বাবা মাঝে মাঝে বলতেন আমাদের একটা বিঘে পাঁচেক ধানজমি থাকলে কত ভালো হত। আমাদের তিনপুরুষ কলকাতায়, ঠাকুরদা বদ্যিনাথ চাটুজ্যে একসময় কিছুটা ধানজমির জন্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আমরা বেশি দিন দখল রাখতে পারিনি। বসিরহাটের কাছে একটা বাগানবাড়ি ছিল তাঁর। শেষ বয়সে সেই বিঘে পনেরর বাগানবাড়িটা বেচে দিয়ে একটা সূতো রঙ করার কারখানা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। বাবা আর কাকা মিলে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে বদ্যিনাথকে ক্ষান্ত করেছিলেন।

আসলে আমাদের মনটা বরাবরই ব্যবসাপত্রের দিকে। তবুও রক্তে কিছু বাসনা থেকে যায় জোতজমির বাগানবাড়ির। ঠাকুরদার বাবা ঈশ্বর বরদাকান্ত চাটুজ্জের নাকি বন্ধকীর ব্যবসাও ছিল। বরদাকান্তই টালার কাছে গোঁসাই পাড়া বাই লেনে বরদা ভবন প্রতিষ্ঠা করেন বাংলা ১২৭৩ সনে। বরদা চাটুজ্জে কোম্পানির জাহাজ ঘাটে পাটের দালালি করতেন। তাঁর ধানজমি ছিল না বটে, ধানচালের ব্যবসা ছিল। বাবা অবশ্য বলতেন বামুনের ব্যবসা হয় না, এক যজমানি ছাড়া।

সেবার চড়ুইভাতিতে বরদা ভবন থেকে আমরা প্রায় সবাই গিয়েছিলাম। সবাই বলতে আমি আর আমার যমজ ভাই বিদেশ। আমার আপন কাকা প্রাণনাথ আর ছোট খুড়ী সোহাগবালা। বাবা মায়ের একমাত্র মেয়ে আর চারটেই ছেলে বলে ছোট খুড়ীর বাবা মা নাম দিয়েছিল সোহাগবালা। ছোট খুড়ী নিজে আমার মাকে এ কথা বলেছে।

আমার মা সারাদিন প্রচুর খাটত সংসারের জন্য। তখনও প্রাণকাকার সঙ্গে আমাদের বরদা ভবনের অংশ ভাগাভাগি হয়নি, দুটো পরিবারের হাঁড়ি আলাদা হয়ে যায়নি। প্রাণকাকা আমার বাবার চেয়ে বয়সে দু বছরের ছোট। শুনেছি আমাদের এক পিসী ছিল, আপন পিসী, বাবার মায়ের পেটের বোন। তাঁর নাকি মৃগীরোগ ছিল। আমাদের বাড়িতে একটা পুরনো অ্যালবাম আছে সেখানে পিসীর ছেলেবেলার, ফ্রক পরা, মাথায় লাল ফিতের ফুল বাঁধা ছবি আছে, বিয়ের ছবি আছে।

পিসীর যখন বিয়ে হয়, তখন পিসী খুব ছোট—বছর বারো তের বয়স। ঠাকুরদা গৌরীদানের পুণ্য অর্জন করেছিলেন। পিসীর চেয়ে বয়সে বছর কুড়ি বড় এক পাত্রের সঙ্গে পিসীর বিয়ে হয়েছিল। পড়তি জমিদার পরিবার কিন্তু পালটি ঘর। পিসীর কোষ্ঠীতে বৈধব্য-যোগ ছিল না, মা বলতেন।

বিয়ের এক বছরের মাথায় পুকুরে স্নান করতে গিয়েছে শাশুড়ীকে বলে, একাই গেছে, বেলা গড়িয়ে যায় পিসী ফেরে না। শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা ভয় পেয়ে পাড়াপড়শি ডাকে, তারা এসে পুকুরের জলে দাপাদাপি করে, প্রায় সন্ধের মুখে মাঝপুকুরে, সে পুকুর বিশাল পুকুর, মাঝখানে নাকি থৈ পাওয়া যায় না, একেবারে মাঝপুকুরে একজনের পায়ে শাড়ির আঁচল জড়িয়ে যায়। আঁচল ধরে টান দিতেই পিসী ভেসে ওঠে। মৃগীরোগ নিয়ে পিসী মাঝপুকুর পর্যন্ত সাঁতরে গিয়েছিল কিনা কেউ জানেনা।

মায়ের মুখেই এ গল্প শুনেছি। মা বলত, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলত, মরণ যখন ডাকে, তখন এমনই হয়। মরণ কী আমার মাকেও ওই ভাবেই ডেকেছিল, বরদা ভবনে আমাদের দরজায় এসে কড়া নেড়েছিল।

আমার খুড়িমা সোহাগবালা কাজকম্ম কিছুই করত না। পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকত। আমাকে না হলে বিদেশকে বলত, মাথার পাকা চুল তুলে দিতে, নয়ত পা টিপতে। মুকুল, প্রাণকাকার বড় ছেলে আমার চেয়ে এক বছরের ছোট। ও খুব চালাক ছিল। খুড়িমা মুকুল বলে ডাকাডাকি করলেও ও উত্তর দিত না, শুনতে পেলেও পা টিপে টিপে পালিয়ে যেত ছাদের ওপর। তারপর দুয়েক ঘণ্টা তার পাত্তাই পাওয়া যেত না। মুকুল যখন ভালো মেজাজে থাকত, তখন বলত মা ডাকলে যাস কেন, জানিস তো, পা টিপতে বলবে, নয়ত পাকাচুল তুলতে।

মুকুলের ছোট বোনের নাম পারুল। ও তখন অনেক ছোট। এরপরও মুকুলের একটা ভাই হয়েছিল, খুড়িমা বলত তাকে নাকি কার্তিক ঠাকুরের মত দেখতে ছিল। আমরা তাকে দেখিনি অবশ্য, সে তো হাসপাতালে জন্মের কয়েক ঘণ্টা পরেই মরে গিয়েছিল। দুবেলাই হাঁড়ি ঠেলতে হত বলে আমার মা অবশ্য খুড়িমার ওপর রাগ করত না, বলত শেষ বাচ্চাটা মারা যাবার পরই নাকি খুড়ি অসুস্থ হয়ে পড়ে, সূতিকা না কী যেন হয়েছিল। খুড়ি মাঝে মাঝে খুব ফুলে যেত, হাত-পা এত ফুলত যে মনে হত ফেটে যাবে। খুড়ি খুব ফর্সা ছিল। বলত ছেলেবেলায় দুধের সর আর হলুদ মেখে খুড়ি ফর্সা হয়েছে। আমার মায়ের গায়ের রঙ ফর্সা ছিল না। বিদেশ মাকে বলত তুমি দুধের সর আর হলুদ মাখ না কেন মা?

ফুলে উঠলে খুড়ি বলত, সারা শরীরে জল জমেছে। অমাবস্যা, পূর্ণিমায় যখন গঙ্গায় ভরা কোটাল, তখন নাকি বেশি জল জমত, খুড়িমা আরও বেশি ফুলে যেত, নিজের শরীরে নাকি জলস্রোত শুনতে পেত খুড়িমা। আমাদের আরও জোরে, গায়ের সব জোর দিয়ে গা হাত পা টিপতে হত। খুড়িমা খুশী হলে, মাঝেমাঝে আমাকে বাদাম, লজেন্স খাওয়ার পয়সা দিত। পুজোর সময় দুজনকেই একটা করে জামা দিত।

সেবার চড়ুইভাতিতে শরীর খারাপ নিয়েও খুড়িমা আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল। বাড়িতে কিছু না করলেও চড়ুইভাতিতে খুড়িমা নিজের হাতে মাংস রান্না করেছিল। আমার মা ছিল ঠাকুরবাড়ির মেয়ে, সে বাড়িতে নিয়মিত ঠাকুরের ভোগরাগ হত। মাকে কখনও মাংস খেতে দেখিনি, মুরগী তো বাড়িতে ঢুকতই না, খাসির মাংসও কদাচিৎ। আমার দাদু, মায়ের বাবা শ্যামাপদ স্মৃতিতীর্থ নামকরা পন্ডিত ছিলেন। যশোর না খুলনায় তাঁর টোলছিল। দেশভাগের পর বরাহনগরে একটা টোল খুলে কিছুদিন চালিয়েছিলেন। বেশিদিন চলেনি সে টোল। দিদিমা মারা যাবার পর তিনি বৃন্দাবনে চলে গিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁর দেহান্ত হয়। দাদুর একমাত্র সন্তান আমার মা মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিল প্রায় মাসখানেক পরে। দাদুরই এক যজমান চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল। আমাদের বাড়িতে নিরামিষই বেশি হয়, মাছ অল্পস্বল্প, মাংস হতই না। কদাচিৎ বাড়িতে মাংস রান্না হলেও, মা বলত, আমার রান্না কী সোহাগের মত হবে। আমার কিন্তু মায়ের রান্নাই ভাল লাগত, নিরামিষ রান্না। বাবা আর বিদেশ বলত, খুড়িমার রান্নাই ভাল।

ডায়মণ্ডহারবারের চড়ুইভাতিতে মুকুল আর পারুল তো ছিলই, মানুপিসীর মেয়ে মালতি আর বড় ছেলে শিবুদাও ছিল। শিবুদা আমাদের চেয়ে কয়েক বছরের বড়। মালতি আমার চেয়ে কয়েক বছরের ছোট। মানুপিসী বিধবা, সরু পাড়ের থান কাপড় পরতেন তিনি। মা-খুড়িমার মত লাল পেড়ে কাপড় পরতেন না। মানুপিসী আমাদের সঙ্গে ডায়মণ্ডহারবারে আসেনি।

খেতে বসে মা বলছিল, খারাপ লাগছে, ঠাকুরঝি এল না, এত করে বললুম। শিবুদা বলল, আমিও তো কত করে বললুম, দেখলে তো। মায়ের যখন যেটা মাথায় ঢোকে।

খুড়িমা বলল থামতো তোদের আবার বেশি বেশি। বিধবা মানুষ মাঠে ঘাটে বনবাদাড়ে খাওয়া দাওয়া নিয়ম-নিষেধ কিছু থাকত!

মালতি এতক্ষণ বেশ হাসিখুশি ছিল---পারুলের সঙ্গে, বিদেশের সঙ্গে খুনসুটি করছিল। হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। আর কেউ না দেখুক, আমি দেখেছি। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, বাবা এর পরে যখন চড়ুইভাতি হবে, তখন পিসীকে আনবে তো, মানুপিসীকে কিন্তু আনতেই হবে।

মালতির মুখ কালো হয়ে গেলে, আমি বিষণ্ণ হয়ে পড়ি। কতকাল আগের কথা, মালতি মুখ নীচু করে ভাত নাড়ছে আঙুল দিয়ে, ভাত নাড়ছে মুখে তুলছে না, মালতী তার থানপরা মায়ের কথা ভাবছে, আমার মন খারাপ হয়ে গেল। আমি কী মালতিকে সেই তখন থেকে ভালোবাসতাম। হয়তো বাসতাম! অন্য একরকমভাবে ভালোবাসতাম।

আমি হাসলাম, শুকনো প্রাজ্ঞ হাসি। তখন কী ভালোবাসা বোঝবার তোমার বয়স হয়েছে স্বদেশ! আমি আর আমার যমজ ভাই বিদেশ তখন ক্লাস থ্রিতে পড়তাম। বিদেশের সঙ্গে আমার মুখের আদলের অনেকটা মিল থাকলেও আমরা যাকে বলে আইডেনটিক্যাল টুইন ছিলাম না। আমি একটু দুবলা-পাতলা, বিদেশ গাট্টাগোট্টা। আমি সেই ছেলেবেলাতেও বেশ খানিকটা ভীতু-ভীতু, বিদেশ ডাকাবুকো বেপরোয়া। বিদেশও মালতিকে ভালোবাসত, আমি পরে জেনেছিলাম।

কার্তিকের সন্ধ্যায় বরদাভবনের ছাদে উঠে আকাশ প্রদীপ দেখাত মালতি। কাকে দেখাত, স্বর্গত বাবাকে? ফ্রকপরা বয়স তখনও ছুঁয়ে আছে মালতিকে, শাড়ি কদাচিৎ, তাও কখনও নেপথলিনের গন্ধ মাখা মানু পিসীর বিয়ের শাড়ি, কখনও প্রাণকাকার মেয়ে পারুলের কমদামি সিফন। সেদিন মানুপিসীর ফাটাফুটো গরদে আকাশপ্রদীপ দেখাতে মালতি ছাদে, আমি নিঃসাড়ে পিছুপিছু। কোথায় ঘাপটি মেরে বসেছিল বিদেশ ছাদে, কোনো অন্ধকার কোণে? আমি যখন সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসেছি আকাশপ্রদীপ মাটিতে গড়াচ্ছে। মালতির বেআব্রু পিছনে লেপটে ছিল বিদেশ—বিদেশই। রাতে পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে বিদেশ ছটফট করছিল, কষ্ট পাচ্ছিল, আমি বুঝেছিলাম বিদেশও মালতিকে ভালোবাসে!

আমি এখন ইউনিভার্সাল নার্সিং হোমে শুয়ে আছি, বিদেশ এখন অস্ট্রেলিয়ায়, এন আর আই—নন রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান। বিদেশ কী আর কখনও দেশে ফিরবে? পুরোপুরি ইনডিয়ান হবে, গোঁসাইপাড়া বাই লেনে আমাদের বরদা ভবনে ফিরে আসবে। ফিরে এলেও বরদা ভবন খুঁজে পাবেনা।

সন্ধে হচ্ছে। আমার কাঁচঘরে পর্দাটা সরানো, এটাই পশ্চিম দিক হবে। একটু আগেও আমি রুপোলি গোল সূর্যটাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। নীল কাঁচের এপাশ থেকে সূর্যকে নরম, বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। আকাশের কোলে একটা স্কাইস্ক্র্যাপার, তার ওপারে নিশ্চয়ই গঙ্গা, তারও পশ্চিমে সূর্য, রুপোলি থালার মত সূর্য। হঠাৎ ঝুপ করে সূর্য মালটিস্টোরিডের আড়ালে হারিয়ে গেল। আকাশটা লাল হয়ে গেল। আলোছায়াতে এটাকেই গোধূলি বলে হয়ত, টুইলাইট শান্ত নদীর বুকে একটা বিশাল গাধাবোট। লাল সূর্যের অস্তাভা পেছনে রেখে বাঁধের ওপর মালতির সিল্যুট স্কিপিং করছে। নদীতে প্রায় স্রোত নেই, অগ্রহায়ণের শেষ, নাকি পৌষের শুরু, শীতশীত, গাধাবোট বোঝাই খড়, আর বেশ কিছু মানুষ, ধূসর মানুষ, খুব কাছ থেকেই আমি দেখছিলাম তাদের, গাধাবোটের ধারে দাঁড়িয়ে বোধহয় আমাদেরই দেখছে। আমি বললাম কী বিরাট গাধাবোট বিদেশ দেখ দেখ খড় যাচ্ছে, বাবা এটা কি কলকাতা যাবে? আমরা এটায় যেতে পারি না?

বাবা বললেন, ওতে আমাদের উঠতেই দেবে না। আমি একটু ভয়ে ভয়েই বললাম, আমরা পয়সা দিলেও দেবেনা বাবা?

বিদেশও বোধহয় গাধাবোটে ভেসে ভেসে জোয়ারের টানে কলকাতা আসতে চাইছিল। বললেন, কেন দেবে না বাবা?

বাবা বলল, ওটা খড়ের মানুষদের বোট।

মালতি স্কিপিং থামিয়ে বড় বড় চোখ করে জিজ্ঞেস করল, মামা ওরা কী সব খড়ের মানুষ?

বাবা ওকে আদর করে কাছে টেনে নিলেন, বললেন হ্যাঁ মা মণি খড়ের মানুষ।

আজ দুপুরে এই কাঁচঘরে, খাওয়াদাওয়ার পর কখন যে চোখদুটো ঘুমে জড়িয়ে এসেছে আমি টেরও পাইনি। স্বপ্নে আমি গাধাবোটটা দেখলাম, সামনে একটা স্টিমার, ঘসঘস করে

ইঞ্জিনের শব্দ হচ্ছে, অতিকায় চাকায় জল কেটে জলে ঢেউ তুলে গাধাবোটটা আমাদের সেই চড়ুইভাতির জায়গাটা পেরিয়ে গেল। মোহানার দিকে এগিয়ে চলেছে গাধাবোটটা, বেশ কিছু খড়ের মানুষ, তাদের চামড়ার নীচে খড়ের সোনালি কুচি দেখা যাচ্ছে। কারও কারও শরীরের বাইরেও খড়ের কুচি, বিচালির ধুলো, ময়লা মিহি পাউডারের মত লেগে আছে। খড়ের গন্ধ বেরুচ্ছে তাদের শরীর থেকে।

গাধাবোটের সামনে রেলিং কালো রঙ করা। ডেকের ওপর নানা রকম সওদা প্যাকিং বাক্স, অতিকায় কাচের বয়াম, বস্তা। একটা বস্তার গায়ে, মনে হয় রক্তই, কালো-পাঁশুটে রঙের, চাপ বেঁধে জমে আছে আঁশটে গন্ধ। একটা বড়সড় মাটির জালা, মুখ চাপা দেওয়া মাটির সরা দিয়ে। সরাতে হাত দিতেই একজন খড়ের মানুষ কাঁধে হাত দিল। খুলতে নিষেধ করল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন? কী যাচ্ছে এতে?

খড়ের সেই মানুষটা বলল, সওদা অনেক কিছু— মানুষের কঙ্কাল, মাথার খুলি, কলজে, মানুষের পাকস্থলি, আস্তলাশও আছে, কবর থেকে তোলা। চারপাশের গুমোট ভ্যাপসা গন্ধে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। গঙ্গার বুকে হাওয়াটাও যেন হঠাৎ পড়ে গেল।

একেবারে সামনে, রেলিংয়ের সামনে মাথায় টুপি খালি গায়ে, রঙীন সর্টস পরা, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, সাদা মোজা একজন খড়ের মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সিডার্মি না কী যেন বলে। যাদুঘরে জন্তুজানোয়ার নাকি ওইভাবে রাখা হয়। ভেতরে খড়ের কুচি ভরে দিয়ে বাইরে মানুষের চামড়ার একটা খোলস। আমি চামড়ার নীচে খড়ের কুচি দেখতে পাচ্ছিলাম।

খানিকটা তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবার জন্যে, আর খানিকটা বুক ভরে বাতাস নেওয়ার জন্য, আমি গাধাবোটের প্রায় কিনারায় রেলিং ধরে দ্রুত এগিয়ে গেলাম। সামনের রেলিংয়ে পিছন ফিরে দাঁড়ানো লোকটি ঘুরে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে বাজপড়লেও, আমি হয়ত এতটা চম্‌কে উঠতাম না, ধাক্কাটা এক লহমায় সামলে উঠে বললাম, কত বছর তোকে দেখিনি। বিদেশ তুই, এখানে, এভাবে গাধাবোটে।

বিদেশ টুপি খুলে বিষণ্ন হাসল, বলল, স্বদেশ ভাল আছিস। বরদা ভবনে সবাই ভালো আছে তো? মালতি ভাল আছে? ঘুমটা ভেঙে গেল আর আশ্চর্য সেই কোন ছেলেবেলায় ডায়মণ্ডহারবারে আমরা বরদা ভবনের সবাই মিলে চড়ুইভতি করতে গিয়েছিলাম, এক এক করে আবার সব মনে পড়ল। সেদিন সন্ধ্যায় গাধাবোটে যেসব খড়ের মানুষ জোয়ারের টানে কলকাতার দিকে ভেসে আসছিল, তাদেরও মনে পড়ল। এমনকি ওখান থেকে আসার সময় বেড়ালের চোখের রংয়ের একটা মার্বেল হারিয়ে ফেলেছিলাম, কাঁচঘরে বসে সেটা সুদ্ধ মনে পড়ল। কলকাতায় এসে অনেক খুঁজেও সেই মার্বেল পাই নি। মুকুল চুরি করে থাকতে পারে ভেবেছিলাম, আশ্চর্য, সেটাও ভুলিনি। আমরা আর কখনও বরদা ভবনের সবাই মিলে চড়ুইভাতি করতে যাইনি, ডায়মণ্ডহারবারে না, কোথাও না।

ডায়মণ্ডহারবার থেকে ঘুরে আসার বছর পাঁচেক পরে এক রাত্রের ভেদবমি আর ওলাওঠায় আমার মা মারা যায়। বাবা তখন জয়কালিমাতা প্রেসের কাজ নিয়ে নামখানা

না কাকদ্বীপে। প্রাণকাকাই তখন ডাক্তার বদ্যি, ওষুধ পত্র করেছিলেন। মানুপিসীকে বলেছিলেন ছেলেদুটোকে সরিয়ে নিয়ে যাও। নাহলে এরাও মরবে। বিদেশ তখন ক্লাস এইটে আমি একবছর ফেল করে এক ক্লাস নীচে। মানুপিসী নাকি আমাদের পাশের পাড়ার ওলাবিবির থানে সেই রাত্রেই মানত করেছিল। মানতের কথা হয়ত কাউকে বলতে নেই।

মালতি আমাকে আর বিদেশকে বলেছিল, দেখিস মামী ঠিক ভালো হয়ে যাবে। মা ওলাবিবির থানে মানত করেছে তো।

শিবুদা শুনে ধমক দিয়েছিল, তোকে আর পাকামি করতে হবে না। মানতফানত সব ফালতু, ডাক্তার আসবে, স্যালাইন দেবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

মানুপিসীরা থাকত দোতলায়, আমরা একতলায়। নীচে অনেক লোকজন কথাবলাবলি করছে, শুনতে পাচ্ছিলাম। মা বিকট ওয়াক তুলে বমি করছিল, ভেতরের বারান্দায় হড়হড় করে পায়খানা করছিল, বালতি বালতি জল ঢালা হচ্ছিল, আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। ভোররাতে মানুপিসী গায়ে ঠেলা দিয়ে আমাকে আর বিদেশকে তুলে দিল, ওরে ওঠ ওঠ, এদিকে সর্বনাশ হয়ে গেল যে, চল বাবা চল, শেষ সময়ে মুখে একটু গঙ্গাজল দিবি চল বাপধনেরা।

ঘুম চোখে আমি আর বিদেশ সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় কবার হোঁচট খেয়ে টাল সামলে প্রায় চোখ বুঁজে আমাদের ঘরে। মা মেঝেতে, ঘরময় বমি আর চালধোয়া জলের মত পায়খানার টক-আঁশ গন্ধ। মায়ের পাশে মাথার কাছে কাকা তখন উচু হয়ে বসে বিড়বিড় করে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম বলছেন। সোহাগবালা, আমার খুড়িমা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কে যেন একটা কমণ্ডলু এগিয়ে দিল, বলল, মুখে একটু গঙ্গা দাও স্বদেশ। আমি কেমন বোকাবোকা অল্প হাঁ করা মায়ের মুখে জল ঢাললাম, জল গালের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল। মায়ের চোখের সাদা অংশটা ঠেলে বেরিয়ে আসছে, চোখের মণি দুটো প্রায় কপালে উঠে গেছে। মায়ের চোখের মণি খুব কালো ছিল।

বাবা শ্মশানঘাটে গিয়েছিলেন বাড়ি ঘুরে। বাবার জন্য অপেক্ষা করতে করতে বেলা হয়েছিল। বাবাই চিতায় আগুন দিতে চেয়েছিলেন, পুরোহিত বললেন, ছেলেদের উপনয়ন হয়ে গেছে, ওরাই মুখাগ্নি করুক, হাজার হলেও ছেলের হাতের আগুন। আমি চিতা প্রদক্ষিণ করে, মায়ের মুখে জ্বলন্ত পাটকাঠি ছোঁয়াবার সময় চোখ বুঁজেছিলুম। বিদেশ নাকি চোখ খুলেই ছিল। মায়ের চোখের পাতা তখন বুঁজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বন্ধ দুটো চোখের ওপর চন্দন দেওয়া তুলসীপাতা চাপা দেওয়া ছিল। আমাদের দুজনের চিতা প্রদক্ষিণের পর বাবা এসে চিতায় আগুন দিয়েছিলেন।

আমি পরে বিদেশকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, তোর ভয় করেনি? মুখে আগুন দেওয়ার সময় আমি তো চোখ বুঁজেছিলাম।

বিদেশ আমার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিতে নিতে বলেছিল, আমি তো চোখ মেলেই ছিলুম। আমি ভাবছিলুম যদি একবার মা চোখ মেলে তাকায়।

নদীতে ভাঁটার টান তখন। চিতায় ঢালার জন্য গঙ্গা জল আনতে হবে। মাটির কলসী নিয়ে আমি আর বিদেশ দুভাই পলি-কাদা ভেঙে জলে নেমেছি। আমার ঠিক বাঁপাশে ঘাটের কোণায় আদ্ধেক জলে, আদ্ধেক পলিতে একটা খড়ের কাঠামো আটকে আছে। কোনো ঠাকুরের ভাসান হয়েছে, রঙ মাটি, সাজপোষাক ধুয়ে গেছে জলে শুধু কাঠামোটা রয়ে গেছে। প্রায় মানুষের মাপের প্রমাণ সাইজের কাঠামো, শুধু নীচের আধভাঙা বেদী থেকে প্রতিমার আদল পাওয়া যায়। খড়ের হাত, খড়ের পা, অন্য অবয়ব মানুষের আদলেই, শুধু মাথাটা নেই।

শ্মশান ঘাট থেকে ফিরতে প্রায় রাত ভোর। নিমতলার সেই শ্মশানঘাটের দেয়ালে বিদেশ চিতা থেকে পোড়াকাঠের টুকরো তুলে এনে দেওয়ালের গায়ে মায়ের নাম লিখে রেখেছিল। কত নাম লেখা হয়েছে এতগুলো বছরে। এখন নিমতলা ঘাটও তো অনেক বদলে গেছে। এতদিন পরে নিশ্চয়ই সেই পুরনো দেওয়ালও নেই, বিদেশের সে রাতে লেখা মায়ের নামও নেই।

শ্মশান থেকে ফেরার পর মানুপিসী আমাদের হাতে দুচারটি করে নিমপাতা গুঁজে দিয়েছিল চিবোবার জন্য। সদর দরজায় জংধরা লোহার একটা কাটারি ফেলে রেখেছিল স্পর্শ করার জন্য— মরার পরও আত্মার নাকি প্রাণ কাঁদে ফেলে যাওয়া ঘর সংসার, স্বামী পুত্রের জন্য মানুপিসী বলেছিল।

সেদিন অনেক রাতে জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দের মধ্যে খড়ের কাঠামোটা নড়ে উঠল। তাতে মাটি পড়ল, দোমেটে হল, রঙ লাগল, একটু শ্যামলা, ডুরেকাটা লালপাড়ে শাড়ি জড়ানো হলো প্রতিমার গায়ে। হাতে শাঁখা, একটা রুপোবাঁধানো নোয়া, পলার চুড়ি। আমার খুব চেনা মুখের আদল, একদিকের চিবুকে জরুল, মার গভীর কালো চোখ দুটোর দিকে আমি বিহ্বল চোখ তুলে তাকালাম। ফিসফিস করে বললাম, মা, তুমি খড়ের মানুষ হয়ে গেলে কী করে?

বরদার ভূত

টালা ট্যাঙ্ক থেকে উত্তরমুখো একটু হেঁটে ডানদিকে ঘুরলে গোঁসাইপাড়া লেন, শ্রীরামপুরের গোঁসাইদের কোনো এক শরিকের নামে রাস্তা, তারপর সেই রাস্তার একটা প্রশাখা গোঁসাই পাড়া বাই লেন, ব্লাইণ্ড লেন, কানাগলি, শেষ বাড়িটা বরদা ভবন।

আমার প্রপিতামহ বরদা চাটুজ্জে বরদা ভবনের প্রতিষ্ঠাতা। কলকাতা শহরের মধ্যে, বরদার আরও একটা বাড়ি ছিল, সেটা তাঁর প্রথমপক্ষের স্ত্রীর ছেলেমেয়ে জ্ঞাতিগোষ্ঠীর দখলে, আমি কোনোদিন সে বাড়িতে যাইনি।

আমার ঠাকুরদা বদ্যিনাথ চাটুজ্জে দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান, তিনিও উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন, ব্যাঙ্ক থেকে শুরু করে, নানা ব্যবসায়ে মাথা খাটিয়েছিলেন, টাকা লাগিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যবসাপত্রে কপাল নাকি একটা বড় ফ্যাক্টর। গণনাথ বলতেন বাবার ভাগ্য প্রসন্ন ছিল না।

ঠাকুরদা বদ্যিনাথ চাটুজ্জে বসিরহাটের দিকে একটা ধানজমি আর বাগানবাড়ি কিনেছিলেন। ধানজমিটা রাখতে পারেননি, ভাগীদারের সঙ্গে লাঠালাঠি করে শেষ পর্যন্ত বেচে দিয়েছিলেন। শেষবয়সে একটু তন্ত্রমন্ত্র করতেন। বোধহয় একটু মাথার গোলমালও হয়েছিল। বদ্যিনাথের দেহান্ত হওয়ার কিছু আগে গণনাথ আর প্রাণনাথ যুক্তি পরামর্শ করে বসিরহাটের বাগানবাড়িটা বেচে দেন। তাতে ঠাকুরদা বৈদ্যনাথের চিকিৎসা এবং পারলৌকিক ক্রিয়া দুটোরই খরচ উঠে যায়। বাবা মাঝে মাঝে বসিরহাটের বাগান বাড়িটার জন্য আফশোষ করতেন। বাবা চাকরি করতেন জয়কালিমাতা প্রেসে। বিভিন্ন সেরেস্তা কোর্ট কাচারি ঘুরে অর্ডার যোগাড় করা ছিল তাঁর কাজ। এতে মাইনে ছিল, প্রেসের মালিক বটকৃষ্ণ নস্কর কমিশনও দিতেন। বটকৃষ্ণ নস্করের ধানজমি ছিল, মাছের ভেড়ি ছিল। বাবা বলতেন, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, সেতো ঠিকই। অতবড় ইংরেজ জাত, এল বাণিজ্য করতে—শেষে পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট করে জমিদারিতে হাত বাড়াল কিনা?

মা বলত, বামুনের ব্যবসা যজমানী, তোমার শরীরে ধানের আখড়ার গন্ধ কেন? বাবা উত্তর দিতেন না। বটকৃষ্ণ নস্করের সমস্ত ধানজমির হিসেব বাবার জানা ছিল। খুব ছোটবেলায়, সেবার বাবার সঙ্গে গ্রীষ্মে, ফলের মরশুমে বসিরহাটের বাগানবাড়িতে গিয়েছি, আমাদের বাড়ির সামনে বি. টি. রোড। সেখান থেকে বারাসাত, তারপর ছোট বাসে করে, এখন সেরকম বাস আর দেখাই যায় না, বসিরহাট। ঠাকুরদা বদ্যিনাথ বাগানের একপ্রান্তে খড়ের চালায় একটা ঘরে থাকতেন। সেখানে একটা ছোট্ট কালিমূর্তি ছিল। তিনি তন্ত্রসাধনা করতেন, তন্ত্রে সিদ্ধিলাভ হলে তিনি ভাগ্যকে জয় করবেন একথা বলতেন। তারপর নাকি ধুলোমুঠি সোনামুঠি হয়ে যাবে। গ্রামের কিছু লোক তাঁর কাছে তাবিজ কবজ নিতে আসত।

চুলের বিনুনির জট পাকিয়ে যাওয়া, কোমর ছাপিয়ে পাছা পর্যন্ত চুল কপাল ধেবড়ে সিঁদুর, হাতে একটা ত্রিশূল এমন একজন মিশকালো মজবুত চেহারার মেয়েমানুষ আমি বসিরহাটের বাগানে কাঠকুটো কুড়োতে দেখেছিলাম।

বাবা বলেছিলেন তিনি নাকি ভৈরবী, বৈদ্যনাথের তন্ত্রসাধিকা। আমি ভয়ংকর চেহারার ভৈরবীকে দেখে ভয় পেয়েছিলাম খুব, দৌড়ে বাবার কাছে পালিয়ে গিয়েছিলাম, ঠকঠক করে ভয়ে কাঁপছিলাম। পরে ভৈরবীকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলাম। ঠাকুরদাও কপালে সিঁদুর দিতেন, খালি গা, গলায় রুদ্রাক্ষ, লাল কাপড় পরতেন, পায়ে খড়ম, হাঁটলে খড়মের খটাশ খটাশ শব্দ হত, আমার ভয় করত না। ঠাকুরদাকেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওটা কে? ও ওরকম সেজে আছে কেন? ঠাকুরদা বলেছিল, কেন দাঁদু, আমার ভৈরবীকে পছন্দ? নিয়ে যা বরদা ভবনে।

আমি বলেছিলাম, পছন্দ হতে যাবে কেন? আমি কালিঠাকুরের মূর্তির কাছে টালা

ট্যাঙ্কের কাছে খুব বড় পুজো হয় জানোতো, ভৈরবী দেখেছি। ঠাকুরদা বৈদ্যনাথ হা হা করে হেসে উঠেছিলেন। তারপর এক বিকট চীৎকার করে বলেছিলেন, জয় তারা।

গ্রীষ্মে বসিরহাটের বাগান আম, জাম, কাঁঠালের গন্ধে ম ম করত। মৌমাছি আসত, ওখানেই দুটো গাছের ওপর দুটো বিশাল মৌচাক দেখেছিলাম। আমরা সারাদিন বাগানে ঘুরে বেড়াতাম, জাম কুড়োতাম, আম পাড়তাম। ফল খেয়েই আমাদের পেট ভরে যেত। পুকুর থেকে জাল টেনে মাছ ধরা হত, কিন্তু ভাত মাছ বড় একটা খাওয়া হত না।

সারাদিন থেকে সন্ধের মুখে লাষ্ট বাসে আমরা বারাসাত ফিরতাম, কয়েক ঝুড়ি ফল থাকত সঙ্গে—আম, জাম, জামরুল, কাঁঠাল। বারাসাত থেকে বিটি রোডে আমাদের বাস স্টপে নামার পর দৌড়ে গিয়ে বাড়িতে খবর দিতাম। বাবা টানা রিক্সায় মাল বোঝাই করে বরদা ভবনে নিয়ে আসতেন। তারপর সেই সমস্ত ফল পাকুড় প্রাণকাকাদের সঙ্গে ভাগজোগ হত। মানুপিসীদের ঘরেও আমি আর বিদেশ গিয়ে ফলের চুবড়ি পৌঁছে দিতাম।

দুপুরে খেতে বসেছি, আমি আর বিদেশ পাশাপাশি আসনপিঁড়িতে। বাবা আর ঠাকুরদা বৈদ্যনাথ পাশাপাশি। ছোটকাকা প্রাণনাথের কথা উঠল। বাবা বললেন, সেতো সবসময় সব কথা খুলে বলে না, কী যে করছে কখন, বাবা সঠিক জানেন না। তবে প্রাণের শ্বশুরঘরের অবস্থা স্বচ্ছল। ভালোই তো আছে।

সেবার প্রাণকাকার ছেলে মুকুল আমাদের সঙ্গে ছিল না। মালতি খুব জেদ ধরেছিল আসার সময়, মানুপিসী অনেক বকাঝকা করে ওকে আটকেছেন। মালতিকে ভৈরবীর কথা বলব, ভেবে রাখি, মৌচাকের কথাটাও বলতে হবে, মালতি কী কখনও মৌচাক দেখেছে, কিংবা মৌমাছি। বিদেশ কিছু ফুলপাতা দিয়ে দুটো তোড়া বেঁধেছে। কলাপাতায় মুড়ে নিয়েছে বেলফুল আর কাঠচাঁপা মালতিকে দেবে বলে।

বদ্যিনাথ বললেন, ঝড়ে অনেক মুকুল ঝরে গেছে, নাহলে আরও আম পাওয়া যেত। ফজলির এখনও সময় যায় নি, ল্যাংড়া আমের বাজার দাম নাকি ভালোই। তোমরা আস না, বারো ভূতে খেয়ে যায়। লোকজনকে দিয়ে দিই। পাইকাররা এসে ঠকিয়ে মাল নিয়ে যায়, আমি সাধনা নিয়েই থাকি, দেখার সময় কোথায়। প্রাণনাথকে বোলো, তোমরা মাঝে মাঝে না এলে সামনের সীজনে বাগান আমি লিজে দিয়ে দেব।

হঠাৎ যেন খেয়াল পড়েছে, এভাবে বদ্যিনাথ, আমার ঠাকুরদা খাওয়া বন্ধ করে দিলেন, গণ্ডুষ করে পাত ছাড়লেন, বললেন ভাল কথা, বলব বলব করে বলা হয়ে ওঠেনি এতক্ষণ বলতাম হয়ত, এখন তোমরা কীভাবে নেবে তোমরা তো মানতে চাইবে না—বরদা এসেছিলেন।

বরদা মানে আমার ঠাকুরদা বদ্যিনাথ চাটুজ্জের বাবা, বরদাকান্ত চাটুজ্জে। বাবার খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল, বরদা, মানে ঠাকুরদা এসেছিলেন, বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায়, বসিরহাটে, আপনার এই বাগানে?

বদ্যিনাথ বললেন, এই বাগানে, গেল অমাবস্যায় নিশিপুজো সেরে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য ঘরের দিকে যাচ্ছি, হঠাৎ একটা পেঁচা ডেকে উঠল। হাতের সেজবাতিটা হাওয়া লেগে

একটু কাঁপল, সামনে অল্প আলো আঁধারি, স্পষ্ট বরদাকে দেখলাম, বললেন, বড় কষ্ট বড় কষ্ট। ওর একটা মুক্তির ব্যবস্থা তোরা দুভাই মিলে করে দে। আমি তো সংসারের মায়া কাটিয়েছি, পূর্বাশ্রম—গার্হস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন আমার পক্ষে পাপ। মা কালিকা রুষ্ট হবেন, তাছাড়া পিশাচসিদ্ধ মানুষেরা শ্রাদ্ধের, বিশেষ করে পিতৃশ্রাদ্ধের অধিকারী হন না। দুভাই গয়াধাম গিয়ে ওঁর মুক্তির ব্যবস্থা কর। আমাকে পথে বসিয়ে গেছেন, তবুও আমার পিতা তো, তোমাদেরও প্রত্যক্ষ রক্তসম্পর্কে পিতামহ। বড় কষ্ট পাচ্ছেন বরদা, বড় কষ্টে আছেন। উচ্চৈস্বরে জয় তারা বলে তিনি নিজের ঘরের দিকে খড়ম ফটাস ফটাস করে পা বাড়ালেন।

ফেরার পথে শ্যামবাজারের বাসে উঠে বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, বাবা, মানুষ কী মরে ভূত হয়? তোমার ঠাকুরবাবা বরদা চাটুজ্জে কী মরে ভূত হয়েছে বাবা? বিদেশ বাবাকে ঠেলছিল, পাশের সীট, বলনা বাবা!

বাবা অন্যমনস্ক ছিলেন, কিছু হয়ত ভাবছিলেন, বললেন বড়দের কথায় থাকতে নেই। ঠাকুরদার মানে বদ্যিনাথের বয়স হয়েছে নানা দুশ্চিন্তায় মাথার ঠিক নেই, তার মধ্যে এইসব ভৈরবী, তন্ত্রমন্ত্র। বিদেশকে বললেন, যা শুনেছ, শুনেছ। কাউকে বলবে না—মাকেও না।

আমি বাবাকে বললাম, তুমি কখনও ভূত দেখেছ বাবা?

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর মা বলল তা তোমাদেরই তো ঠাকুরদা। বাবা যখন বলছেন এত করে, তো দুভাই ভাল দিনক্ষণ দেখে গয়ায় কাজটা সেরে এস না।

বাবা বললেন, প্রাণনাথ যাবে ভেবেছ? গয়া যাওয়া আসা, নমোনমো করে পিণ্ডদান শেষ করতে তো একটা খরচা আছে। প্রাণনাথ দেবে? যা হাড় কেপ্পন। গত মাসে পঞ্চাশটা টাকা চাইলাম।

মা বলল, আহ্ ছেলেরা শুনতে পাবে। বাবা চুপ করে গেলেন।

পরদিন সকালে আমিই প্রাণকাকাকে ডেকে আনলাম। পেছনে পেছনে খুড়ীমা সোহাগবালাও এল। বসিরহাটে বদ্যিনাথ, বরদাকান্তর ভূত দেখেছেন।

বাবা বললেন, বরদাকান্ত প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়েছেন, বলছেন, বড় কষ্ট বড় কষ্ট।

কাকা বললেন, বাবা দেখেছেন তো? আমি তোকে কবে থেকে বলছি বাবার মাথাটা গেছে।

সোহাগবালা বলল, সঙ্গে আবার এক সাধনসঙ্গিনী জুটেছে। ছ্যা ছ্যাঃ, ঘেন্নায় মরে যাই, বুড়ো বয়সে, কত রঙ ঢঙ, দেখগে গাঁজাফাঁজা খেয়েছিল হয়ত।

কাকা বললেন, একটু চাপা রাগ আর বিরক্তিতেই বললেন, আহ্ তুমি থাম তো।

সোহাগবালা আমার খুড়িমা বলল, কেন থামব কেন? কার ভয়ে থামব? ব্যবসায়ে নামিয়ে আমার দাদার দশহাজার টাকা জলে দেন নি উনি, আরও তো কত ফন্দিফিকির করেছিলেন, থামব কেন?

সোহাগবালার বাপের বাড়ি ভাগলপুরে, বিহারে। প্রাণকাকার সঙ্গে সোহাগবালার কীভাবে বিয়ে হয়েছিল, জানিনা। বস্তুতঃ মুকুলের এক মামার ওই দশহাজার টাকা দেওয়ার প্রসঙ্গ না উঠলে, প্রাণকাকার সঙ্গে সোহাগবালার বিয়ে কীভাবে হল, তা নিয়ে কোনো কৌতূহল জাগত না।

সোহাগবালার দাদা নাকি দাদুর কথায় একটা পরিত্যক্ত কয়লা খাদানে দশহাজার টাকা লাগিয়েছিল। বাবার মুখেই শুনেছি। বিশাল ধ্বস্ নেমে সে খাদান বন্ধ হয়ে যায়। যতদিনের ইজারা ছিল, তার মধ্যে খাদানের মুখ পরিষ্কার করা সম্ভব ছিল না। ঠাকুরদা বদ্যিনাথ বলেছিলেন, বাগান বেচে পয়সা শোধ দিয়ে দেবেন।

আমার মা সোহাগবালার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে চাইছিল। খুড়ি হাত ছাড়িয়ে নিল, বলল, কই হীরের আংটির খোঁজ পেয়েছ? তোমায় বলেছিল না, বরদাকান্তর হীরের আংটিটা তোমাকেই দেবে? ওই ভৈরবী মাগীর গর্ভে দেখগে সব দিয়ে বসে আছে। তন্ত্র সাধনা হচ্ছে, আমরা কিছু বুঝি না?

প্রাণকাকা কোনোভাবে খুড়ীকে টেনে হিঁচড়ে ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। যেতে যেতেও সোহাগবালা চীৎকার করে বলে গেল, আমি বলে গেলুম বড়ঠাকুর, ওই বসিরহাটের বাগানবাড়িও যদি মাগীর গর্ভে না যায়, তো তুমি আমার নামে কুকুর পুষো।

বরদাকান্ত তার প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েদের প্রায় সবই দিয়ে গেছেন। দ্বিতীয় পক্ষের বদ্যিনাথ সেই অনুপাতে নিজেকে বঞ্চিত মনে করতেন, বলতেনও বাবা আমাকে ঠকিয়েছেন। ব্যবসার নানারকম উদ্যোগ নিয়েছিলেন বদ্যিনাথ, ব্যাংক থেকে শুরু করে, অনেক কিছু। কিন্তু কিছুই টেঁকেনি। কিছুটা তার খামখেয়ালিপনার জন্যে আর অনেকটাই তার উড়নচণ্ডী স্বভাবের জন্য। রাখতে পারলে, হয়ত কিছু পয়সা থাকত, কিন্তু রোজগারের চেয়ে পয়সা উড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতাই যেন তাঁর বেশি ছিল।

নানা কথায় বদ্যিনাথ সম্পর্কে, আমার আপন ঠাকুর্দা সম্পর্কে এরকমই একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল আমার মনে। কলকাতার কোন নিষিদ্ধপল্লীতে বদ্যিনাথের নাকি বাঁধা মেয়েছেলে ছিল। এই ভৈরবী নাকি লতায়পাতায় তারই কেউ হয়, নাকি সেইই। মা বলছিল সোহাগবালাকে, আমি তো ভাই দেখিনি, শুনেছি তিনি নাকি আমার বিয়ের আগে রিক্সা করে বরদা ভবনেও আসতেন।

সোহাগবালা বলত, ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার, অমন বাপের মুখে। আমি তো তোমার দেওরকেও বলি, সেবার খারাপ রোগে মরতে বসেছিল। ডাক্তারবদ্যি, ওষুধপত্র সবইতো

তোমার। কী ঘেন্না, কী ঘেন্না, বাপের বাড়িতে সবাই জিজ্ঞেস করে হ্যাঁ রা তোর শ্বশুরের কী হয়েছে র‍্যা? তো কী বলব বল তো বড় বউ?

মা বলল, আমি তো শুনিনি এসব, কী রোগ হয়েছিল রে সোহাগ?

সামনে পানের ডিবে, মা পান সাজছে। সোহাগবালা, খুড়িমা পান মুখে দিল। ফ্যাচ করে জানালা দিয়ে পিক ফেলল। তক্তাপোষের ওপর দুপুরবেলায় আমি আর বিদেশ। আমি চোখ দুটো শক্ত করে বন্ধ করে পড়ে আছি, বিদেশকে দুবার ঠেলা দিলাম, বিদেশ বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। খুড়িমা আবার পিক ফেলল, কথার খেই ধরে বলল, শুনবে কী করে, বড়ঠাকুর বললে তো শুনবে, ছোটটিও কী বলে? গুণধর শ্বশুর বাথরুম থেকে বেরবার পর চানে গেছি, দেখি রক্ত, নর্দমার মুখটাতে পেচ্ছাব বসেছিলেন, জলে ধোয়নি সবটা রক্ত। জানতে চাইলাম, বললেন, ফিসচুলা না অর্শ। পরে জানাজানি হয়ে গেল। ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার।

আমার মায়ের ভীতু ভীতু গলা শোনা গেল, রক্ত, বাথরুমে রক্ত, পেচ্ছাবের সঙ্গে, হ্যাঁ র‍্যা কী হয়েছিল রে সোহাগ। সোহাগবালার হাতভর্তি সোনার চুড়ির ঝনাৎকার। আড়চোখে দেখলাম সোহাগবালার দুহাতে কাপড়টা একটু উঁচুতে তুলে, ইসারায় বলল, এই এইখানে ঘা হয়েছিল, মরণ। তুই কী কিছুই জানিস না লো, ডাক্তার বলেছিল গণোরিয়া, পুঁজ জমত, রক্ত পড়ত।

তা তোমার ঠাকুরপো—তখন তো তার বাপ অন্ত প্রাণ। বাবা ব্যবসার টাকা দেবে। ডাক্তার বদ্যি সব একার ওপর। ভাল হয়ে, বরদাকান্তর হীরের আংটিটা তোকেই দিয়ে চলে যাব, শ্বশুরমশাই বলেছিল। তা দিল? তারপর তো দশটা বছর কেটে গেল। ওই হীরের আংটি যদি ভৈরবীর সেবায় না যায়, তো আমার নাম সোহাগবালা নয়। এত করে তোমার ঠাকুরপোকে বলছি, একবার বসিরহাটে যাও, নিজের চোখে দেখে এস, তা শুনলে তো। বরদাকান্তর তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই। ভূত হয়ে এসে বলছেন, বড় কষ্ট, বড় কষ্ট। এখন ছোটো গয়ায় পিণ্ডি দিতে। যদি দিতেই হয়, তো উনি নিজে যান না। ছেলে থাকতে নাতিদের কেন দরকার পড়ল বরদাকান্তর।

মা যেন মনে করিয়ে দেওয়ার মত করে বলল, তাছাড়া ওনার, মানে বরদাকান্তর তো প্রথম পক্ষও আছে, তাদেরও তো কিছু কর্তব্য আছে।

সোহাগবালা বলল, তাই না তাই, ভূত হয়ে দেখা দিতে হয় তো প্রথম পক্ষের ভবানীপুরের বাড়িতে যা, তা না। অদৃশ্য বরদাকান্ত কিংবা বেচারী ঠাকুরদার উদ্দেশে ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার বলে, সোহাগবালা চলে গেল।

বিদেশ অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মায়ের নজর হঠাৎ তক্তাপোষের দিকে। গালে হাত রেখে বলল, হায় কপাল, তুই ঘুমসনি, জেগে জেগে বড়দের কথা গিলছিস। আমার কাছে এসে মা তার স্বেদস্নিগ্ধ ঠাণ্ডা গালটা আমার কপালের উপর রাখল। ফিসফস করে বলল, এসব কথা শুনেছিস, কাউকে বলবি না কিন্তু, তোর বাবাকেও না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সবাই কী মরে গেলে ভূত হয় মা!

মা আমার পাশটিতে গুঁড়িসুড়ি মেরে শুয়ে পড়ল, চোখের ওপর ঠাণ্ডা হাত চাপা দিয়ে বলল, এখন ঘুমো তো। এই ভর দুপুরে ভূতের নাম করতে নেই।

আমি মাকে বললাম, বরদাকান্তর হীরের আংটিটা কোথায় গেল মা? তুমি জানো? মা কপট রাগে বলল, এবার ঘুমো তো, নাহলে একটা চড় কষাবো। মা আমাকে কখনও একটা চড় মারেনি। আমি বললাম, আংটিটা বোধ হয় ঠাকুরদার কাছেই আছে না হলে ভৈরবীর কাছে। এরপর আমি যখন বসিরহাটের বাগানে যাব, আমি আংটিটা চেয়ে নেব। হীরের আংটি খুব দামি, তাই না?

মা কেমন উদাস গলায় বলল, ভৈরবী তোকে আংটিটা দিলে তো!

ইউনিভার্সাল নার্সিংহোমে এক সপ্তাহের ওপর হয়ে গেল এই কাঁচঘরে আছি। আমার যারা পরিচিত তারা হয়ত জানেই না আমি এখানে আছি। বরদা ভবনের কেউ যদি জানত, জানলেও আসত কী না কে জানে? শিবুদা থাকলে হয়ত একবার আসত, গভীর রাতে, কালো চাদর মুড়ি দিয়ে, হাতে একটা ছোট টর্চ, শিবুদা আসত ছোটো একটা মাঠ পেরিয়ে বরদা ভবনের পেছনের ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক-ফোকর গলে।

মানুপিসীকে, মানে শিবুদার মাকে একবার দুশোটা টাকা পৌঁছে দেবার জন্য রাত প্রায় দেড়টার পর আমাদের এজমালি কলতলা, উঠোন পেরিয়ে ভেতরের বারান্দার দিকে জানালাটা দিয়ে শিবুদা ফিসফিস করে ডেকেছিল, সদা, এই স্বদেশ ওঠ, দরজাটা খোল। আমি একটু ভয়ই পেয়েছিলাম। আমি কে কে বলে চীৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলাম। শিবুদা অন্ধকারেও কীভাবে বুঝল জানি না, আমি যে একটু ভীতু সেটা তো জানতই, চাপা ধমক দিয়ে বলল, চেঁচাবি না রাসকেল, আমি শিবুদা।

ঘরে দুটো কলা ছিল, আর খানচারেক বিস্কুট। কোনরকমে মুখে গুঁজে ঢকঢক করে এক ঘটি জল খেয়ে নিল শিবুদা। বলল, মাকে টাকাটা দিয়ে দিবি, আমি এসেছিলাম, বলার দরকার নেই। ওপাশের দরজায় পুলিশ নজর রেখেছে, দোতলায় যেতে পারব না।

কে দিয়েছে জিজ্ঞেস করলে কী বলব, আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সে তুই বুদ্ধি করে যাহোক বানিয়ে বলে দিস। না হলে বলিস চিঠির বাক্সে মায়ের নাম লেখা খামটা তুই বের করেছিস। মা যা বোঝার বুঝে নেবে।

শিবুদা যেমন এসেছিল, তেমনি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে পুলিশ এসেছিল। সামনের দরজায় জোর ধাক্কা দিতেই, আমি চমকে উঠলাম। বাইরে থেকে তিন চারজনের অধৈর্য কণ্ঠস্বর, দরজা খুলুন। দরজা খুলতেই চারটে লোক আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে ভেতরের বারান্দার দিকে, তারপর টর্চ জ্বেলে উঠোন, কুয়োতলা দিয়ে পেছনের ভাঙা পাঁচিলের দিকে ছুটে গেল। ভয়ে আমার হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছিল, আমি নিজের কানে তার ধড়াস ধড়াস শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। পাঁচিলের ধার থেকে ওরা ফিরে এল। তারপর আমাকে খিঁচিয়ে উঠল একজন, এত রাত অবধি জেগে কী করছেন? একজন পাশের ছোটঘরটার দরজার শেকল খুললো বোধ হয়। আমি আমতা আমতা করে বললাম, জেগে থাকব কেন, আমি তো ঘুমোচ্ছিলাম।

ঘুমুচ্ছিলে, মারব এক ঝাপড়া, চিরকালের মত ঘুম ছুটিয়ে দেব, বানচোত, চোখ দেখলে আমরা বুঝিনা ঘুমুচ্ছিলে না কী করছিলে। একজন দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, আমি দোতলাটা বরং দেখে আসি। আমার সামনে এখন দুজন, আরেকজন ভেতর থেকে এখনও আসেনি। শিবুদার খোঁজে এর আগেও বেশ কবার পুলিশ এসেছে। কখনও চিৎপুর থানা থেকে, কখনও কাশীপুর না হলে দমদম থানা থেকেও। তবে কখনই তারা বাড়ির ভেতর পর্যন্ত এভাবে চলে আসেনি। বাড়ি ঘর দোর ভেঙে পড়ার অবস্থা হলেও বরদা ভবনের বাসিন্দাদের এলাকার লোকেরা খানিকটা সমীহ করেই চলত। পড়তি হলেও বনেদী ঘর তো বটে!

সামনের দুজনের একজন সাদা পোশাকে, অন্যজন খাকি প্যান্ট, নীল চেক সার্ট। দরজার সামনের ইউনির্ফমকে সে বলল, মাঝরাতে কচি মালটাকে একলাই নাড়াচাড়া করবে, শালা, আমরা ভাগ পাব না? স্পষ্ট করে না বললেও, আমি বুঝলাম ওরা মালতির কথা বলছে। শিবুদাকে পাওয়া যায়নি, এই ছুতোয় ওরা মানুপিসীর ঘরে হানা দেবে ভাবছে! ইউনিফর্মের মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বেরচ্ছে ভক্‌ভক্ করে।

হঠাৎ নজরে গেল, মাথার বালিশের পাশে, দুটো একশো টাকার নোট পড়ে আছে, পাখা ঘুরছে, হাওয়া লেগে নোট দুটো অল্প অল্প উড়ছে।

আমি একটু পিছিয়ে খাটটার দিকে পেছন ফিরে নোট দুটোকে সামাল দেব বলে এক পা পিছিয়েছি, সামনের ইউনিফর্ম, শকুনের চোখ বলল, ঘুমুচ্ছিলেন, বিছানায় পাত্তি এল কোথা থেকে?

বালিশের পাশ থেকে হাওয়ায় উড়ে একটা নোট প্রায় বিছানার মাঝখানে। সাদা পোশাক প্রায় ছো মেরে নোটটা তুলে নিল, কেমন একটা অদ্ভুত গলায় বলল, আরি ব্বাস, পুরোপাত্তি।

ইউনিফর্ম হাত দিয়ে বালিশ সরিয়ে আরেকটা নোটও তুলে নিল। আমার কুলকুল করে ঘাম হচ্ছে, শরীরটা ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে।

সাদা পোশাক বলল, কাজকম্ম তো কিছুই নেই, পাত্তি দুটো এলো কোত্থেকে, ঠিক করে বলুন, শিবু হারামিটা এসেছিল। আপনার তো আবার কেমন দাদা হয় তো বোনটাকে নিয়ে সিনেমা যেতে, রেস্তোরাঁ যেতে, ফুর্তি মারতে অসুবিধা হয় না!

আমি বললাম, বিশ্বাস করুন, টাকাটা আমার। হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মত জয়কালিমাতা প্রেসের নাম মনে পড়ল, বটকৃষ্ণ নস্কর প্রেসের মালিকের নাম মনে পড়ল। আমি বললাম, বিশ্বাস করুন টাকাটা আমাকে জয়কালিমাতা প্রেস থেকে দিয়ে গেছে, আমার বাবার মাইনের অ্যাডভান্সের টাকা।

ওদের একজন জয়কালিমাতা প্রেসের ঠিকানা নিল। বলল, আমরা খোঁজ নিয়ে দেখব— যদি মিথ্যা বলেছেন দেখি, সাদা পোশাক হাতের রুলটা দেখিয়ে বলল, পুরো পেছনে ভরে দেব।

ভেতরের দিকে ইউনিফর্মওলা পুলিশটি ছিল, বেরিয়ে এল, একটু আগে জানালা দিয়ে দেখলাম ও ভেতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে জিপার খুলে পেচ্ছাপ করছে ছড়ছড় করে, বারান্দা থেকে উঠোনে। সিমেন্ট বাঁধানো উঠোনে ফাটল ধরেছে বহুকাল হল। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দেখেছি সিমেন্ট বাঁধানো একটা তুলসীমঞ্চ ছিল উঠোনে, এখনও আছে। হয়ত তুলসী গাছ নেই, গাছের গোড়ায় মাটির প্রদীপ নেই। আমার মা নিয়মিত প্রদীপ দিত, পরে মানুপিসী মালতিও তো কখনও কখনও সন্ধেয় প্রদীপ হাতে তুলসীমঞ্চের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, শাঁখে ফুঁ দিয়েছে—আমি দেখেছি।

সবাই বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে, আমি কাতরকণ্ঠে বললুম, আরেকটু হলেই সাদা পোশাকের হাঁটুই জড়িয়ে ধরতাম হয়ত বললুম, বিশ্বাস করুন, টাকাটা না হলে কাল হাঁড়ি চড়বে না। আমি তো প্রেসের ঠিকানা দিলাম, মালিক বটকৃষ্ণ নস্কর আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন। ওরা দরজাটা হাট করে খুলে চলে গেল।

খানিক পরে দোতলায়, মালতিদের ঘর থেকে কান্নাকাটি চিৎকার চেঁচামেচি শুনলাম। প্রাণকাকাও বেরিয়ে এসেছে ভেতরের বারান্দায়, ওপরের দিকে তাকিয়ে কী যেন বলছেন।

মালতি সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় করে নীচে নেমে এল। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মানুপিসী বিলাপ করছেন, কী ছেলে পেটে ধরেছিলুম রে। লেখাপড়া শিখলি, কোথায় চাকরি বাকরি করবি, ঘরে থাকবি, তা না, আজ তোর জন্য মাঝরাতে পুলিশের এমন হেনস্থা।

মালতি বলছে, তুমি কিছু বল প্রাণকাকা, আমি জানি এভাবে মাঝরাতে, ঘরে দুটো মেয়েছেলে, পুলিশ ঢুকতে পারে না। কোনো সভ্য দেশে আইন নেই এভাবে ঢোকার।

বরদা ভবনের সবলোক বেরিয়ে এসেছে। দুয়েকজন মুখফুটে বলতেও শুরু করেছে। পুলিশের তর্জনগর্জনও যেন একটু কমে আসছে। প্রাণকাকাকে সেই সাদা পোশাকই বলল, কী করব বলুন, আমাদেরও তো চাকরি রাখতে হবে, শিবু মজুমদারের নামে ওয়ারেন্ট আছে, বাড়ি আমাদের সার্চ করতেই হবে।

আমি এই সুযোগে দুশো টাকার কথাটা বলতে পারতাম, বললাম না। ভয়ে বললাম না হয়ত। ভয়তো ছিলই, টাকাও ফেরৎ পেতাম না, শিবুদাকে না পেয়ে হয়ত আমাকেই ধরে নিয়ে যেত। এমন তো কত হচ্ছে। সন্তোষকে না পেয়ে কদিন আগে পুলিশ ওর বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে। সন্তোষ আমার সঙ্গে এক ক্লাসে ইস্কুলে পড়ত, পাশের পাড়ায় থাকে।

শিবুদা তো সত্যিই এসেছিল। ভাগ্যে ওরা টাটকা কলার খোসাটা নজর করেনি, এখনও ভেতর বারান্দায় পড়ে আছে। ভাবলাম জয়কালিমাতা থেকে বাবার নামে দুশো টাকা তুলে নিয়ে এসে মানুপিসীকে দিয়ে দেব। পুলিশকে একটা মিথ্যে বলার দরুন ফাইন দুশো টাকা, এই ভেবে নিজেকে আশ্বস্ত করলাম আমি।

পুলিশ চলে যাওয়ার পরও আধঘণ্টা জটলা চলল। তারপর একে একে বাইরের ঘরের বাতিগুলো নিভতে লাগল। আমি উঠোন কুয়োতলা পেরিয়ে ভাঙা পাঁচিলের ডানদিকে তেঁতুল গাছটার দিকে এগিয়ে গেলাম। তলপেটে অনেকক্ষণ ধরেই একটা চাপ। এদিকটা একটু অন্ধকার। হঠাৎ দোতলার শেষ আলোটা নিভে গেলে, অন্ধকারটা যেন চারপাশ থেকে জমাট বেঁধে এল। আমার শরীর নিমেষে কেমন যেন ভারি হয়ে উঠল।

আকাশের যতটুকু আলো তেঁতুল গাছের বিশাল ডালপালার বিস্তারের মধ্যে দিয়ে পাঁচিলের গায়ের প্যাসেজে পৌঁছচ্ছে, তাতে এক সোঁদা আলো আঁধারি। ধুতি, পায়ে খড়ম, কাঁধে উপবীত কে একজন যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না, তবু আমি চীৎকার করে উঠলাম, কে কে ওখানে?

তেঁতুল গাছটায় কয়েকটা পাখা-পাখালি ডানা ঝাপটাল। হঠাৎ দোতলার বারান্দায় কে যেন ফট করে সুইচ টিপে আলোটা জ্বেলে দিল। মূর্তিটা মিলিয়ে গেল। মানুপিসী বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে, বলল, আবার কি হ'ল?

আমি ওপরদিকে তাকিয়ে বললাম, কিছু না পিসী। হঠাৎ মনে হল তেঁতুলতলাটায় কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

মানুপিসী বলল, হবে আর কী, পুলিশ চলে গেছে, ওই ছোঁড়াদেরই কেউ, এদের উৎপাতে তো আর পাড়ায় তিষ্ঠানো যাবে না।

সেদিনও বুঝেছিলাম, আজ ইউনিভার্সাল নার্সিংহোমের বিনিদ্র রাত্রিতে আরও নিশ্চিত বুঝতে পারছি, ওটা বরদাকান্তর ভূত ছাড়া আর কিছু নয়। আরেকটু সময় পেলে বরদাকান্ত হয়ত বলতেন কষ্ট, বড় কষ্ট।

বরদাকান্ত, আমার প্রপিতামহ, এই বরদাভবনে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, জানো মানুপিসী, আমি বললাম, সেদিন আমি দেখেছি।

পরদিন জয় কালিমাতা প্রেস থেকে বাবার নামে দুশো টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে মানুপিসীর হাতে তুলে দিলাম, ফিসফিস করে বললাম, তুমি কিন্তু কাউকে বোলো না, মালতিকেও না, কালরাতে শিবুদা এসেছিল এই দুশোটা টাকা তোমায় দেবার জন্য আমার কাছে রেখে গিয়েছিল।

পুলিশ তখনও পর্যন্ত জয় কালিমাতা প্রেসে যায়নি, খবরও নেয়নি। কদিন বাদে যদি নেয়ও ধরতে পারবে না। তাছাড়া খবর না নেওয়ার জন্য তো পুলিশকে আমি দুশো টাকা দিয়েই দিয়েছি।

সেদিন দুপুরে, পিসী ভাল খাইয়েছিল, মোচাচিংড়ি, কলাইয়ের ডাল। অনেকদিন পরে, সেদিন মালতি আমার মাথার কাছে বিছানায় এসে পা ঝুলিয়ে বসেছিল। মালতি আঙুল

দিয়ে আমার চুলে বিলি কাটছিল। বোধহয় বৃষ্টি নেমেছিল, মানুপিসীর ঘরে তার তক্তাপোষে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টেরই পাইনি। কত সহজে ঘুম আসত তখন। মেঘলা দুপুর, তক্তাপোষের ওপর শক্ত তোষক, আধময়লা চাদরে সোঁদা গন্ধ, ঘর গেরস্থালির তেলচিটে গন্ধমাখা। মালতি পাশে, তার সস্তা দামের ছাপা শাড়ির খসখস আর মানুপিসী পাঁচালির সুরে তার অতীতের গল্প গাথা বলে যাচ্ছে। সে কী আজকের কথা, তখন তোরা কোথায়, কোথায় শিবু আর মালতি?

ইউনিভার্সাল নার্সিংহোমে ছ'তলার ওপরের এই কাঁচঘরে এয়ারকুলার আছে, ঘরের বাতাসে একটা হালকা সুরভি, রুম ফ্রেশনার। একটা ঠাণ্ডা নীল বাতি জ্বলছে। রাত দুটোয় সারা কলকাতায় ঘুম ব্যাপ্ত হয়ে আছে, আমার ঘুম আসছে না কেন?

চেয়ারম্যান জানে

বরদা ভবনে মানুপিসীর আসার দিনটা মনে পড়ছে। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে সকালবেলা প্রাণকাকাই নিয়ে এলেন, রাত জেগে ওরা এসেছে শিলিগুড়ি থেকে। সামান্যই জিনিসপত্র, একটা ট্রাঙ্ক, চামড়ার সুটকেশ আর ছোটখাট দুচারটে জিনিস। শিবুদা তখন কত ছোট, মালতি তো আরও। আমি আর বিদেশ ক্লাস ওয়ানে পড়ি। মা বলল, তোমাদের এক পিসী।

ছিপছিপে গড়ন, ফর্সা গায়ের রঙ, সাজগোজে আমাদের গলির তুলনায়, আমার মা, খুড়ী এমনকি রামপদ জ্যাঠামশায়ের বউ, সে তো কলকাতারই মেয়ে, সকলের তুলনায় মানুপিসী যেন অনেক ছিমছাম, পরিপাটি। আমার তো প্রথম দেখেই ভালো লেগে গেল। মাও বলত, বেশ দেখতে তোর পিসীকে, মানদাকে। পিসেমশায় চা বাগানে কাজ করতেন। বাড়ি ফেরার পথে অ্যাকসিডেন্ট—সাতদিন হাসপাতালে থেকে মারা গেলেন। শ্বশুরকুলের কেউ দায়িত্ব নিতে চাইল না, মানুপিসী চেষ্টাও করেছিল শ্বশুরবাড়িতে থাকবার, যে কোনো কারণেই হোক হয়নি। শেষে গণনাথ আর প্রাণনাথ দুই আপন মাসতুতো ভাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল। বরদা ভবনে চলে এল। আমাদের একশরিকের একটা ঘর আর সিঁড়ির চিলেকোঠা তালাবন্ধই ছিল। হাজার পাঁচেক টাকা আর তিরিশ টাকা ভাড়ায় মানুপিসী বরদা ভবনে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেল।

শিবুদা পড়াশোনায় বেশ ভালো ছিল। আমাদের চত্বরে পড়াশোনায় ভালো ছেলের তখন বেশ আকাল ছিল। বেশির ভাগই কোনোমতে ইস্কুলের গণ্ডী পেরিয়েই পড়াশোনা ছেড়ে দিত। আমার ঠাকুরদা বদ্যিনাথ যে বি. এ. পাশ করেছিলেন, এটা বাবা বেশ গর্ব করেই বলতেন। প্রাণনাথ বি এ পাশ করে, কিছুকাল ওকালতি পড়েছিলেন, তারপর হঠাৎ চাকরিতে লেগে যান। আমার বাবা সে যুগের ম্যাট্রিকুলেট ছিলেন। শুভঙ্করী তাঁর মুখস্থ ছিল, সুদকষা, শতকরা অঙ্কগুলো তাঁর বেশ ভালোমত দখলেই ছিল। হয়ত জয় কালিমাতা

প্রেসের বটকৃষ্ণ নস্কর এজন্যেই বাবাকে প্রেস থেকে শুরু করে ভেড়ি, ধানজমি আরও নানা কারবারের ম্যানেজার করে দিয়েছিলেন।

আমি ক্লাস সেভেনের ফাইন্যালে তিন বিষয়ে ফেল করলাম, অঙ্কে সবচেয়ে খারাপ, তের পেয়েছিলাম। বিদেশ বলেছিল, তের সংখ্যাটা অশুভ, তোকে প্রমোশন দেবে না। বাবা হেডস্যারের সঙ্গে দেখা করে বলে দিলে হয়ত আমার প্রমোশন হত।

শিবুদা তখন কলেজে পড়ে, কী একটা স্কলারশিপও পেয়েছে, শিবুদাই বলল, থাকনা একটা বছর স্বদেশের বেসটা তো তেমন ভাল নয়, আমিই না হয় ইংরেজি অঙ্কটা দেখিয়ে দেব। শিবুদা আমার টিউটর হয়ে গেল, পয়সা কড়ি নিত না।

শিবুদা মাঝে মাঝে রাজনীতির কথা বলত— দেশের কথা, পৃথিবীর কথা, বলত পড়াশোনা শিখে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কি জজ ম্যাজিস্ট্রেট হওয়াটাই জীবনের শেষ কথা নয়। কজন লোক আমাদের হরেন ডাক্তারের কথা জানে বল কিংবা করপোরেশনের ইঞ্জিনিয়ার বলাইদা—কজন চেনে জানে বল। অর্থ উপার্জন তো আলুওয়ালা, পটলওয়ালাও করছে, টাটা বিড়লাও করছে। সেটাই কী সব?

আমি যেন তর্কের খাতিরেই বলতাম, কিন্তু টাটা বিড়লার নাম তো সবাই জানে, কাগজে ওদের ছবি থাকে, খবর থাকে।

শিবুদা বলত, রাসকেল সেটা টাকার জোরে। টাকা না থাকলে টাটা বিড়লাকে কেউ পুছত?

আমি চুপ করে যেতাম। শিবুদা একটু বিরক্ত হয়ে মাঝে মাঝেই বলত, তোর আই কিউ চল্লিশের নীচে। আই কিউ মানে ইনটেলিজেন্স কোসিয়েন্ট, বুদ্ধ্যঙ্ক, একটা নির্দিষ্ট স্কেলে বুদ্ধির পরিমাপ। বুদ্ধি মাপার যে একটা স্কেল আছে, সেটা আমি তখনই প্রথম জানলাম। স্কেলটা ঠিক কী ধরনের সে সম্পর্কে আমার খুব একটা স্বচ্ছ ধারণা এখনও নেই। তবে জীবনে যারা সেভাবে সফল, অর্থখ্যাতি এগুলো যাদের বেশি বেশি তাদের আইকিউ যে অনেক অনেক বেশি এরকম একটা ধারণা ক্রমে আমার মজ্জাগত হয়ে গেছে। ইউনিভার্সালের সঙ্গে আমার চুক্তি হতে যাচ্ছে। আই কিউ বেশি না হলে কী আমি এই চুক্তি করতে পারতাম?

এটা সত্যি, মাঝে মাঝে শিবুদার অনেক কথা বুঝতে পারতাম না। মার্ক্স, লেনিন, স্তালিন, মাও এরা ভুবনবিখ্যাত মানুষ, এটা মেনে নিতে আমার বাধা ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দ কেন সেভাবে বিখ্যাত নয়, আমি বুঝতে পারতাম না। শিবুদা বলত, এটাই নাকি প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা, পাতি বুর্জোয়া মানসিকতা।

আমি বলেছিলাম আমাদের পাশের পাড়ার রিক্সাওয়ালা হীরুদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ও রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দর নাম জানে, বেশ ভালই জানে। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ও রিক্সায় কতবার প্যাসেঞ্জার নিয়ে গেছে, ওর বাড়িতে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দর ছবি আছে, কিন্তু ও মার্কস—এঙ্গেলসের নাম শোনেনি, ও কথামৃত পাঠ শুনেছে, কিন্তু দাস-ক্যাপিটালের নাম শোনেনি।

শিবুদা এই যুক্তির কাছে খানিকটা অসহায় বোধ করত দেখেই পরক্ষণে আমি বলতাম, আমি অবশ্য হীরুদাকে বলেছি, শিবুদার কাছে সব শুনে নিও, শিবুদা সব জানে। হীরুদা মাঝে মাঝে শিবুদার কাছে নানা দরকারে আসত, কারও হাসপাতালে ভর্তি, কারও ছেলের ইস্কুলের বইপত্র দরকার, এমনি নানা প্রয়োজনে। শিবুদা বলত, শ্রেণীচেতনা বাড়লেই হীরুদা মার্কস লেনিনের কথা জানতে পারবে। আমাদের পার্টির নাম তো জানে। আমি বলতাম এই এম আর এলটুকু জানে। এম মানে যে মার্কস সেটা জানে না জিজ্ঞেস করো।

শিবুদা যে পলিটিক্স করছে, এটা আমি ভালোই বুঝতাম, কিন্তু কী করে যে গোঁসাইপাড়া বাই লেনের শিবুদা সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের মধ্যে জড়িয়ে গেল বুঝতে পারি নি।

এপাড়ায় অনেক ছেলেই ধানক্ষেত দেখেনি, কী করে চাষ হয় জানে না, কৃষক কেন সংগ্রাম করে তাও তাদের ধারণার বাইরে। আমি অবশ্য বাবার সঙ্গে দুয়েকবার ডায়মণ্ডহারবার ক্যানিং গিয়ে চাষবাস দেখেছি, রোদে পোড়া, জলে ভেজা কৃষকদের জীবন সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু কী নিয়ে তারা সংগ্রাম করবে, তারা যদি সংগ্রাম করে, তাহলে চাষ কে করবে, টাটা-বিড়লা নাকি আমাদের গোঁসাইপাড়া বাইলেনের ছেলেরা, আমি বুঝতে পারতাম না। শিবুদা বলত রাজনৈতিক সচেতনতা এসে গেলে সব বুঝে যাবি। আর তার জন্য চাই শ্রেণী সংগ্রাম।

শিবুদা তখন স্বপ্ন দেখত। শিবুদা যেন ভাবের ঘোরেই বলে যেত, কমরেড সেদিন হয়ত আর খুব দূরে নয়, সমস্ত কলকাতা শহরের দখল নেবে বসিরহাট আর ডায়মণ্ডহারবারের ভূমিহীন, খেতমজুর আর ছোট চাষীরা। সারা পশ্চিমবাংলা পরে সমগ্র ভারত এশিয়া একটা মুক্তাঞ্চল হয়ে যাবে। হাইকোর্টে বসবে গণ আদালত, সেখানে সাম্রাজ্যবাদের দালালদের বিচার হবে। বড়লোকদের পিঠের চামড়া দিয়ে গরীবের পায়ের জুতো তৈরি হবে।

এখনও ইউনিভার্সালের তিনতারা কেবিনে কখনও কখনও সেই আবেগ যেন আমাকে ক্ষণিকের জন্য ছুঁয়ে যায়। চিৎ হয়ে শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে ভাবি, আচ্ছা এমনটা হল না কেন? হলে কেমন হত? আমরা বরদা ভবনের লোকেরা কী বড়লোক ছিলাম, না গরীব? আমাদের চামড়া দিয়ে জুতো তৈরি হত, নাকি শিবুদার চেনাজানা বলে আমরা বড়লোকের চামড়া দিয়ে তৈরি জুতো পরতে পেতাম। মানুষের চামড়া দিয়ে কী জুতো হয়? সহসা শরীরে কেমন যেন কাঁপুনি আসে। গাধাবোটে খড়ের মানুষদের ভেতরে শুধু তো একটা কাঠামো, আর খড়, বাইরে তো চামড়াই, মানুষের চামড়া। গরীবরা কী খড়ের মানুষ। শিবুদা নেই যে জানা যাবে। বড়লোকরাও খড়ের মানুষ হতে পারে।

শিবুদা যখন তার স্বপ্নের কথা বলত, আমার ভালো লাগত, ভয়ও লাগত। সেই স্বপ্নের মধ্যে বরদা ভবনের স্বদেশ চাটুজ্জের জন্য গড়ের মাঠে না হলে টালা পার্কের এক টুকরো সবুজ ধানক্ষেতে এক আশ্চর্য সময় অপেক্ষা করে আছে, ভাবলে এই ভয় আর ভালোলাগা মেশানো গা শিরশির করা অনুভূতিটা আমি টের পেতাম। বাবার জন্য আমার ভয় হত মাঝেমাঝে। বাবা সুন্দরবনের লাট এলাকায় বটকৃষ্ণ নস্করের জোউজমার ভাগ আদায়

করতে যেতেন। আমি তেভাগার গল্প শুনেছিলাম। শিবুদাও বলেছিল মামাকে একটু সাবধানে থাকতে বলিস। দিনকাল ভালো নয়, কী থেকে কী হয় বলা যায় না।

আমি বলতাম সত্যিই এরকম হবে শিবুদা? ক্যানিং, কাকদ্বীপ থেকে খেতমজুররা এসে কলকাতার দখল নিলে, আমরা কোথায় থাকব? বরদা ভবনে কী আমরা আর থাকতে পারব?

শিবুদার কানে যেন এসব কথা ঢুকতই না, বলত আমরাও একদিন লং মার্চ করব দেখবি, ভারতের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত।

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করতাম, তখন চীনের বিখ্যাত লং মার্চের কিছু কাহিনী আমার জানা হয়ে গেছে, কবে এসব হবে শিবুদা।

শিবুদাও যেন, আকাশের দিকে তাকিয়ে এর একটা উত্তর খুঁজত, মনে হত—হঠাৎ আমার চোখে চোখ রেখে বলত, আমরা এখনও সবটা জানি না। হয়ত আর হয়তই বা বলছি কেন, চেয়ারম্যান জানে, নিশ্চিত জানে।

চীনের চেয়ারম্যান তখনও আমাদের চেয়ারম্যান হননি, বন্দুকের নলও ক্ষমতার উৎস হিসেবে খুব একটা প্রাধান্য পায়নি। তখন ক্ষমতার উৎস বলতে আমরা পেটো বা হাতবোমাকেই বুঝতাম। নানা আকারের ছোটমাল, বড়মাল হিসেবেই এগুলো বাজারে চলত। আমাদের বেলগাছিয়া, টালা, কাশীপুর থেকে ওদিকে বরানগর পর্যন্ত পেটো একটা কুটির শিল্প হিসেবেই গড়ে উঠেছিল। সাধারণভাবে দোল দুর্গোৎসবে, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলায়, বিজয়া বা সরস্বতী পুজোর ভাসানে পেটোর একটা সর্বজনীন সামাজিক ব্যবহার ছিল। এটাতে কেউ কিছু মনে করত না। কিন্তু সেই পেটো ছোটমাল কিংবা বড়মাল হিসেবে যখন ক্ষমতার উৎস হয়ে উঠত তখন কিন্তু তা হত সত্যিই ভয়ংকর। পেটোর মালমশলা খুব সামান্য। সেগুলো দিয়ে ভুঁইপটকা, কালি পটকা বা চকোলেট বোমা বানানো যায়, দেওয়ালিতে জ্বালানোও যায় অনায়াসে। কিন্তু পেটোকে যদি ক্ষমতার উৎস হয়ে উঠতে হয়, তাহলে মোমছাল, পটাশ, কেরোসিন তেল, পাটের দড়ির সঙ্গে মরচে পড়া লোহার স্ক্রু, ধারালো লোহার বা কাচের টুকরো এগুলোও প্রয়োজন হবে। বিশাল বিস্ফোরণের সাথে সাথে ওই সব লোহা, কাঁচের টুকরো তীব্রগতিতে লক্ষ্যবস্তুকে, অবশ্যই মানুষ, ভেদ করে বেরিয়ে যাবে। পেটো সম্পর্কিত আমার অভিজ্ঞতা অনেকটা এইরকম। তখন বোধহয় ক্লাস টেনে পড়ি।

গেরিলা যুদ্ধের বিষয়ে শিবুদা একটা বই আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন তার বেশির ভাগই আমার বোধগম্য হয়নি। এখন ভোরবেলা ইউনিভার্সালে চা খেতে খেতে আমি কিছুতেই মনে করতে পারলাম না সে বইয়ে আমাদের কলকাতার পেটো সম্বন্ধে কোনো আলোচনা দেখেছি কিনা।

সকালে একটি অল্পবয়েসী ডাক্তার আমার জেনারেল চেক আপের জন্য কেবিনে আসেন। সময় নেন অনেকটাই, পালস দেখেন, চোখের নীচে টেনে ধরে চোখের কোল দেখেন, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বেশ কবার বুকে পিঠে স্টেথো চেপে ধরেন, বলেন শ্বাস নিন, আরও জোরে নিন।

উনি নিশ্চয়ই নিজের মত বোঝেন, তবু জিজ্ঞেস করেন, আজ কেমন বোধ করছেন? রোজই এক রকম, এক রকম।

আজ আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনার পেটো সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা আছে? প্রথমটায় বুঝে উঠতে পারেননি। আমি বুঝিয়ে বলতে, বললেন কোন যুগে পড়ে আছেন, এখন হচ্ছে স্টেনগান, এ কে ৪৭ এসবের যুগ। পেটো-ফেটো ব্যবহার হলেও আমার মনে হয় খুব অল্পই। আপনি আর. ডি. এক্স বলতেন, তো বুঝতাম ওটাই এখন পর্যন্ত লেটেস্ট। কয়েক কেজি মশলা হলে আমাদের ইউনিভার্সাল উড়ে যাবে। বোম্বেতে কী হয়ে গেল দেখলেন না?

আমার মনে আরেকটা প্রশ্নও মাঝে মাঝে খুব উঁকি মারে জানেন, আমি ডাক্তারকে বললাম। ডাক্তার পেশাদারী কৌতূহলে ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন। আমি বললাম, না আমার শরীর নিয়ে কিছু নয়, আপনি কী বলতে পারেন মানিকতলা বোম কেসে মানে বুঝতেই পারছেন তো, আমি স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই বিখ্যাত বোম কেসটার কথা বলছি, সেই কেসটায় কী এই পেটোর মশলাই পাওয়া গিয়েছিল? আচ্ছা ধরুন ক্ষুদিরাম যে বোমটা ছুঁড়ে ছিলেন, শহীদ ক্ষুদিরাম, সেটা কী আমাদের এই এখনকার মতই পেটো?

ডাক্তার স্মিত হাসলেন বয়সের তুলনায় বেশি গাম্ভীর্য ছিল সেই হাসিতে। বললেন, কী সব আজেবাজে ভাবনা চিন্তা করছেন বলুন তো। আমি বললাম ভুল বুঝবেন না আমি কিন্তু আমাদের শহীদদের প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করি। সেটা কথা নয়, আমি বুঝতে চাইছি এখনকার পেটো, স্বাধীনতার আগেকার, মানে আমাদের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের পেটো একই কিনা। ডাক্তার বোধহয় বিরক্তই হলেন, বললেন, রাত্রে ঘুমোননি ভালো করে? কাল আপনাকে নার্স ঘুমের বড়ি দেয় নি, তাই না।

আমি ডাক্তারকে বললাম, আপনার আই কিউ খুব বেশি, হয়ত একশো ষাটেরও বেশি। আমার হয়ত পঞ্চাশ ষাট। মাথাটা দুফাঁক হয়ে গেলে, আমার মগজের ঘিলু অনেকটাই গলে বেরিয়ে গেছে। আমার আই কিউ এখন হয়ত মাখন শূন্য।

কমবয়েসী ডাক্তারটি হয়ত একটু বিব্রত হলেন। বললেন, আপনার আই কিউ যথেষ্ট ভালো। কিন্তু এত কিছু থাকতে হঠাৎ আপনার পেটোর কথা মনে এল কেন?

আমি সেকথার উত্তর না দিয়ে বললাম, আপনি বোধহয় আমার প্রশ্নটা ঠিকমত ধরতে পারলেন না। ডাক্তার হেসে ফেললেন, বললেন আমি তো হিসট্রির স্টুডেন্ট নই। পেটোর কথা শুনেছি কিন্তু এখনকার পেটো আর নাইনটিন টুয়েনটিজের পেটো ঠিক একই জিনিস কিনা সত্যি বলছি আমার জানা নেই। আমি অস্ফুটে বললাম, চেয়ারম্যান

হয়ত জানেন, হয়ত কেন নিশ্চিত জানেন। ডাক্তারকে বললাম, সেটা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম, আমাদের ছিল শ্রেণী সংগ্রাম, পেটো একই।

তো তখনও একটা সংগ্রাম চলছে, কলকাতার ওই প্রান্তে বিস্তীর্ণ এলাকায়। সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম বা গেরিলা যুদ্ধ নয়। কেউ কেউ বিষয়টিকে শরিকী সংঘর্ষ হিসেবে উল্লেখ করত সেরকম কথা কোনো কোনো কাগজেও লিখত। শিবুদা তখন একটা বামপন্থী দল করত। কিন্তু সেই একই দলের দুজন যখন প্রকাশ্যে রাস্তায় পেটোবাজি করত সংগ্রামের ব্যাপারটা আমার গোলমাল হয়ে যেত। ইউনাইটেড ফ্রন্ট চলাকালীন যথাযথ বামপন্থী দলের কী করা উচিত সে সম্পর্কে লেনিন আর মাও সে তুংয়ের লেখা শিবুদা পড়তে দিয়েছিল। শিবুদা তখনও নকশাল হয়ে যায়নি।

আমি বলেছিলাম, কিন্তু তুমি আর ভোলাদা তো একই দলের লোক, তাহলে বাজারে পয়সা তোলা নিয়ে, বারোয়ারি পুজো নিয়ে তোমরা সময়ে অসময়ে পেটোবাজি করছ কেন? দুজনেই বাড়ি বাড়ি ঘুরে পেটোর মশলা কেনার চাঁদা তুলছ কেন?

শিবুদা বলত, দেশটা তো ভারত, শহরটা কলকাতা. এখানে ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে ট্যাকটিকসের ক্ষেত্রে একটা পার্থক্য থাকবেই। উনিশশো সাতষট্টিতে তো উনিশশো সতেরর বলশেভিক মুভমেন্ট করা সম্ভব নয়, সাঁইতিরিশ সালের চীনের মুভমেন্টও অবাস্তব। আমরা পার্লামেন্টারিয়ান সিসটেমকে ব্যবহার করে শ্রেণী সংগ্রামটা চালিয়ে যাব।

ভোলাদার লেদ মেশিন ছিল একটা, নিজে আর দুজন লেবার মিলে চালাত। আমি ভোলাদাকে শ্রেণীশত্রু ভাবতে শুরু করেছিলাম। শিবুদার দিকের কয়েকজন একদিন রাত্রে বি.টি রোডের ধারে ভোলাদার কারখানাটাই জ্বালিয়ে দিল।

তারপর ভোলাদা অনেক রাউণ্ড পেটোবাজির পর কীভাবে সন্ধি প্রস্তাবে রাজী হল, আমার সে বিষয়ে অনেকটাই জানা নেই। আমার যমজ ভাই বিদেশ হয়ত জানত। বিদেশের আই কিউ যে আমার চেয়ে বেশি, সেটা শুধু শিবুদা নয়—আমার ইস্কুলের মাস্টারমশাইরাও বলত। ও একচান্সে উচ্চমাধ্যমিকের গাঁট পেরিয়ে গেল, ভালো রেজাল্ট করল। বিদেশ আর আমি যমজ ভাই, আমি কেন বিদেশের মত হলাম না, জানি না। মালতিও বলত, তুমি তো একটা আস্ত হাঁদারাম।

আমি ঘুড়ি ওড়াতে ভালোবাসতাম। সামনে ইস্কুলের টেস্টপরীক্ষা, তবু ঘুড়ির টানে ছাদে উঠে এসেছি। সেদিন বিশ্বকর্মা পুজো, রুপোলি মেঘ পেঁজা ধবধবে সাদা তুলোর মত, আর কী গাঢ় নীল আকাশ। যতদূর চোখ যায় কত রঙের, কত বাহারের ঘুড়ি। লাটাইয়ে হাত দেব না দেব না করেও বরদা ভবনের দোতলার ছাদ থেকে ময়ূরপঙ্খী ঘুড়িটা ভাসিয়ে দিলাম।

বিদেশ আমার যমজ ভাই ছাদে এল। ওতো আগের বছর পাশ করে গেছে। কলেজে পড়ছে সায়েন্স নিয়ে। বিদেশ পড়াশোনায় আমার চেয়ে অনেকটাই ভাল। শিবুদার কাছাকাছি থেকে হঠাৎ একদিন আমি প্রায় আবিষ্কারই করি ও শিবুদার ছায়া হয়ে গেছে। শিবুদাও বলত, বিদেশ আমার চেয়ে অনেক শার্প, কামপুচিয়া ভিয়েতনামে কী হচ্ছে, ও বুঝতে পারে, আমি পারি না।

বিদেশ এখন অস্ট্রেলিয়ায়, এন. আর. আই। ও হয়ত জানেও না, তারই যমজ ভাই, আমি কুড়ি মিনিট আগে জন্মেছি, এখন ইউনিভার্সালের কেবিনে, মাথায় একটা গভীর ক্ষত নিয়ে বিছানায় শুয়ে আছি, তার কথাই ভাবছি। বিদেশ কী কোনোদিন দেশে ফিরবে নাকি ওখানেই থেকে যাবে। বিয়ে করেছে, ওর অস্ট্রেলিয়ান বউ কী শাড়ি পরে, আমার বড় দেখতে ইচ্ছে করে। প্রপিতামহ বরদাকান্ত জাহাজঘাটে পাটের দালালি করত। সে কি কখনও ভাবতে পেরেছে তারই প্রপৌত্র শ্রীমান বিদেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এন.আর আই হয়ে যাবে, মোমের মত ফর্সা মেমসাহেবকে নিয়ে ঘর করবে, দেশান্তরী হবে অন্য মহাদেশে।

তো বিদেশ ছাদে এল, বলল, শিবুদার নির্দেশ, ছাদ থেকে বড় রাস্তার দিকে নজর রাখবি।

আমি বললাম কেন?

বিদেশ আমার কনুই ধরে আলসের ধারে টেনে নিয়ে গেল। ময়ূরপঙ্খীটায় ততক্ষণে অনেক সুতো ছেড়েছি, ঘুড়িটা হয়ত ভাসছে গঙ্গার ওপরে। বিদেশ বলল, টিকটিকি লেগেছে, নীচে গলিতে মানে বরদা ভবনের ভাঙা পাঁচিল আর সাবিবদ্ধ চারটে খাটা পায়খানার মাঝখানের গলিতে, শিবুদার ছেলেরা মাল বানাচ্ছে। আজ পাশের পাড়া থেকে হামলা হতে পারে। পুলিশ দেখলে আওয়াজ দিবি। বড় রাস্তার দিকে চোখ রাখবি।

আমি উঁকি দিয়ে দেখলাম, সত্যি গলিতে ওই প্যাসেজটা দিয়ে করপোরেশনের লোক খাটা পায়খানার ময়লা নিয়ে যায়। পাঁচ ছজন উবু হয়ে বসে কাজ করছে। বেশ কিছু খবরের কাগজ, কেরোসিনের একটা ছোট টিন এসব থেকেই আমি বুঝলাম প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে।

একটু অন্যমনস্ক হয়েছি, আকাশের ডানদিক থেকে একটা কালো পেটকাটা ঘুড়ি, আমার ময়ূরপঙ্খীকে প্রায় জানান দিয়ে খানিকটা ওপরে উঠে গেল, আমি সুতো ছেড়ে যাই দ্রুত, লাটাই হালকা হয়ে আসতে থাকে। কেমন এক অজানা ভয়ে আমার ময়ূরপঙ্খী তিরতির করে কাঁপতে থাকে। লাটাই ধরার জন্য কাউকে পাওয়া গেলে একটু বুঝে নেওয়া যেত। কিন্তু দুতিনটে অনভিজ্ঞ বাচ্চা কাচ্চা ছাড়া ছাদে কেউ নেই, ওদের হাতে লাটাই ছাড়া যায় না। পেটকাটা কালো ঘুড়িটা একটা শিকরে বাজের মত নেমে এসেছে। প্যাঁচ লেগেছে, দুটো ঘুড়িই অনেকখানি আকাশ নিয়ে দামাল হয়ে ছুটছে, কখনও ক্লান্তভাবে নিজেকে এলিয়ে দিচ্ছে। কতখানি সময় এভাবে কেটে গেছে জানিনা। শ্বাস বন্ধ করা কতকগুলো মুহূর্ত আমি ময়ূরপঙ্খী আর পেটকাটা ঘুড়ির দিকে পলকহীন তাকিয়ে থেকেছি, তাও জানি না। হঠাৎ গলির প্যাসেজে ছুটোপাটি ধ্বস্তাধস্তি, পুলিশের বাঁশি। ঘুড়িটা তখন প্যাঁচে পড়ে লাট খাচ্ছে,

লাট খাচ্ছে। কালো পেটকাটা ঘুড়িটা ওপরে উঠে যাচ্ছে, তীরগতিতে নীচে নেমে আসছে। আলসের ওপর থেকে উঁকি দিয়ে দেখলাম, পুলিশ।

আশেপাশের ছাদ থেকে সামনের মাঠ থেকে সমস্বরে চীৎকার উঠল ভোকাট্টা। বরদা ভবনেরই এক ভাড়াটের ছেলেটা, বছর আট দশ, খুব মিষ্টি চেহারা ছিল ছেলেটার, নামটা এখনও মনে পড়ছে না, বলল, সদাদা তোমার ময়ূরপঙ্খীটা কেটে দিল।

অনেকদিন সেরকম নীল আকাশ দেখিনি, পেঁজা তুলোর মত সাদা মেঘ দেখিনি, বড় দেখতে ইচ্ছে হল। ইউনিভার্সাল কী আমাকে দেখতে দেবে? সেদিন কোনটার দিকে আমার নজর রাখা উচিত ছিল আজও বুঝিনা। শ্রেণীসংগ্রামের স্বার্থে পেটোর গুরুত্ব আছে নিশ্চয়ই। পুলিশ অনেক পয়সার মাল মশলা তুলে নিয়ে গেল। হাতকাটা কার্তিক, খুব ভালো মাল বাঁধত সে, পুলিশ টেনে হিঁচড়ে থানায় নিয়ে গেল। সবচেয়ে মারাত্মক, শিবুদা আমাকে রেনিগেড, ট্রেটার দায়িত্বহীন বিশ্বাসঘাতক বলল, তাও মালতির সামনে, বিদেশের সামনে। সেদিনও ভেবেছি এখন ইউনিভার্সালের নরম গদিতে গা ডুবিয়ে ভাবছি, কোনটা ইমপর্টান্ট ছিল সেদিন আমার কাছে, আমার ময়ূরপঙ্খী ঘুড়ি না পেটোর মশলা, কোনটা, পেটকাটা কালো ঘুড়ির সঙ্গে আমার সংগ্রাম না শিবুদার শ্রেণী সংগ্রাম? চেয়ারম্যান কী এ প্রশ্নের উত্তর জানে? আমার ভেতর থেকেই কে একজন উত্তর দিল, বিমর্ষ, না—এ প্রশ্নের উত্তর চেয়ারম্যান জানে না।

ঘুম আসছে, সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারিনি। অস্ফুটে বললাম, চেয়ারম্যান ক্ষমা কোরো। আমাকে ঘুমোতে দাও চেয়ারম্যান।

পুনর্জন্ম

ভারত বন্ধ বা বাংলা বন্ধ নয়, লোকাল বন্ধ। বি.টি রোডে যান চলাচল কম হলেও চলছে, সকালে পিকেট ছিল, পুলিশ এসে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বি. টি রোডের পর থেকে আমাদের গলি পাইকপাড়া বেলগাছিয়া পর্যন্ত দোকান পাট, রাস্তাঘাট সব বন্ধ। বারো ঘণ্টার বন্ধ, পাশের পাড়ার একটা ছেলে পেটোয় মারাত্মক জখম হয়েছে। তার বুক লক্ষ্য করে পেটো ছোঁড়া হয়েছে, অথবা শহীদ সে, আজ সকালে গোটা কুড়ি ইঁট সাজিয়ে, অস্থায়ী শহীদবেদী হয়েছে, নিশ্চিত শহীদ সে, আর সেই কারণেই হয়ত সে পেটোর বিস্ফোরণ বুক পেতে গ্রহণ করেছে। হাসপাতালে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছেলেটা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেছে।

বন্ধের বিরোধিতা খুব একটা ছিল না, কারণ ছটি না সাতটি পার্টিই দাবি করেছিল অমর শহীদ, পাইকপাড়া অঞ্চলের বীর সন্তান তাদেরই দলের। সেদিন সন্ধ্যায় শিবুদার নেতৃত্বে

গোঁসাইপাড়া বাই লেন থেকে শান্তি মিছিল বেরোয়। অন্যসব পাড়া থেকেও মিছিল বেরিয়েছিল। ঠাকুরদা বৈদ্যনাথকে একটা অ্যামবুলেনসে চাপিয়ে বাবা বরদা ভবনে নিয়ে এসেছেন, সেদিন সন্ধেতেই তো।

ইদানীং রক্তচাপ খুব বেড়ে গিয়েছিল বৈদ্যনাথের। তার ওপর পঞ্চ মকারে দুরুহ তন্ত্র সাধনা শরীরে সয়নি। দিন দশেক আগে, নাক মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত, বসিরহাটের বাগানের কালিমন্দিরে। জনাকয় ভক্ত কোনভাবে বৈদ্যনাথকে বারাসাত হাসপাতালে পৌঁছয়। তিনদিন তিনরাত কেটে যাওয়ার পর রোগীর হুঁস আসে। ডাক্তার বলেছিল, মাসিভ স্ট্রোক, রক্ত বেরিয়েছে বলে প্রাণে বেঁচে গেছেন, তবে নীচের অঙ্গ পুরোপুরি পড়ে গেছে। নিম্নাঙ্গে পক্ষাঘাতগ্রস্ত বৈদ্যনাথ বরদা ভবনে আমাদের দেড়খানা ঘরের আধখানার দখল নিলেন। খুড়িমা সোহাগবালার ঘোরতর আপত্তি ছিল।

সোহাগবালা আর প্রাণনাথ কিছুদিন ধরেই বাবাকে বলেছিলেন, তাঁরা বরদা ভবন ছেড়ে চলে যাবেন। খুড়িমার বাপের বাড়ির অবস্থা ভালো, প্রাণনাথের খানিকটা লেখাপড়া আছে, ওকালতি পড়া আছে, পাশ করেননি যদিও, তবুও যাহোক কিছু হয়ে যাবে। খুড়িমার শরীরেও জল জমছিল। পরিশ্রম করা, সংসারের রোজকার ঠেলা সামলানো তার পক্ষেও সম্ভব নয়। তাছাড়া পারুলেরও তো একটা ভবিষ্যৎ আছে। এ পাড়ায় চতুর্দিকে যা চলছে, তাতে তো ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

মুকুল টেস্টে রেজাল্ট ভালো করেনি। আর পারুল মাঝখানে পাশের পাড়ার একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়েছিল, কালিঘাটে সিঁদুর পরানোও হয়ে গিয়েছিল। একটা রাত সেই ছেলেটার মামার বাড়ি মজিলপুরে কাটানোর পর পুলিশ তাদের হদিস পায়। পুলিস ওদের আর কোর্টে তোলেনি। প্রাণকাকার অনেক চেনাজানা, তাদেরই কাউকে ধরে বনড্ দিয়ে পারুলকে থানা থেকে বাড়ি নিয়ে আসেন প্রাণকাকা, পারুল তার পর থেকে ভাগলপুরে তার মামার বাড়িতে।

অনেক ধোয়ার পরেও পারুলের মাথার সিঁথি থেকে সিঁদুরের দাগটা পুরোপুরি যায়নি, মালতি আমাকে বলেছিল। মালতি মাঝে মাঝেই বলত, চল না স্বদেশদা, তুমি আর আমি পালাই অনেক অনেক দূরে কোথাও পালিয়ে যাই।

পালিয়ে গেলে বোধহয় ভালোই হত। তাহলে, আজ এভাবে মাথা জোড়া একটা সেলাই নিয়ে আমাকে ইউনিভার্সালের কেবিনেও পড়ে থাকতে হত না। কতদিন আছি আমি এখানে? ঘরে সবই আছে, একটা ক্যালেন্ডার নেই। ঘরে কাগজ আসে, কিন্তু অনেকদিন কাগজ পড়াই হয় না—দিনের হিসেব গোলমাল হয়ে যায়। এরা আর কতদিন আটকে রাখবে আমাকে?

হাজার হলেও বদ্যিনাথ আমার কাকারও জন্মদাতা বাপ। ফলে খুড়িমা অধৈর্য হয়ে উঠলেও, প্রাণনাথের পক্ষে তখনই বরদা ভবন ছেড়ে চলে যাওয়া সম্ভব ছিল না। মুকুল আমার সঙ্গেই ফাইন্যাল দিয়েছিল। রেজাল্ট বেরয়নি তখনও। ও বলত, আমি তো তোদের সঙ্গেই থাকতে পারি, আমার ভাগলপুর যেতে একদম ভাল লাগছে না। আমার বাবাকেও মুকুল বলেছিল, জেঠু, তুমি একবার বল না, আমি ভাগলপুর যাব না।

মা মারা যাওয়ার পর থেকে আমি আর আমার যমজ ভাই বিদেশ তো একাই ও বাড়িতে থেকেছি। তখনও প্রাণকাকারা আলাদা হয়ে যায়নি। খুড়িমাই সংসারের সব দেখাশোনা করত। বরদা ভবনের একটা ঘরে আমি আর বিদেশ একখাটে পাশাপাশি শুয়ে কত রাত পর্যন্ত গল্প করতাম। বরদাকান্তর ভূতের গল্প, ইস্কুলের বন্ধু আর মাস্টারমশাইদের গল্প, আমাদের মায়ের গল্প।

বিদেশ আমার চেয়ে অনেক বেশি খবর রাখত ঘর সংসারের। খুড়িমা মানুপিসীর সঙ্গে গল্প করতে করতে কী বলল, মালতি কী বলল, তার উত্তরে মানুপিসী কী বলল সবকিছুই বিদেশ বলত রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে। ঘরের আলো নিবে গেলে একটা গা ছমছম করা অন্ধকার যখন সমস্ত ঘরে ভেসে বেড়াত, বিদেশ তখন কথা বলত। সারাদিন বিদেশের সঙ্গে আমার কথা হত না, ও নিজের মনেই ঘুরে বেড়াত, কখনও ছাদে, কখনও মানুপিসীর ঘরে আবার কখনও শিবুদার সঙ্গে গঙ্গার ধারে চলে যেত, অথবা হেঁদুয়া নয়ত মোহনবাগানের খেলা দেখতে ময়দানে। এমনি এক ঘুম না আসা রাত্রে, হঠাৎ ঝড় উঠল, কাছেই কোথাও বাজ পড়ল, ঘরের খোলা জানালার পাল্লাগুলো আছাড়ি, পিছাড়ি, তারপর বৃষ্টি, মুষলধারে বৃষ্টি। ভেতর বারান্দা থেকে মাঠের তেঁতুলগাছটা দেখা যায়। বরদার ভূত নাকি ওই গাছে থাকে, গাছটা ভীষণ দুলছিল। আমার সেদিন কেমন যেন ভয় ভয় করছিল। বিদেশকে বললাম, তোর ভয় করছে না? বিদেশ বলল, জানিস সদা, খুড়িমা বলেছে মা নাকি মরে ভূত হবে। মা নাকি অপঘাতে মরেছে। অপঘাতে মরলে মানুষ মরে ভূত হয়।

আমার সেই প্রতিমার খড়ের কাঠামোর কথা মনে পড়ল। চিতা ধুইয়ে দেওয়ার জন্য কলসী নিয়ে জলে নেমেছি, ঘাটের কিনারে একটা খড়ের কাঠামো। স্বপ্নে ওই খড়ের কাঠামোতে মাটি লাগল, রঙ লাগল, প্রতিমা লাল পেড়ে ডুরে শাড়ি পড়ল, আমি বললাম, মা তুমি খড়ের মানুষ। বিদেশকে আমি স্বপ্নের কথা বলিনি, আমি বললাম, কেন, মা মরে ভূত হবে কেন?

বিদেশ বলল, খুড়ি বলেছে মায়ের নাকি ওলাওঠা হয়নি, মানুপিসীকে বলল, কত ঢঙই জানো ঠাকুরঝি, ওলাবিবির মানত আরও কতকি। ওর গবভে তো পাপ ঢুকেছিল। আমি ফিসফিস করে বললাম, পাপ, কার পাপ বিদেশ? কিন্তু আমি যে নিজের চোখে দেখেছি, মা বমি করছে, চাল ধোয়া জলের মত পায়খানা করছে। ওলাওঠা কী পাপ?

বিদেশ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, বলল, মানুপিসীও জানত মায়ের পেটে বাচ্চা ছিল। পিসীর কাছে নাকি ওষুধ চাইতে গিয়েছিল মা। খুড়িমা বলছিল, বটঠাকুরকে কোন লজ্জায় আর মুখ দেখাবে? তাই কালোমুখ আরো কালো হওয়ার আগেই বিষ খেয়েছে। আমি বিদেশের কথা শুনছিলাম না, বৃষ্টির শব্দ শুনছিলাম।

শেষরাতে বদ্যিনাথের টান উঠল। চোখ উলটে যাচ্ছে বারবার, মুখে ফেনা উঠছে, জল দিলে ঠোঁটের কষ গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। কী যেন বলতে চাইছিলেন, দুর্বল হাত তুলে বাবাকেই বোধহয় কাছে ডাকলেন। কাকাকে ঠাকুরদা খুব একটা পছন্দ করতেন না। কাকা ফিসফিস করে বলল, পারলে হীরের আংটির খবরটা জিজ্ঞেস কর দাদা, মরে গেলে তো আর জানাই যাবে না।

বাবা বদ্যিনাথের পাশে বসলেন, নীচু হয়ে ঠাকুর্দার মুখের কাছে কান নিয়ে গেলেন। ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে গলা দিয়ে, অল্প হেঁচকি উঠছে বাইরে বরদা ভবনের বেশ কয়েকজন, পাড়ার কিছু চেনামুখ। মানুপিসী একটা ছোট বাটিতে গঙ্গার জল আর একটা চামচ এগিয়ে দিলেন। বাবা খুব নিবিষ্ট, উৎকণ্ঠ, তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি হয়ত বদ্যিনাথের শেষ কথাগুলো বুঝতে পারছিলেন। কথাগুলো বলার পরই ঠাকুরদার চোখ দুটি স্থির হয়ে গেল। বাবা চীৎকার করে বললেন, গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম।

বরদা ভবনে নিজের অংশ বেচে দিয়ে প্রাণনাথ পাকাপাকি ভাবে ভাগলপুর চলে যাবেন, বললেন। এখানে দোকানের খাতা লিখে আর উকিলের মুহুরিগিরি করে তার চলছে না। মা মরার কয়েকবছর পর থেকেই বাবা প্রায় স্থায়ীভাবেই ক্যানিংয়ে থেকে যান। বটকৃষ্ণ নস্করের ধানজমি, ভেড়ি, নানা দ্বীপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আরও নানা ব্যবসা দেখাশোনা করতেন গণনাথ। আমরা জয় কালিমাতা প্রেস থেকে দরকারমত টাকা চেয়ে নিয়ে আসতাম, বাবা সপ্তাহে একবার, পরে আরও কম আসতেন বরদা ভবনে।

জয় কালিমাতা প্রেসের এক কর্মচারি সুবলদা আমাকে বলেছিল, মালিকের বিধবা মেয়ের দেখাশোনা করে গণনাথ, সেটাই নাকি তার আসল কাজ, মেয়ের জমিজমা, ভেড়ি, আরও পাঁচরকমের ব্যবসা। বটকৃষ্ণ কতদিক সামলাবে। বাবু বড় বিশ্বেস করেন তোমার বাবাকে, আর গণাবাবু মানুষটিও ভাল। বটকৃষ্ণের জামাইকে নাকি ডাকাতরা টাঙ্গি দিয়ে কুপিয়ে কেটে ফেলেছিল।

গলির মোড়ে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। খুড়িমা ডুকরে কেঁদে উঠল, মুকুলের চোখে জল। কাকা বাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। তারপর বাবাকে বলল, দাদা অমন যে কান লাগিয়ে শুনলে, কী বললেন বাবা মরার সময়, হীরের আংটির কথা কিছু জানতে পারলে? তুমি তো আর কিছু বললেই না।

বাবা একমুহূর্ত প্রাণনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, মরার সময়ে বাবার শিয়রে বরদা এসে দাঁড়িয়েছিলেন, বলছিলেন বড় কষ্ট বড় কষ্ট, তিনি আবার জন্মাবেন, তাঁর মুক্তি নেই আমাদের বংশে বরদা ভবনে তিনি আবার জন্মাবেন।

ইউনিভার্সাল নার্সিংহোমে অলস দুপুরে তন্দ্রার ঘোরের মধ্যে আমি ভাবতে চেষ্টা করছিলাম বরদার কথা। বরদাকান্ত চট্টোপাধ্যায় জাহাজঘাটে পাটের দালালি করতেন। সে যুগে তেমন জমিজমা না থাকলেও ধান চালের ব্যবসা ছিল তাঁর সাহেবদের সঙ্গে। এছাড়া বন্ধকী কারবার তো ছিলই। পয়সাকড়ি ভালই করেছিলেন। বরদা ভবন তাঁরই প্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সাবিত্রীবালাকে বাড়িটা লিখে দিয়েছিলেন তিনি। প্রথম পক্ষের জন্য ভবানীপুরের জগুবাবুর বাজারের পেছনের বাড়িটা তো আগেই ছিল।

বৌবাজার এলাকায় আরও একটি বাড়ি ছিল শুনেছি, খুব ভালো এলাকায় নয় বলে ওই বাড়ির নাম বড় একটা কেউ করে না। বরদা জীবিত থাকতেই সে বাড়ি নাকি বেদখল হয়ে গিয়েছিল। শুধু বদ্যিনাথ দুয়েকবার কোর্ট কাছারি, সেটেলমেন্ট রেকর্ড, করপোরেশন অফিস নানা জায়গায় দৌড়ঝাঁপ করে বৌবাজারের বাড়িটা উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন। বাড়িটা ছিল বরদার এক রক্ষিতার নামে, তাঁর গুরুদেবের শিষ্যা, অরক্ষণীয়া থাকবে, এজন্য গুরুর আদেশেই তাকে বরদা বৌবাজারের পতিতাপল্লীর সীমানায় একটা একতলা বাড়ি কিনে দিয়েছিলেন। এ হেন বরদাকান্ত, জীবনে যা কিছু চাইবার থাকে সবই তো পেয়েছেন, আবার তিনি জন্মাবেন কেন? আর যদি জন্মগ্রহণই স্থির করে থাকেন, বরদা ভবনে কেন, আমাদের বংশেই বা কেন?

হীরের আংটিটা নিয়ে আমাদের পরিবারে নানারকম গল্প চালু আছে। আমাদের শরিকদের প্রায় সবাই আংটিটার কথা জানে, কিন্তু কেউ সেটা চোখে দেখেনি। শোনা যায় হিলটন নামে এক সাহেব, খাঁটি সাহেব, বরদার খুব কাছের মানুষ ছিল। পাটের গুদামে আগুন লেগে হিলটনের অনেক টাকা লোকসান হয়ে যায়। সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, বিলেত যাওয়ার আগে সে নাকি হীরের আংটিটা বরদাকান্তর কাছে পাঁচ হাজার টাকায়, সে সময়ে পাঁচ হাজার অনেক টাকা, বাঁধা দেয়। ইংলণ্ড পৌঁছবার আগেই হিলটন মারা যায়। হীরের আংটিটা বরদাকান্তর কাছেই স্থায়ীভাবে থেকে যায়।

বদ্যিনাথ মারা যাওয়ার পর মানুপিসী বলেছিল, ভৈরবীই হয়ত ওটা নিয়ে সরে পড়েছে। বরদার শেষসময়ে বদ্যিনাথ তাঁর কাছে ছিল, সে ছাড়া আর কে পাবে আংটিটা। বদ্যিনাথ মারা যাওয়ার পর ভৈরবীকে আর বসিরহাটের বাগানবাড়ির কালিমন্দিরে দেখা যায় নি। শুধু বাগানের একপ্রান্তে সারগাদায়, সেখানে গোবর পচানো হত, কলাপাতায় জড়ানো একটা রক্তের ডেলা পাওয়া গিয়েছিল। যদিও কাছাকাছি মাটির ওপর রক্তমাখা পায়ের ছাপ ছিল, তবু জোর করে বলা যায়নি, মানুপিসীও বলত না, কলা পাতায় মোড়ানো নষ্টগর্ভ ভ্রূণটি মানুষের, সেটি ভৈরবীর গর্ভজাত, হয়ত তন্ত্রসাধক বদ্যিনাথেরই আশপাশের গ্রামের অন্য কারও তো হতে পারে। বাগান বাড়িতে বৈদ্যনাথের কিছু শিষ্য জুটেছিল, ভৈরবী ছাড়াও আরও কিছু সাধিকার যাতায়াত ছিল কালিমন্দিরে। মৃত্যুর সময়ে বদ্যিনাথের প্রায় সত্তর। না ভৈরবীর গর্ভে বদ্যিনাথের ঔরসে বরদাকান্ত জন্মাতে পারে না।

গ্রামের লোকের মনে বিষয়টি আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল, ফলে রক্তাক্ত পায়ের ছাপ যে ভৈরবীর হতে পারে এ কথাটাও কেউ মুখ ফুটে পুলিসকে বলে উঠতে পারেনি। ভৈরবী রুষ্ট হলে গ্রামের অকল্যাণ হবে, পরিবারে বিপদ ঘনিয়ে আসবে, এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, সেখানকার মানুষের মনে।

বিদেশ, বাগানটা বিক্রি হওয়ার সময় বাবা আর কাকার সঙ্গে বসিরহাটে গিয়েছিল। গ্রামের লোকে তখন তাকে কার্তিক মণ্ডলের অপঘাত মৃত্যুর কথা বলেছিল। কার্তিক খুব ডাকাবুকো ছিল, ওর বাবা কাকারা এ অঞ্চলের নাম করা লাঠিয়াল ছিল। বুকের পাটা ছিল কার্তিকের, নিশুত রাতে কালিমন্দিরে ঢুকে ভৈরবীর বুকের কাপড় ধরে টেনেছিল, কার্তিকের ডানহাত

ছিদাম সেখ সাক্ষী। মন্দিরে ঢোকার আগে পুরো এক পাঁটের দিশি বোতল গলায় ঢেলে, ছিদামকে বলেছিল, আজ যদি মাগীকে চিত করতে না পারি তো আমার নামে কুত্তা পুষিস।

মন্দিরের ভেতরে ধস্তাধস্তিতে বোধহয় প্রদীপটাই উলটে গেল, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, বাতাসও যেন গুম মেরে গেল, একটা শেয়াল ডেকে উঠল হঠাৎ। আকাশে একফালি চাঁদ ছিল, মেঘে ঢেকে গেল, আর তারপরই কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল। বাজপোড়া ছিদাম সেখ এখনও এই গাঁয়েই পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বাজপড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে মন্দিরের দরজা হাট হয়ে খুলে গিয়েছিল। ছিদাম একবারই দেখেছিল সাক্ষাৎ ডাকিনী মূর্তি, জটার ভার নেমেছে নগ্ন স্তনের ওপর দিয়ে, লোলজিহ্বা, হাতে ত্রিশূল, কোমরের রক্তবস্ত্র পায়ের কাছে। কার্তিককে পাওয়া যায় বাগানের একপ্রান্তে, মুখে গেঁজলা শুকিয়ে গেছে, চোখের একটা মণির ওপর একঝাঁক কাঠপিঁপড়ে, আরেকটা চোখ কোনো নিশাচর পাখী যেন খুবলে তুলে নিয়েছে। হাতের মুঠোয় তখনও দশ টাকার একটা নোট দুমড়ে মুচড়ে দলা পাকিয়ে আছে। একটা চটি মন্দিরের গোড়ায়, আরেকটা বাগানের অন্য প্রান্তে। পুলিশ এসেছিল, পোস্টমর্টেমে বলেছিল, স্নেকবাইট। ছিদাম বলে ডাকিনী বেরিয়ে এসেছিল মন্দিরের দরজা খুলে।

প্রায় সত্তর বছর বয়সে বদ্যিনাথের ঔরসে ভৈরবীর গর্ভে কি জন্ম সম্ভব? এমন কি সেটা যদি বরদাকান্তর পুনর্জন্ম হয়, তাহলেও কি সম্ভব! ভৈরবী কি হীরের আংটিটা নিয়ে পালিয়ে গেল?

কেবিনে এ. সি. মেশিন চলছে, তাহলেও কেমন যেন গুমোট, ভাদ্রের গুমোট, আমি পাখাটাও চালিয়ে দিই ফুলস্পীডে। আমার মাথার মধ্যে যন্ত্রণা হচ্ছে, ঠিক মাঝখান দিয়ে মাথাটা দুফাঁক হয়ে গিয়েছিল। এরা কদিন ধরে জোড়া লাগাবার চেষ্টা করছে, দেখতে না পেলেও আমি অনুভবে বুঝি জোড়া লাগছে না, দুটি অর্ধগোলক নারকেলের মত, এখন আমি মুণ্ডিত মস্তক, জোড়ার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে বাতাস ঢোকে আমার মাথার ভেতরে ঈষৎ গোলাপী ফোটা ফুলের মত মগজে সেই বাতাসে দোলা লাগে, মাথায় যন্ত্রণা করে। আর এই যন্ত্রণার সময়, ফাটা জায়গাটার দুপাশ দিয়ে ঘন আঠার মত একটা রস বেরিয়ে আসে।

আমি ডাক্তারকে, ইউনিভার্সালের নিউরো সার্জন ডাক্তার বোসকে বলেছি, রসের গন্ধটা ঘিয়ের মত, খুব ভালো গাওয়া ঘিয়ের মত। মগজে ঘি থাকে, এরকম একটা ধারণা থেকে, মস্তিষ্কের কোনো কোষে এই ধারণাটা নাকি আটকে আছে, অমি ঘিয়ের গন্ধ পাই—অন্ততঃ ডাক্তার বোস তাই মনে করেন। এখন যন্ত্রণা হচ্ছে, আর কানের পেছন দিয়ে ঘাড় বেয়ে ঘিয়ের মত সেই রস গড়াচ্ছে, আমার মগজ কী গলে যাচ্ছে, ফাটল দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে একদিন সবটা শূন্য হয়ে যাবে, তখন হয়ত শুধু একটা আকাশ থাকবে, অনন্ত আকাশ মাথা জুড়ে। মায়ের কথা ভাবতে চাইছি বলে, হয়ত কষ্ট হচ্ছে। মায়ের পেটে পাপের বীজ এল কিভাবে। পাপের বীজের জন্যেও তো ক্ষেত্র লাগে। আমার মায়ের বিচরণক্ষেত্র বলতে তো বরদা ভবনের চৌহদ্দি, একপাশে বাঁশের বাতা, দরমা দেওয়া একচিলতে রান্নাঘর। এজমালি কলতলা। মা কদাচিৎ যেত সিনেমা-থিয়েটারে, গেলেও সোহাগবালা বা মানুপিসীর সঙ্গে। মা বলত, যাবার জন্য আমার তো কোনো জায়গাই নেই, মেয়েদের বাপের বাড়ি থাকে আমার তো তাও নেই।

বরদা ভবনের শরিকদের সকলের সঙ্গেই তো মায়ের ভালো সম্পর্ক ছিল। রামপদ জ্যাঠা, অশ্বিনী খুড়ো, পাড়ার মুদি হারাণদাও মাঝে মাঝেআসত তাগাদায়, চা খেত, মায়ের সঙ্গে গল্প করত, আমি অনেক হাতড়েও মায়ের সঙ্গে কোনো পুরুষেরই সেই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক পাতাতে পারিনা, যে সম্পর্কের জমিতে পাপ জন্ম নিতে পারে। তবে কী প্রাণকাকা? প্রাণকাকার কাছে হয়ত বদ্যিনাথ হীরের আংটিটা দিয়েছিল।

ডাক্তার বদ্যি করে বদ্যিনাথকে তো প্রাণাকাকাই বাঁচিয়ে তুলেছিল। বদ্যিনাথের পুরুষাঙ্গে ঘা হয়েছিল, পুঁজ জমত, রক্ত পড়ত—সোহাগবালা বলেছিল, হীরের আংটিটা চেয়ে নিও। প্রাণকাকা হয়ত নিয়েওছিল, লুকিয়ে রেখেছিল কোথাও, হয়ত মায়ের কাছেই, সোহাগবালাকে বলেনি। ভাগলপুর গিয়েছিল প্রাণকাকা, তার কোম্পানির হয়ে গালার দাদন দিতে। গালার বিস্তৃত কারবার ছিল কাকার কোম্পানীর। সেখানেই খুড়ির বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ--তারপর প্রাণকাকার বিয়ে। প্রাণকাকাকে ঘরজামাই থাকতে বলেছিল, তার শ্বশুর। কাকা রাজি হননি। মানুপিসী বলত, যাবে কি করে—এ বাড়িতে তিন পুরুষের বাস, তোর বাপ একদিন বাড়ি থাকে তো তিনদিন থাকে না। প্রাণনাথ যায় কী করে বরদা ভবন ছেড়ে, তোর মাকে ছেড়ে?

খুড়িমা সন্ধে হলেই দুটো রুটি খেয়ে বিছানা নিত। শরীরে জল জমত, খুড়ি জলের কল কল শব্দ শুনতে পেত শরীরের মধ্যে। সন্ধে হতেই ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমোত। আমি আর বিদেশ বইপত্র নিয়ে মানুপিসীর ঘরে, হয়ত শিবুদা পড়াতো আমাদের, নয়ত আমরা গল্প করতাম ছাদের ওপর। চিলেকোঠায় আমি, বিদেশ, মালতি, পারুল, মুকুল, হয়ত আকাশের তারা গুণতাম। চাঁদের আলোয় গোল হয়ে বসে রুমালচোর খেলতাম। বাবা প্রায়ই আসতেন না। জয়কালিমাতা প্রেসে থাকলেও কাজ সেরে ফিরতেন কোনোদিন রাত দশটায়, কোনোদিন আরও পরে। সে সময়ে কে আসতে পারে, মায়ের কাছে এক বিছানায় শোওয়ার একান্ত অধিকার নিয়ে।

মাথার ভেতরে ঢেউ উঠছে, ঢেউ উঠছে, এতকালতো মনে পড়েনি। এখন পড়ছে কেন? ফাঁক হয়ে যাওয়া মাথার মধ্যে থেকে সেইসব অন্ধকার কানের পাশ দিয়ে গড়িয়ে আসা রসের সঙ্গেই বেরিয়ে আসছে, নাকি আমি জানতাম সবই, আমার প্রবল মাথা ঝাঁকানিতে দুঃস্বপ্নগুলো সরে যেত।

সেদিনের কথাটা মনে পড়ল। সন্ধে গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ, একটা ভাঙা চাঁদ ঝুলে আছে গঙ্গার ওপর। ঝুঁঝকো অন্ধকারে আমি একা ছাদের ওপর। ভেবেছিলাম, মালতি, মুকুল বিদেশ ওরা ছাদে আছে-- নেই। তেঁতুলগাছের মাথাটা হাওয়া লেগে দুলছে। ভাঙা চাঁদ তেঁতুল গাছের আড়ালে। হঠাৎ কেমন যেন গা ছমছম করতে লাগল। আমি বিদেশকে ডাকতে চাইছিলাম, স্বর বেরল না। মাথার ওপর দিয়ে কর্কশ চীৎকার একটা নিশাচর পাখি করে উড়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় করে নেমে ভেতরের দরজায় ধাক্কা দিয়েছি মা দবজা খোলো। নিঃশব্দ কয়েকটা মুহূর্ত। হৈ হৈ করে হঠাৎ মালতি বিদেশ মুকুল এসে আমাকে টেনে নিয়ে গেল। ভেতরের দিকের বারান্দা থেকে ঘরে ঢোকার দরজা তো

বন্ধ থাকে না। আহ্ মা, আমি যেন অনন্তকাল বন্ধ দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ভেতরে আলো নেই, অন্ধকারে তোমার সঙ্গে কে ছিল মা।

বাবা খুব সকালেই ফিরেছেন ডায়মণ্ডহারবার থেকে। ঘরে ঝাঁট পড়েনি, খাটের পায়ার কাছে সিগারেটের টুকরো, মেঝেয় বসে চা খাচ্ছিলেন বাবা। সিগারেটের টুকরোটা হাতে নিলেন, বললেন কেউ এসেছিল। বিকেলেও আমাদের ঘরে ঝাঁটা পড়ে, মা এসব ব্যাপারে খুব নিয়মিত। বাবা হয়ত স্পষ্ট করে বললেন না, রাতে কেউ এসেছিল? মা বলল, কই কেউ আসেনি তো। বাবা বললেন, ছেলেদের দিকে একটু নজর রেখ, এই বয়সে বিড়ি সিগারেট ধরলে আর দেখতে হবে না। আমি আর বিদেশ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম।

ইউনিভার্সাল নার্সিংহোমে এতদিন পরে মনে হচ্ছে ফিলটার দেওয়া ওই সিগারেট তো একজনই খেত, প্রাণকাকা। রামজ্যাঠা নস্যি নিত, হারাণদা পাড়ার মুদি বিড়ি খেত। সেদিন কী মায়ের সঙ্গে গল্প করতে এসে সিগারেট খেয়েছিল? হীরের আংটিটা কী মা পেয়েছিল? প্রাণকাকা কী আংটিটা মাকে দিয়েছিল? মাঝরাতে সহসাই ঘুম ভেঙে গেল— খুড়িমা গুমরে গুমরে কাঁদছে। ওদের আর আমাদের ঘরের মাঝে একটি পাঁচইঞ্চি দেওয়ালের পার্টিসান। আমি পরদিন মুকুলকে জিজ্ঞেস করলাম, কালরাতে খুড়িমা কাঁদছিল খুব, তুই শুনেছিস? মুকুল বলল, সদা কাউকে বলিসনি কিন্তু—পারুলতো ওই ঘরে শোয় ও শুনেছে। মা একটা হীরের আংটির কথা বলছিল, সেটা নাকি তোর মায়ের কাছে। তুই দেখেছিস কখনো?

আমি দেয়ালে মাথা ঠুকতে চাইছিলাম অসহ্য যন্ত্রণায়। চীৎকার করে উঠলাম, ধন্যি বরদাকান্ত, তুমি আর জন্মাবার জায়গা পেলে না বরদা ভবনে খুঁজে খুঁজে আমার মাতৃগর্ভে তুমি জন্মাতে চাইলে, তাও কিনা নিজেরই নাতির ঔরসে? এমন একটা হীরের আংটি তুমি কেন রেখে গেলে প্রপিতামহ? ওই আংটিকে উপলক্ষ্য করে তুমি এভাবে জন্ম নেওয়ার চেষ্টা করছ কেন? ভৈরবীর গর্ভে, আমার মায়ের গর্ভে ছাড়া কী তোমার পুনর্জন্মের জন্য আর কোনো গর্ভ ছিল না কলকাতাতে?

মুক্তাঞ্চল

(১)

আজ ঘণ্টা পাঁচেক ধরে আমাকে উপোষ করিয়ে রেখেছিল এরা। সকাল থেকে এক কাপ চা ছাড়া আর কিছুই খেতে দেয়নি। আমার মল, মূত্র, রক্ত, এমনকি আমার মাথার ফাটা জায়গা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে কানের পাশ দিয়ে ঘাড় পর্যন্ত ভিজিয়ে যে আঠালো রস নামছে, আজকে সমস্ত কিছুরই আরেকবার টেস্ট হবে। ইউনিভার্সালে আসার পর প্রথম দুদিন ওরা আমাকে কেবল ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। স্যালাইন আর গ্লুকোজ দিয়ে আমার

শরীরে রক্ত আর লবণের মাত্রা ঠিক রাখার চেষ্টা চালিয়েছিল। তারপর আমার মাথায় একটা আলগা সেলাই হয়েছিল। এর কয়েকদিন পর ওরা আমার সমস্ত শরীরের ছবি নিয়েছিল, দেয়ালজোড়া অনেকগুলো ছোটো ছোটো টিভি স্ক্রিনের ওপর আমার শরীরের ভেতরের কলকবজাগুলোর ছবি উঠছিল। মাথা, ঘাড়, বুকের পাঁজর, ঘাড় থেকে সাপের মত কোমরের নীচে পর্যন্ত নেমে যাওয়া শিরদাঁড়া, শরীরের ভেতরের সব কিছুর ছবি আমিও দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার ফুসফুস হৃৎযন্ত্রের ছবি দেখে তো আমি অভিভূত। বেঁচে থাকার যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে এদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সম্বন্ধে আমার একটা ভাসাভাসা ধারণা ছিল। আমার পাকস্থলির দেয়ালে, অন্ত্রের দেয়ালে নাকি ক্ষত আছে। ওরা দেখাল, অল্প অল্প রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে বলল, আলসার হয়ে গেছে, যাই হোক একবার যখন এখানে এসে পড়েছেন ভয়ের কিছু নেই।

সবচেয়ে বেশি লজ্জা লেগেছিল যখন ওরা আমার মলদ্বাবের ভেতরে অদ্ভুত ক্যামেরাটি ঠেসে দিল। ওরাই বলল, এটা একটা শক্তিশালী ক্যামেরা। দেয়ালে একটা সরু টানেলের ছবি। হঠাৎ মনে পড়ল, থানায় সেই সাদা পোশাকের পুলিশটা বলেছিল, বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস, ক্ষমতা তোর পোঁদে ভরে দেব। সত্যিই দিত কিনা কে জানে?

শিবুদার দলের একজন অশোক হাজরা, কাশিপুর রেল ইয়ার্ডে মারা গেল। পুলিশ বলেছিল, ডাইরেকট এনকাউনটার। অশোক হাজরার কাছে একটা দিশী পিস্তল পাওয়া গিয়েছিল, একটা রেড বুক। অশোকের লাশ পোস্টমর্টেমে গিয়েছিল, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক থেকে গুলি চালিয়েছিল পুলিশ, ওয়াগান ব্রেকার, তায় আর্মড পুলিশের হাতে কোনো অলটারনেটিভ ছিল না।

পোস্টমর্টেম করেছিলেন এক অল্পবয়সী ডাক্তার, আমাদের কিছুটা পরিচিতই, মেদিনীপুরের ডাক্তার জানা, উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করলেন, গুলি পিঠ ফুটো করে বেরিয়ে গেল, লাশের রেকটামে এত রাপচার কেন! ভেতর পর্যন্ত এত রক্ত কেন? অর্শ বা ফিসচুলা হতে পারে, রাপচার হওয়া কী অসম্ভব? ডাক্তার জানা, কলকাতা থেকে পাথরপ্রতিমা প্রাইমারি হেলথ সেনটারে বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। অশোকের ডেডবডি পাড়ায় আনতে দেওয়া হয়নি।

চারজন ডাক্তারের একটা টিম সঙ্গে দুজন সিনিয়র নার্স আমাকে দেখছেন, এছাড়া ফ্লোরে আরও একজন মহিলা কমপিউটার অপরেটার, অল্পবয়েসী। আমার শারীরবৃত্তের যাবতীয় তথ্য বোতাম টিপে রেকর্ড করে রাখছেন। মাঝে মাঝে পর্দায় ভেসে উঠলে সেগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি ; বেশিরভাগই মেডিকেল টার্ম, জানিনা, বি. পি মানে ব্লাড প্রেসার বুঝলাম, হার্টবীট, পালস রেট বুঝলাম। মলদ্বারের রেকর্ডটা একটু মনোযোগী হয়েই দেখলাম। নানা টেস্টের কথা লেখা আছে, নো সাইন অব প্যাসিভ হোমোসেকসুয়ালিটি, কমপিউটারের পর্দায় ফুটে উঠল।

মাথায় ধবধবে সাদা চুল, চোখে চশমা, মজবুত গড়নের মানুষটার বয়স বোঝা শক্ত। ইনিই বোধহয় ডাক্তার ভার্গব, জিজ্ঞেস করলেন, আশ্চর্য বাংলাতেই, পরে শুনেছিলাম কলকাতা মেডিকেল কলেজের এম. বি বি এস., কত বয়স হল?

আমি বললাম, তা চল্লিশ পেরিয়ে গেছি। উনি বললেন, সারপ্রাইজিং, রেকর্ডে তো দেখছি বিয়ে থা করেননি। প্রস কোয়ার্টারে যেতেন?

নিউরো সার্জন ডাক্তার বোস বললেন, লজ্জা পাবেন না। আমাদের সমস্ত তথ্যই দরকার—আপনার ক্লায়েন্ট ফরেনার, বিদেশী, আপনার প্রত্যেকটি অর্গানের জন্য দাম দেবেন ডলারে। যাচাই না করে ওরা কোনো মালই কেনে না। কেবল আপনার চেক আপের জন্য উই আর গেটিং টুয়েনটি থাউজ্যান্ড বাকস্, টাকার হিসেবে ছলাখ টাকা! আমাদের দেশে অনেক, ওদের দেশে নাথিং।

ডাক্তার ভার্গব বললেন, ডক্টর বোস, লেট আস কাম টু বিজনেস। মিঃ চ্যাটার্জি, আই মীন স্বদেশবাবু, আপনি তো জানেন, পৃথিবীতে এখন সবচেয়ে ভয়াবহ রোগ হচ্ছে, এড্স, নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। আমরা টু হানড্রেড পার্সেনট সিওর হয়ে নিতে চাই, ডোনারের মানে আপনার পাসট হিসট্রিতে প্রস কোয়ার্টার্সের কোনো রোল আছে কিনা। কারণ রেড লাইটে পৃথিবীর সর্বত্র, বিশেষ করে আমাদের মত গরীব দেশগুলোতে ফার্টাইল গ্রাউন্ড ফর জারমিনেশন অব এডস ভাইরাস। আপনি যেতেন রেডলাইট এরিয়াতে? আমি মাথা নীচু করে নিলাম, বললাম, হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।

ডাক্তার বসাক প্যাথোলজিস্ট, বললেন, গিয়েছিলাম মানে? আপনি কি একবারই গিয়েছিলেন? প্রথমবারের পর আর কখনও যান নি?

একে আমার শরীরে কাপড় চোপড় বলতে কিছুই নেই। এ.সি ঘরে ঠাণ্ডা লাগতে পারে একটা হালকা গোলাপি চাদর দিয়েছে গায়ে দেওয়ার জন্য। প্রত্যেকটা টেস্টের জন্য সেই চাদরটা বসার সোফায় রেখে গিয়ে আমাকে দাঁড়াতে হচ্ছে, নানাধরনের একস্ রে আর স্ক্যানিংয়ের মেশিনগুলোর সামনে। ঘরের মধ্যে তিনজন মহিলা ব্লাউজ আর স্কার্ট পরা, কমপিউটারের মহিলা তো পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে। তবু এসব কথায় কারো যেন কোনো বিকার নেই, অস্বস্তি বা সংকোচ তো দূরের কথা, কমপিউটর মহিলা এমনভাবে দেখছেন যেন আমার শরীর নয়, পশ্চিমবাংলার ম্যাপ দেখছেন। আমি বললাম, বার তিনেক গেছি বোধহয়, খারাপ পাড়ায়, তার বেশি নয়।

প্যাথোলজিস্ট বললেন, ইটস ও কে। আমরা দেখে নিয়েছি, অ্যালিজা টেস্ট থেকে সবকিছু, এডস্ ভাইরাস নেই।

নিউরোলজিস্ট বলল, আজকাল রেডলাইট এরিয়াতে কনডোমের চল হচ্ছে, আরো আগেই হওয়া উচিত ছিল। আসলে আজকাল মিডল ক্লাস আই মীন লোয়ার মিডল ক্লাস, তাই বা কেন হায়ার ইনকাম গ্রুপেও দেখেছি ইনসিডেন্স অফ্ প্রস্টিটিউসন বাড়ছে, বৈধ অবৈধ দুধরনের বেশ্যা-বৃত্তিই বাড়ছে। বাড়ির বউ, মেয়ে কেউই তো বাদ থাকছে না।

ডাক্তার বোস বললেন, স্যাড, এই তো কদিন আগে দুজন টীন এজার ধরা পড়ল, ক্যামাক স্ট্রিট এলাকায়, স্কুল গোয়িং কিডস, বাবা মা মোটিভেট করছে। বাট, ওটা ফ্রেস ট্রেডই। ডাক্তার ভার্গব বললেন, ইনহিবিশন কেটে যাচ্ছে বলুন, ভিকটোরিয়ান ভ্যালুজের ডিভ্যালুয়েশন হচ্ছে বলুন।

অদূর ভবিষ্যতে বোম্বে দিল্লীর মত কলকাতাও মুক্তাঞ্চল হয়ে যাবে বলুন। ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর, হংকং এর মত ফ্রী ট্রেড জোন। আর এই ফ্রী ট্রেডে সবচেয়ে ভালনারেবল, সেলেবল্ প্রোডাকট হচ্ছে, হিউম্যানবিয়িং ইয়েস, মানুষ। আস্ত মানুষ,ভাঙাচোরা মানুষ, মানুষের অর্গান, সবকিছুরই একটা বাজার তৈরি হচ্ছে সর্বত্র।

কৃষক সংগ্রামের একটা পর্যায়ে এসে আমাদের এলাকাটা মুক্তাঞ্চল হয়ে গেল সত্যিই। সন্ধে সাতটা, সাড়ে সাতটার পর রাস্তায় লোকজন আর বিশেষ চলা ফেরা করত না, আটটার পর তো সব শুনশান, মধ্যরাত্রি। কাশিপুর, পাইকপাড়া, বেলগাছিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় যেন কারফিউ জারি করা হয়েছে। রিক্সাস্ট্যাণ্ডে রিক্সা নেই, পান বিড়ি সিগারেটের দোকান, মুদির দোকান, এমনকি ওষুধের দোকান পর্যন্ত তখন আটটার মধ্যে ঝাঁপ বন্ধ করে দিচ্ছে।

তিনটে জলপাই রঙয়ের গাড়ি ঢুকল একদিন পাড়ার গলির মুখ পর্যন্ত। মিলিটারিরা নানা ছাঁদের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে প্রায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় গলিগুলো দিয়ে রুট মার্চ করে গেল। পুলিশের গাড়ি কখনও ঢুকে পড়লে খুব দ্রুত গলির সামনের বড় রাস্তা পার হয়ে যেত। পুলিশ তো দলবদ্ধ না হয়ে গলির ভেতরে ঢুকতই না।

এরই মধ্যে পাড়ায় কাছাকাছি দুটো মার্ডার হয়ে গেল। একজনের লাশ পাওয়া গেল গলির মুখটায়, আরেকজনের বরদা ভবনের ভাঙা পাঁচিলের ওপাশে ছোট মাঠটাতে। সিঁথির কাছাকাছি একজন কনস্টেবলের বন্দুক ছিনতাই হয়ে গেল দিন দুপুরে। শিবুদা ফেরার হয়ে গেল। বেশ কয়েকবার তার খোঁজে পুলিশ বরদা ভবন পর্যন্ত এল। মানুপিসীকে জেরা করার জন্য দুদিন থানায় নিয়ে গেল। সঙ্গে মালতি ছিল একদিন। পুলিশ নাকি সেদিন জেরা করার জন্য মালতিকে থানায় আটকে রাখতে চাইছিল। আমাদের পাড়ার কাউন্সিলরের ভাই, আমাদের মণিদা সেই সময় থানায় হাজির। মণিদাই মালতি আর মানুপিসীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যান। মণিদাই ওদের বলেছিলেন, কিছুদিনের জন্য পাড়া ছেড়ে চলে যেতে।

তারপর দিন মাঝরাতে চারজন পুলিশের একটা দল এসে বরদা ভবনে তাণ্ডব করে গেল। শিবুদা তার কিছুক্ষণ আগেই তো দুটো একশো টাকার নোট দিয়ে বলে গেল মানুপিসীকে দিয়ে দিতে।

মুক্তাঞ্চল হয়ে গেল বলেই আমরা যে খুব অবাধে চলাফেরা করতে পারতাম তা নয়। পুলিশও তখন খানিকটা গেরিলা যুদ্ধে রপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বেলগাছিয়ার মানিক কাকুর বাড়ি অতর্কিতে হানা দিয়ে দশবারো কপি রেড বুক, চীনের কিছু প্রচার পুস্তিকা আর একটা

পাইপগান বাজেয়াপ্ত করল, মানিককাকুর কোমরে দড়ি বেঁধে আমাদের পাড়ার সামনে দিয়ে বি. টি. রোড পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে গেল। মানিককাকু আগরপাড়ার একটা ইস্কুলের ইতিহাসের মাস্টারমশায়। বিদেশ জানলেও জানতে পারে, আমি তো জানতামই না, মানিককাকু শিবুদার দলের লোক। অল্প কিছু ছাত্র পড়াতেন বাড়িতে, শুনেছি পয়সা নিতেন না। কদাচিৎ ভজাদার টি স্টলে তাঁকে চা খেতে দেখেছি। পাড়ার পুজো, যাত্রা থিয়েটারে কিংবা অন্য কোনো আড্ডায় মানিককাকুকে বড় একটা দেখিনি। মানিককাকু, নিরীহ, রোগা কালো চেহারা-- চোখে আদ্যিকালের ফ্রেমের হাই পাওয়ার চশমা, বিয়ে থা করেননি, দাদা বৌদির সংসারের এককোণে পড়ে থাকেন—আমরা বললাম, পাইপগানের ব্যাপারটা বানানো।

ওঁর দাদা বৌদিও বলেছেন, বইপত্র, নিষিদ্ধ পুস্তিকা, এ পর্যন্ত মানতে রাজি আছি— পাইপগান অসম্ভব। মানিক এখনও আরশোলা, টিকটিকি দেখলে ভয় পায়।

দশবছর এক জেল থেকে আরেক জেলে ঘুরে বেড়িয়ে সেদিন ফিরে এলেন, মাথার চুল সাদা, আরো রোগা, জীর্ণ হয়ে গেছেন মানিককাকু। একটা লাঠিতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আমাদের পাড়ার ক্লাবে এসেছিলেন, পরদিন শিবুদার খোঁজ করলেন। বিদেশ অস্ট্রেলিয়ায় শুনে কেমন যেন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। পুরনো একজন কমরেড মারা গেছেন শুনে, বললেন, তোমরা কিছুই করতে পারলে না। তিন তিনটে দিন মুক্তাঞ্চল রেখে তোমরা কিছুই করতে পারলে না।

ক্লাবের ছেলেরা বলল, আমরা বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচীতে হাত দিয়েছি। জন্মনিয়ন্ত্রণ আর নিরক্ষরতা দূরীকরণ এই দুটো গঠনমূলক কর্মসূচীকে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি। আপনি অভিজ্ঞ মানুষ, আসবেন মাঝে মাঝে, আমাদের পরামর্শ দেবেন।

মানিককাকু বললেন, আমি কি আর পারব? ভাঙার কাজটাই তো সোজা, তাই ঠিকমত করে উঠতে পারলাম না। কি যেন বললে কথাটা গঠনমূলক, হ্যাঁ কী গঠন করব তাই ভালো করে বুঝে উঠতে না পারলে, আমি গঠনমূলক কাজ কী করে করব ভাই?

শিবুদার নামে ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে, বিদেশও পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এরই মধ্যে পাড়া থেকে একদিন দুপুরে আমাদের চারজন ছেলেকে আর গলির মোড়ের স্টলের ভজাদাকে ধরে নিয়ে গেল। ভজাদা নাকি দলের ভেতরের সমস্ত খবর জানে। টি স্টলটাই নাকি ঘাঁটি। শিবুদা অবশ্য নিয়মিত ওই দোকানেই আড্ডা দিত, কিন্তু ইদানীং টি স্টলে, রাস্তার ধারে, খোলা নর্দমার ধারে দরমা ঘেরা অস্থায়ী চায়ের দোকানে শিবুদাকে দেখেছি বলে মনে করতে পারলাম না।

পুলিশ ভজাদাকে মেঝের ওপর ফেলে যথেচ্ছ বুটের লাথি মারল। দুজন কনস্টেবল ভজাদাকে কম্বলে জড়িয়ে দুটো বাঁশের লাঠি দিয়ে পিটতে পিটতে ক্লান্ত হয়ে গেল। ভজাদার নাক থেকে, মুখ থেকে তাজা রক্ত মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল। আমাদের দলের বটুক, কতই বা বয়েস তখন, বছর চোদ্দ, থানা গারদের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করে দিল— ভয়ে। হ্যাঁ ভয়েই আমিও যেন কেমন দিশাহারা হয়ে গেলাম। গলা দিয়ে স্বর বেরচ্ছে না, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, আমি বললাম, আমি জানি শিবুদা কোথায়।

জানিস তো মুখ বুজে আছিস কেন খানকির বাচ্চা? একজন কনস্টেবল সপাটে একটা থাপ্পড় কষাল, গাল আর কপালের রগের মাঝামাঝি আঘাতটা বুঝে নিতে নিতে, আমার চোখের সামনে অন্ধকারের পর্দা নেমে এল, বিড়বিড় করে বললাম বরাহনগরে, শিবুদার মাসির বাড়ি, পালিত পাড়া। পুলিশ সেই রাত্রেই আমাকে নিয়ে পালিত পাড়া অভিযানে যাবে, থানার বড় বাবু এরকমই নাকি নির্দেশ দিয়েছিল।

শিবুদার নিজের মাসি নয়, অনেক দূর সম্পর্কের মাসি। তাছাড়া পালিত পাড়ার ওই বাড়িতে দুতিনবার মাত্র গেছি। বাড়ির নম্বর জানি না। পুলিশ আমাকে নিয়ে গেলেও সে বাড়ি আমি খুঁজে পেতাম না—হয়ত শিবুদার মাসিকেও চিনতে পারতাম না।

পরে শুনেছিলাম, পাড়ার বয়স্করা দল বেঁধে থানায় এসেছিল। পুলিশের এক মাঝারি কর্তা নাকি বটুকের কাকার সঙ্গে চেনাজানা। রাত দুটোয় আমরা চারজন ছাড়া পেয়েছিলাম। ভজাদাকে ওরা ছাড়েনি। বটুকের কাকাকে পুলিশ বলেছিল, যে কোনো সময়ে আমাকে তারা ডেকে পাঠাবে। পুলিশকে না জানিয়ে আমি যেন পাড়া না ছাড়ি।

পরের রাত্রেই শিবুদা এসেছিল। খাটের একবাশে বসে ঢকঢক করে একমগ জল খেল শিবুদা। বলল, ট্যাকটিকস হিসেবে ঠিকই আছে। কিন্তু ওরা বরানগরে আমাকে যখন পাবে না, তখন তোকে আবার ধরে নিয়ে যাবে। কাল সকাল হলেই তুই মামার কাছে ক্যানিং চলে যা। বিদেশ ঠিক আছে। আমার মুখ চোখ নিশ্চয়ই ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। শিবুদা হাসল, বলল, ভয় পেয়েছিস? পিঠে হাত রেখে বলল, তোর খুব লেগেছে নারে? আমিও তোর অবস্থাতে পড়লে হয়ত তুই যা করেছিস, তাই করতুম। আমার চোখের কোণ থেকে জল নেমে এল গাল বেয়ে।

এই ঘটনার পরদিনই পুলিশ মুক্তাঞ্চলের দখল নিয়ে নিল। বিকেলের দিকে পুলিশ পিকেটের সামনে দিয়েই আমি বি. টি. রোড থেকে বাস ধরলাম, ক্যানিং যাব।

ইউনিভার্সাল নার্সিংহোম থেকে কবে ছাড়া পাব জানি না। কোনোদিন কী ছাড়া পাব? এর মধ্যে কোনো একদিন বিকেলে আমার ক্যানিংয়ের কথা মনে পড়েছিল, গাধাবোটে খড়ের মানুষদের কথা মনে পড়েছিল। আমার ক্যানিং যাওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল।

ক্যানিংয়ে সেই যে গেছি আর যাইনি তারপর। ভরদুপুরে পানের ডিবে সামনে রেখে, খুড়িমা মানুপিসীকে বলেছিল, আমার মায়ের পেটে পাপ ঢুকেছিল, বাবা কী জানতেন? তেমন তো মনে হয়নি, মা মারা যাওয়ার পর বাবা বরদা ভবনে আসা ধীরে ধীরে কমিয়ে দিলেন। এরই মধ্যে একদিন বললেন, তুমি আর বিদেশ এখন যথেষ্ট বড় হয়েছ, টাকা পয়সার ব্যবস্থা আমি করে যাচ্ছি। জয় কালিমাতা প্রেস থেকে মাসে একটা বাঁধাধরা টাকা আমরা তুলে আনতাম। সোহাগবালা যতদিন ছিল, অসুবিধা হয়নি, এরপর আমি আর বিদেশ দুজনে মিলেই যাহোক করে চালিয়ে নিতাম।

আমি তখন কলেজে, বিদেশের সেবার বি. এস. সি ফাইন্যাল। আমাদের এলাকা মুক্তাঞ্চল হয়ে গেল, বিদেশ পাড়া ছাড়া, আমারও থাকা খাওয়ার ঠিক নেই, কোনোদিন মানুপিসীর কাছে, কোনোদিন কাছেই একটা পাইস হোটেলে। মা নেই, বাবা ক্যানিংয়ে,

মানুপিসী মাঝে মাঝে একটু আধটু শাসন করতেন।

বরদা ভবন থেকে প্রাণকাকারা চলে যাওয়ার পর আমাদের বাড়িটাও বোধহয় মুক্তাঞ্চল হয়ে গেল। বিদেশের অনেক বন্ধুবান্ধব, শিবুদার দলের কেউ কেউ—আমার কলেজের বন্ধুবান্ধব, অবারিত দ্বার, আসছে যাচ্ছে, এজমালি কুয়োতলায় স্নান করছে, তেমন অবস্থায় রাত্রেও থেকে যাচ্ছে। বাবা মাসে একবার দুবার আসতেন, দেখতেন শুনতেন, তেমন কিছু বলতেন না।

জয় কালিমাতার মালিক বটকৃষ্ণের জামাই ডাকাতদের হাতে মরেছিল। টাঙ্গির কোপে তার ধড় মুণ্ডু আলাদা হয়ে গিয়েছিল। দিবাকর মণ্ডলকে এক ডাকে সবাই চিনত। ধানজমি, ভেড়ি, তিনটে লঞ্চের মালিক দিবাকরের সাথেই বটকৃষ্ণ একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল। বিয়ের বছরখানেকের মধ্যেই ডাকাতি। কাগজে লিখেছিল শরিকী সংঘর্ষ, ভেড়ি নিয়ে গোলমাল।

বাবা যাওয়া আসার সূত্রে প্রতিমাকে, বটকৃষ্ণের মেয়েকে চিনতেন। অনেক সময় বটবাবুর আদায় নিতে গিয়ে বটবাবুর বাড়িতে থেকেও যেতেন। বাবার চেয়ে বোধহয় বছর পনের কুড়ির ছোটই হবে প্রতিমা। বটবাবুর স্ত্রীর মাথা খারাপ ছিল তিনি মাঝে মাঝে ক্যানিংয়ে থাকতেন, তারপর মাথাব গোলমাল শুরু হলে বটবাবু তাঁকে লুম্বিনী না হলে মানকুণ্ডুর মেনটাল হসপিটালে রেখে দিতেন। বটবাবু নাকি এজন্যই কলকাতা ছেড়ে নড়তে পারতেন না। বেশির ভাগ সময় আমার বাবা গণনাথই ভেড়ির আদায়ে যেতেন, কাকদ্বীপ, বাঘডাঙা থেকে ধানের ভাগ বুঝে নিতেন।

ইউনিভার্সালের ডাক্তাররা বলছেন ই. এস. পি—এক্সট্রা সেনসরি পার্সেপসন, এটা নাকি আমার ভেতরেও আছে। মগজের লক্ষ লক্ষ কোষের খুব অল্পই আমাদের ব্যবহারিক জগতের কাজে লাগে। মাথায় আঘাত পাওয়ার পর মগজের নির্লিপ্ত কোষগুলোতে নাকি বিদ্যুত তরঙ্গের লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন দেখেছেন রেডিওলজিস্ট। ডাক্তার বোস অবশ্য ব্যাপারটাকে একটা ডিসঅর্ডারই বলেছেন, ঠিক সিজোফ্রেনিয়া নয়, তবে ওইরকম একটা কিছু। বাস্তবে চোখের সামনে যা নেই, মানসিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পেশেন্ট তাই দেখে। গাধাবোটে খড়ের মানুষের কথা আমি ডাক্তার বোসকে বলিনি, সেটা তো আরও অনেকে দেখেছে। আমার কী ডায়মণ্ডহারবারে পিকনিকের সময়, সেই কোন্ ছেলেবেলায় সিজোফ্রেনিয়া ছিল। বিদেশ, মালতি—বাবাও তো দেখেছিল, ওদের দেখাটাও কী ভুল ছিল। সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণই এটা, পেশেন্ট একটা কাল্পনিক জগত তৈরি করে, সেখানে বাবা, ভাই, মালতি, থাকতে পারে বৈকি, নিজের পরিচিত কিন্তু একটা অলীক পৃথিবী থাকতে পারে।

আমি ডাক্তার বোসকে বলেছিলাম, বিশ্বাস করুন, তিনদিন তিনরাত কলকাতায়, পাইকপাড়া, বেলগাছিয়া, কাশিপুরে আমরা মুক্তাঞ্চলে বাস করেছি। শিবুদা বলত আমার আই কিউ চল্লিশের নীচে। মাথায় আঘাত পড়ার পর, ফাটল দিয়ে যন্ত্রণার সময় এখনও বটের আঠার মত কষ গড়ায়, ডাক্তার বোস এমন অবস্থায় বলছেন আমার আই কিউ নাকি একশো চল্লিশের ওপরে। আমি দুবারের চেষ্টায় বি. এ. পাশ করতে পারিনি, আমি নাকি

চাইলে আইনস্টাইন হতে পারতাম। আইনস্টাইন সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছুই জানি না। রিলেটিভিটির তত্ত্বর জন্য বেশি আই কিউ লাগে, না সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য! চেয়ারম্যানের আই কিউ সম্বন্ধে ডাক্তার বোসের কী কোন ধারণা আছে?

বটকৃষ্ণ নস্করের স্ত্রীর সিজোফ্রেনিয়া ছিল। মানসিক ডাক্তাররা তাই বলেছিল। ঘুমের ওষুধ খেয়ে তিনি কেবল ঘুমোতেন। ঘুম থেকে উঠে তিনি কাউকেই চিনতে পারতেন না, স্বামীকেও না, মেয়েকেও না। একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে তিনি চীৎকার করে উঠেছিলেন ডাকাত, ডাকাত। ওরা প্রতিমাকে ধরে নিয়ে গেল। বাঁচাও কে কোথায় আছ বাঁচাও, ওরা দিবাকরকে কেটে ফেলল। দিবাকর তো বটবাবুর জামাই, প্রতিমার স্বামী। ডাকাতরা এর ঠিক সাতদিন পরেই টাঙ্গির কোপে দিবাকরের ধড় মুণ্ডু আলাদা করে দিয়েছিল, প্রতিমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বাড়ির পেছনের পুকুরপাড়ে বাঁশঝাড়ে। বাবা গণনাথ পরদিন সকালে দূরের একটা দ্বীপ থেকে আদায় সেরে দিবাকরের একটা লঞ্চেই ফিরছিলেন।

পুলিশ বলেছিল, ইটস এ কেস অফ্ গ্যাং রেপ। ডাকাতরা সংখ্যায় কতজন ছিল জানা যায় নি, তবে কমপক্ষে পাঁচ ছজন তো হবেই, শরীরের ক্ষত পরীক্ষা করে ডাক্তার বলেছিলেন। পুলিশ কোর্ট কাছারি সবই বাবার হাতে, ডাকাত দলের চারজন ধরা পড়লেও, বাকিদের পুলিশ ধরতে পারেনি।

দিবাকর মণ্ডলরা ক্যানিং এলাকার প্রতিষ্ঠিত পরিবার। সুন্দরবনের লাট অঞ্চলে হাজার বিঘে জমি আছে তাদের। কে দেখবে এসব! বাবা ক্রমে ক্রমে কলকাতার পাট তুলে দিলেন। ক্যানিংয়ে বটকৃষ্ণ নস্করের ঘর গেরস্থালিই বাবার নিজস্ব সংসার হয়ে গেল।

আমাদের সঙ্গে ক্যানিংয়ের সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে। সেবারই প্রথম গেলাম, প্রতিমাকে দেখলাম। বাবার চেয়ে অনেক ছোট, হয়ত শিবুদার বয়সী, বা তার চেয়ে কিছু বড়। প্রতিমা আর বাবার সম্পর্কটা কেমন যেন ধোঁয়াটে অস্পষ্ট লাগে। সম্পর্কের একটা খোলামেলা প্রান্তর আছে। সুন্দরবনের ব-দ্বীপগুলো, ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, সুঁদরী গরান, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর— ইউনিভার্সালের কেবিনে শুয়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম, দিবাকরের সেই লঞ্চ, কী যেন নাম, মা ভৈরবী, কোন ভৈরবী—সেই বসিরহাট বাগানের ভৈরবী কী, দুধসাদা রঙ তরতর করে ভেসে চলেছে, কাটামুণ্ডু দিবাকর, শুধু ধড়টা আছে লঞ্চের সারেং-এর জায়গায়, কাঁচঘরে দাঁড়িয়ে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে যাচ্ছে। স্টিমারের ডেকের ওপর মাদুরপেতে, গণনাথ বসে আছে মজবুত, সুন্দরবনের নোনা হাওয়ায় পোড়া কালো রঙ, মাথায় ঘন সাদা চুল, প্রতিমা পরণে সরু পাড়, মিহি থান, গণনাথের কোলে মাথা রেখে চোখ বুঁজে শুয়ে আছে। দিবাকরকে আমি কখনও দেখিনি, ক্যানিংয়ের বাড়িতে তার কোন ছবিও দেখিনি।

মোটর লঞ্চ কেন ঘুরে ফিরে আমার স্বপ্নে আসে ডাক্তার বোসকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। ডাক্তার বোস বলেছিলেন, এটা পালতোলা জাহাজও হতে পারত। অকূল সমুদ্র, তার মধ্যে একটা লঞ্চ ভেসে চলেছে—ইনটারেসটিং।

ডাক্তার বোস হয়ত জানতে চাইবেন লঞ্চটা কোনদিকে যাচ্ছিল লক্ষ্য করেছেন, আপনার অবদমিত ইচ্ছাই তো স্বপ্নের আকার নেয়, কোনদিকে যাচ্ছিল লঞ্চটা বঙ্গোপসাগরের দিকে

না কি কলকাতার দিকে। আমি বলব, ডাক্তার বোস লঞ্চটা মুক্তাঞ্চলের দিকে যাচ্ছিল।

ছমাস ক্যানিংয়ে থাকার সময় দিবাকরেরই এক বৃদ্ধ মাঝির মুখে লাট এলাকার অনেক গল্প শুনেছিলাম। সুন্দরবনের তেনার সঙ্গে, আগুনের ভাঁটার মত চোখ, গায়ে সোনালি ডোরা কাটা দাগ, সেই মাঝির বহুবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। চোখে চোখ পড়লে তো আর ফিরে আসার কথা নয় সাক্ষাৎ যম, কিন্তু বনবিবি আর বাবা দক্ষিণরায় তাঁর সন্তানদের রক্ষা করেন। কদিন আগে, মাঝগাঙে হঠাৎ বাতাস পড়ে গেল, বৈঠা মেরে নৌকো চলে না চলে না, জোয়ার ভাঁটার সন্ধিক্ষণে নদীর স্রোতও কেমন স্থির হয়ে গেল, জল নিস্তরঙ্গ, সন্ধে হয় হয়, বহুকাল বৈঠা টানছে মাঝি, হাল ধরে বহুবার উথাল পাতাল ঢেউয়ের তাণ্ডবে নেচেছে মাঝি, মোহানার জলের চরিত্র তার জানা। হঠাৎ কোথা থেকে মা ভৈরবী, দাদাবাবুর দুধসাদা মোটর বোট, তীরবেগে নৌকোর গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। সারেঙ-এর কাঁচের ঘরটার আলো, আমি তো কোলেপিঠে মানুষ করেছি, আমার ভুল হয়নি, সাদা পাঞ্জাবির ওপরটা রক্তে ভিজে আছে। কোমর পর্যন্ত ধড়টা দেখা যাচ্ছে মুণ্ডুটা নেই, দাদাবাবুই, আমার ভুল হয়নি। অতরাতে দাদাবাবু লঞ্চটা নিয়ে কোথায় যাচ্ছে। তখন বুঝিনি এখন যেন স্পষ্ট বুঝতে পারি লঞ্চটা মুক্তাঞ্চলের দিকে ছুটে চলেছিল।

রুজি রোজগার

ইউনিভার্সাল নার্সিংহোমে বোধহয় দিন পনের কেটে গেছে। আমি এখনও জানিনা, চেষ্টা করেও মনে করতে পারি না, আমি এখানে এলাম কী করে। নিজের থেকে এখানে এসে ভর্তি হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। টুকরো টুকরো কিছু ছবি জোড়া দিয়েও বরদাভবন থেকে ইউনিভার্সাল নার্সিংহোম পর্যন্ত আমার গতিপথটা স্পষ্ট হয় না।

পাঁচতারা হোটেলের মত ব্যবস্থা, লিফট আছে, জেনারেটর আছে। আমার কেবিনের নম্বর ছশো দশ, এ থেকে আমার ধারণা আমি হয়ত ছতলায় আছি। রামদাস হনুমানদাস ফাউন্ড্রি আমি যেখানে স্টোর ক্লার্কের চাকরি করতাম, একবার ইউনিয়নের একটা মিটিং ডেকেছিল গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল। মিটিংটা তিনশো পাঁচ নম্বর ঘরে ছিল। ইউনিয়নের নেতা অবিনাশদা বুঝিয়ে না দিলে আমি বুঝতেই পারতাম না তিনশো মানে তিন তলার ঘর। আমি তো ভেবেছিলাম, তিনতলা পর্যন্ত হোটেলে তিনশোরও বেশি ঘর আছে।

ডাক্তার নার্সদের জিজ্ঞেস করে জানতে পেরেছি এক ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা রাত

প্রায় একটা নাগাদ আমাকে নার্সিংহোমে পৌঁছে দিয়ে গেছে। মাথায় ওইরকম ফাটা দেখে নার্সিংহোম আমাকে অ্যাড্‌মিশান দিতে চায়নি, কিন্তু সেই ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলার অনুরোধ উপরোধে রাত একটার সময় ডাক্তার ভার্গবকে টেলিফোন করা হয়। তিনি ম্যানজমেন্টের সঙ্গে আলোচনা করে আধঘণ্টা পরে আমাকে অ্যাড্‌মিশান দেওয়ার নির্দেশ দেন। আমার মাথায় আড়াআড়ি ভাবে গভীর ক্ষত, তখনও কানের পাশ দিয়ে ঘাড় পর্যন্ত বটের আঠার মত ঘন ঈষৎ হলুদ রস পড়ছিল, সঙ্গে রক্ত। আমাকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে দুদিন ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল, সঙ্গে সেলাইন আর গ্লুকোজ—শরীরের নুন আর চিনির প্রয়োজনে।

মাঝের এই অন্ধকার সময়টায় আমার কী হয়েছিল, 'আমি মনে করার চেষ্টা করছি বেশ কদিন ধরে। ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা এসেছিলেন একটা সাদা মারুতিতে। আমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে ভদ্রলোক পেছনের সীটে গুঁজে দিলেন। ওরা বলেছেন আমাকে সল্টলেকে, বনবিতানের সামনে রাত বারোটার সময় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখেছেন। আমি মাতালের মত টলছিলাম, আমার পরনের পোশাকে রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে গিয়েছিল। ওঁরা মাতালই ভেবেছিলেন প্রথমে। তারপর ভেবেছিলেন হয়ত পাগল, সল্টলেকে কোনোভাবে এসে পড়েছে। আর কি কি ভেবেছিলেন তাঁরা, আমিও জানি না, নার্সিহোমের ডাক্তার নার্সরাও জানে না। এমন কি হতে পারে যারা আমার মাথায় লোহার ডাণ্ডা মেরে মাথাটা দুফাঁক করে দিয়েছে, তাদেরই কেউ, সঙ্গের মহিলা হয়ত তার স্ত্রী অথবা রক্ষিতা, খারাপ মেয়েছেলে হওয়াই সম্ভব, নাহলে রাত বারোটায় সল্টলেকে, বনবিতানের সামনে সাদা মারুতি কেন?

তাই বা হবে কী করে? ডাক্তাররা বলেছে, আঘাতটা ফ্যাটাল — আমাকে প্রাণে মারার জন্যই ভারি, ধারালো কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল, পাশ থেকে। যারা খুন করতে চাইবে, তারা মারুতিতে চাপিয়ে আমাকে নার্সিংহোমে পৌঁছে দিয়ে যাবে কেন? বরদা ভবনে যারা হামলা করেছিল, তাদের ধরনধারণ মোটেই, ভদ্রলোকের মত ছিল না। নার্সিংহোমে যারা আমাকে দিয়ে গেছে, তাঁরা নিশ্চয়ই গুণ্ডার দলে ছিল না।

মাঝে মাঝে বেশ গুছিয়ে ভাবতে পারছি দেখে আমি নিজেই অবাক হচ্ছি। আগেও হয়ত ভাবতাম, ভাবনাগুলোকে দেখতে পেতাম না, ছুঁতে পারতাম না। রোজকার বেঁচে থাকার ভাবনাটাই যদি মনটা জুড়ে থাকে, তাহলে ভাবনাগুলোকে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না—এরকম একটা দার্শনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি মাথার ফাটা জায়গাটায় সন্তর্পণে হাত বোলাই। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে পড়ে, যারা আমার মাথায় লোহার রড দিয়ে আঘাত করেছিল, তারা তো সেদিন সন্ধের মধ্যে আমাকে বরদা ভবন ছেড়ে চলে যেতে বলেছিল। ওদের হিসেবে সেদিন সন্ধেটাই ছিল শেষ সন্ধে। ওরা খানিকটা সময়ও দিয়েছিল। তারপর বলেছিল—বানচোত তোমাকে যদি বরদা ভবনের ত্রিসীমানায় দেখতে পাই তাহলে এমন কড়কানি দেব, বাপের নাম শালা খগেন হয়ে যাবে। ওরাই ওই দুটো ছেলেই তো লাল একটা মোটরবাইকে এসেছিল একমাস আগে। এমনও তো হতে পারে, ওরাই মাথায় ডাণ্ডা মেরে আমাকে সাদা মারুতিতে চাপিয়ে বনবিতানের

সামনে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, আমি মরে যেতে পারি ভেবে। কিন্তু তাই বা হবে কেন, বরদা ভবন থেকে আমাকে উৎখাত করেই তো ওদের দায়িত্ব শেষ।

এও হতে পারে, খুনের প্রমাণ লোপাট করার জন্য ওরা আমার পাড়া থেকে এতটা দূর পর্যন্ত এসে, মরবই ধরে নিয়ে বনবিতানের জঙ্গলে ফেলে দিয়ে গেছে। যে ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা আমাকে ইউনিভার্সাল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলেন, তারাই বা এতটা করলেন কেন? সরকারি হাসপাতালে ফেলে দিয়ে গেলেই তো ল্যাটা চুকে যেত।

মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে, কানের পাশ দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে রস পড়ছে। একটা কেমন যেন ঘিয়ের মত গন্ধ। মাথায় ডাণ্ডা মারার পর, আড়াআড়ি মাথাটা দু'ফাঁক হয়ে গেল। মাথার মধ্যে বোধহয় চাপচাপ ঘন অন্ধকার ঢুকে গেল, চোখের সামনে বরদা ভবনের বড় দেউড়িটা ঝাপসা হয়ে গেল। বড় দেউড়িটা ইদানীং ভেঙেই পড়েছিল, শুধু একদিকের একটা ভাঙা থাম টিকেছিল। পাতলা ইঁটে তৈরি থামটা, ছোট্ট ছোট্ট টালির মত ইঁট নোনাধরা। থামের গায়ে হাত দিলে ঝুরঝুর করে নোনাধরা ইঁটের গুঁড়ো, সুরকি ঝরে পড়তে থাকে। বরদা ভবনের কেউ কী দেখতে পেল না? দেখার মধ্যে ছিলই বা কে? দোতলার এক ভাড়াটে, আর মানুপিসী, তাও মানুপিসীর তখন তো চোখে চালশে, কানে কিছুই শুনতে পায় না, রামপদজ্যাঠা তাঁর ছেলের বউ।

মানুপিসীর ঘরে তো যাওয়াই হয়নি দিন পনেরর বেশি। আমি বরদা ভবনে আমার অংশটুকু বাঁচাবার জন্যেই ব্যস্ত ছিলাম। কোর্ট কাছারি, থানা পুলিশ, এম. এল. এ। শেষ পর্যন্ত ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে ওরা আমাকে উচ্ছেদ করল। বরদা ভবন নাকি বিক্রি হয়ে গেছে, কে কিনল, কে বেচল কিছুই জানলাম না। আমার সঙ্গে নাকি চুক্তি হয়ে গেছে। আমি জানলাম না, সই করলাম না, চুক্তি হল কি করে? বরদা ভবনের অংশ নাকি আমার বাবা অনেককাল আগে প্রাণনাথ কাকার কাছে বিক্রি কোবলা করে দিয়ে গেছে। সেবার আমি ক্যানিং গেলাম, কই বাবা তো কিছু বলল না।

প্রাণকাকার একটা ঠিকানা রাখা ছিল। মুকুলের সঙ্গে প্রাণকাকা তখন হাজারিবাগ না গোমোতে। মানুপিসীই সব শুনে বলেছিল প্রাণকাকাকে চিঠি লিখতে। ঠিকানাও দিয়েছিল। চিঠি রিডাইরেকটেড হয়ে ফেরত চলে এল। বিদেশকে আন্দাজে অস্ট্রেলিয়ার ঠিকানায় চিঠি দিলাম। একমাস হয়ে গেল উত্তর নেই। বরদা ভবনে আমার অংশটুকু রাখার জন্য আমি একটা শেষ চেষ্টা চালাতে চেয়েছিলাম।

ছেলেদুটো কী মুক্তাঞ্চলের কথা জানে, আমাদের পাড়া যে তিনদিন, তিনরাত মুক্তাঞ্চল হয়ে গিয়েছিল, ওরা জানে না, ওরা আমাদের নেতা শিবু মজুমদারে নাম শোনেনি, শহীদ অশোক হাজরার নাম শোনেনি। অশোকের জন্য যেখানে শহীদ বেদী হয়েছিল গত কুড়ি বছরে সেখানে আরও পাঁচবার বা আরও বেশি হতে পারে ইঁট সাজিয়ে শহীদ বেদী তৈরি হয়েছিল। ওরা কী চেয়ারম্যানের নাম জানে?

মাথার ফাটা দাগটা ডেটল আর তুলো দিয়ে পরিষ্কার করছিল একটি নার্স, সে বলছিল বাঁচার কথা নয়, বাঁচলেন কী করে সেটাই আশ্চর্য। ডাক্তার ভার্গব বলেছিলেন, কাজটা নিখুঁত, প্রফেশনাল মার্ডারের মত। লোহার রড নয়, শার্প কিছু দিয়ে মেরেছে, এটা গলায় চালালে তো মিটেই যেত। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মাথাটা দেখতে দেখতে বললেন, দুটো হেমিস্ফিয়ারে আপনার মাথাটা ভাগ হয়ে গেছে, নর্থ এন্ড সাউথ।

নিউরোসার্জন আমার মাথাটা বিভিন্ন জায়গা টিপে টুপে দেখলেন। মাথার চুল ক্ষুর চালিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। দুটো দিন ঘুমের পর নিজেকে অনেকটা সুস্থ, ঝরঝরে লাগছিল। এমন কি তখনকার মত বরদা ভবন নিয়েও আমি খুব একটা ভাবছিলাম না। করপোরেশন বরদা ভবনকে বিপদজনক হিসেবে চিহ্নিত করেছে বছর পাঁচেক আগে। সেবার বর্ষায় পেছনের পাঁচিলের দিকটায় দোতলার একটা অংশ ছাদ সুদ্ধ হুড়মুড় করে ধ্বসে গেল। ওদিকের দুখানা ঘরে কেউ থাকত না, সেটাই বাঁচোয়া। আমাদের এক শরিকের অংশ তালাবন্ধই ছিল। সেই শরিক এখন কোথায় আমি খবর রাখি না। সে কি জানে বরদা ভবন বিক্রি হয়ে গেছে?

করপোরেশন তো আজ হোক, কাল হোক ভেঙেই দেবে, তাহলে আর মায়া বাড়ানো কেন? দেড়খানা তো ঘর, ছেড়ে দিন! সেই ছেলে দুটো মাসখানেক আগে বলেছিল, আমি দেড়খানা ঘর না ছাড়ালে করপোরেশন কী আমার মাথায় ডাণ্ডা মারত? মারত না হয়ত, পুলিশ দিয়ে আমার মালপত্রর সঙ্গে আমাকেও রাস্তায় নামিয়ে দিত। করপোরেশন কি এতদিনে বরদা ভবন ভেঙে দিয়েছে। নার্সিংহোমের কাউকে কী পাঠানো যায়? ডাক্তার বোস অনেকগুলো তার আমার ন্যাড়া মাথার বিভিন্ন অংশে জুড়ে দিলেন। বললেন ভয়ের কিছু নেই, ই ই জি—মাথার এনকেফেলোগ্রাফ না কি যেন। মাথার ভেতরে হেমারেজ হলে ধরা পড়বে, ক্ষত থাকলে ধরা পড়বে। আমি পেশাদার ঘাতক দুজনের কথা ভাবছিলাম।

নার্সিংহোমে পুলিশ এসেছিল, আমি একটা বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। পুলিশের অফিসারটি বলেছিল, মিঠুন চক্রবর্তীর মত চুল কলকাতায় লাখ খানেক ছেলের আছে, প্যান্ট সার্টের যা ডেসক্রিপশন দিলেন, তাতে কিছুই বোঝা গেল না। দেখলে চিনতে পারবেন?

আমি ডাক্তার বোস, নিউরোসার্জনকে জিজ্ঞেস করলাম, খুন করা কারও প্রফেশন হতে পারে? রুজি রোজগারের জন্য লোক নানা রকম ধান্দা করতে পারে, নানা ধরনের পেশা আছে জানি, কিন্তু খুন করা, জাস্ট একটা লোককে প্রাণে মারব আর সেটাই আমার পেশা, কেমন যেন ভাবা যায় না, তাই না?

ডাক্তার বোস ই. ই. জির কাগজের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে বললেন, সে কি? আপনি কখনও পেশাদার খুনীর কথা শোনেননি? বোম্বে দিল্লীতে তো বহুকাল আগেই ব্যাপারটা বাজারে এসে গেছে। আপনি হিন্দি ফিলম্ দেখেন না? দাঁড়ান, আপনার ঘরে একটা টি. ভি. সেট লাগিয়ে দেব, ফিল্ম্ দেখবেন।

বয়স্ক নার্সটি ব্যান্ডেজ, তুলো, কাঁচি, ছুরি গুছিয়ে ট্রেতে রাখছেন। ট্রেটা তুলে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, ইফ্ ইউ ডোনট মাইনড্ ডকটর, ডাক্তার বাবুরাও খুনে, প্রফেশনাল লাইসেনসড কীলার। একশোটা রুগী না মারলে ডাক্তার ডাক্তারই হয় না। ডাক্তার ভার্গব তার সামনে রাখা মেডিকেল চেক আপের রিপোর্ট দেখছিলেন। বললেন, এভাবে বলবেন না, পেশেন্ট মারা যেতেই পারে, আমরা রিসক নিই, নিতে বাধ্য হই, ওটা মেডিকেল এথিকসের মধ্যে পড়ে। বাঁচা মরা ঈশ্বরের হাতে। ডাক্তার ভার্গব ভগবান মানেন ধরে নিয়ে আমি বললাম, আপনি কখনও ভূত দেখেছেন?

আমি রামদাস হনুমানদাস ফাউন্ড্রিতে চাকরিতে ঢুকেছি, তাও তো বছর পনের হয়ে গেল। গত সাত মাস আমাদের কারখানায় লক আউট চলছে। এর আগে এত দীর্ঘদিনের লক আউট নাকি কোনোদিন হয়নি। পনের বছরের মধ্যে আমাদের কারখানায় পাঁচবার লক আউট হয়েছে কখনও এক মাস, কখনও তিনমাস। লক আউটের গোটা ব্যাপারটাই আমার খুব গোলমেলে মনে হয়। ক্রমাগত লোকসানের জন্য যদি কারখানায় লক আউট হয়, তবে আবার কারখানাটা খোলে কেন? বোঝা খুব শক্ত।

আমি খুব সক্রিয় কর্মী না হলেও ইউনিয়নের সঙ্গে থাকি। কারখানায় শ দেড়েক লোক ছিল পনের বছর আগে। এখন কমে অর্ধেক হয়ে গেছে। দুটো সেকসন পুরোপুরি বন্ধ। লোহার বালতি আর কড়াই অনেকদিন যাবৎ রামদাস হনুমানদাস আর তৈরিই করে না, বাজার নেই। ঢালাইয়ের আর যে তিনটে সেকসন চালু আছে, সেখানেও নাকি প্রত্যেক বছরেই লোকসান। আমরা বলেছিলাম, ইউনিয়নও বলেছিল, মালিকের দেওয়া দুনম্বরী হিসেব মানছি না, মানব না। আমরা গেটের সামনে সকালে, বিকেলে সমবেত শ্লোগন দিলাম, ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের সঙ্গে মালিকপক্ষের মিটিং হল, সরকারের নজরেও বিষয়টি আনার উদ্যোগ নেওয়া হল। মালিক লক আউটের নোটিশ ঝুলিয়ে দিল।

গোড়ার দিকে তাঁবু খাঁটিয়ে ঝাণ্ডা পুঁতে আমিও বসতাম। একবার অনশনে বসে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত নির্জলা উপবাসে কাটিয়েছিলাম। একজন এম. এল. এ. এসেছিলেন, লেবু দেওয়া চিনির সরবতের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে ছিলেন আমার দিকে। তিনি বলেছিলেন, চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। কারখানা খুলবে। কারখানা খুলল সত্যিই, কিন্তু মালিকপক্ষ আটজনকে ছাঁটাইয়ের নোটিশ দিল। এদের নাকি কাজ নেই। স্টোরে কাজ নেই বলে, পুলিনদাকে ছ'মাসের মাইনে দিয়ে বিদেয় করে দিল।

পুলিনদার আরো বছর দেড়েক চাকরি ছিল। পুলিনদাই আমাকে হাতে করে স্টোরের লেজার লেখা শিখিয়েছেন, কীভাবে স্টোরের রিপোর্ট হেড অফিসে পাঠাতে হয় দেখিয়ে দিয়েছেন। পুলিনদাকে আমরা বলেছিলাম, আমরা আপনার হয়ে লড়ব। পুলিনদা বললেন, ছমাসের মাইনে পাচ্ছি, পরে হয়ত এটুকুও পাব না। পুলিনদা পিতৃতুল্য লোক ছিলেন। এখনও কী বেঁচে আছেন? কী করে চলছে পুলিনদার? বিরাট সংসারের জোয়াল ছিল পুলিনদার ঘাড়ে। পাঁচটা ছেলেমেয়ে, বেশি বয়সে বিয়ে, পুলিনদা ছাড়া কারও রুজি রোজগার নেই। তার ওপর আবার এক বিধবা বোনের দায়।

ইউনিভার্সালে শুয়ে শুয়ে পুরনো অনেক মুখ মনে পড়ছে। পুলিনদা চলে গেছে, তাওতো বছর সাত আষ্টেক হয়ে গেল। এত কাছের মানুষ সব, এতদিন এদের মুখ মনে পড়েনি কেন? পুলিনদার বোন বাড়ি বাড়ি ঘুরে পাঁপড়, আচার, গুঁড়োমশলা, ডালের বড়ি বেচত।

রামদাস হনুমানদাস ফাউন্ড্রিতে একটা বদলি লোক নেওয়া হবে, খবরটা বোধহয় জয় কালিমাতা প্রেস থেকেই পাওয়া গিয়েছিল। ইউনিয়নের অবিনাশদার দাদা প্রেসে আসতেন, তাঁর একটা ছোটোখাটো প্রকাশনার ব্যবসা ছিল। বটকৃষ্ণবাবুই হয়ত তাকে বলে থাকবেন। প্রেসের একটা ছেলে বরদা ভবনে এসে অবিনাশদার বাড়ির ঠিকানা আর একশোটা টাকা দিয়ে গিয়েছিল।

আমাদের এলাকা ততদিনে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। জরুরী অবস্থা জারী হল, কিছুদিন আবার পাল্টা গরম, মিটিং মিছিল। কিন্তু তেমন বড় রকমের কিছু হল না। গোটা এলাকায় লোকজন কেমন যেন নির্বিকার নির্লিপ্ত। পাড়ায় দুয়েকটা ধরপাকড় হল, মিসা হল — কারও কোনো বিকার আছে বলে মনে হল না। গত ভোটের সময়ই শিবুদাদের দেয়াল লিখনের ওপর চুনকাম করে নতুনভাবে, নতুন শ্লোগান দিয়ে দেয়ালে লেখা হয়ে গিয়েছিল। চেয়ারম্যানের কথা, মুক্তাঞ্চলের কথা, বন্দুকের নলের ক্ষমতার কথা অল্পস্বল্প যেসব দেয়ালে থেকে গিয়েছিল, কেমন যেন ফিকে হয়ে আসতে লাগল।

আমি দ্বিতীয়বারের চেষ্টাতেও বি. এ. পাশ করতে পারলাম না। বিদেশ তো বি. এস. সি. পরীক্ষা না দিয়েই কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে গেল। ওর এক বন্ধু বছরখানেক পরে পাড়ায় ফেরত এসেছিল, বলেছিল বিদেশ বম্বের জাহাজ ডকে কাজ করছে, খুব চেষ্টা করছে, অনেককে ধরাধরিও করেছে, ও হয়ত জাহাজে খালাসির চাকরি নিয়ে ইন্ডিয়া ছেড়ে চলে যাবে। -

বিদেশ নাকি বলেছে, কী হবে এখানে পড়ে থেকে। সেই বন্ধুটি চলে যাওয়ার পর বিদেশের একটা চিঠি এসেছিল। মাস চারেক হল, আমি একটা জাহাজ কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছি। এখন শিক্ষানবিশী চলবে বেশ কিছুদিন, চাকরি পাকা হতে বছর খানেক। জলে জলেই ভেসে বেড়াতে হবে বিদেশকে, বছরে প্রায় আট ন মাস। এখনই ওর দেশে ফেরার ইচ্ছে নেই। চাকরির ব্যাপারে উন্নতির অনেক সুযোগ আছে। একদিন জাহাজের ক্যাপ্টেন হওয়াও সম্ভব, লেগে থাকলে। বাবাকে আর মানুপিসীকে প্রণাম দিয়েছে, মালতির কথা জানতে চেয়েছে, আশ্চর্য শিবুদার কথা কিছু লেখেনি। চিঠিটা এসেছিল সিঙ্গাপুর থেকে।

জাহাজের চাকরিতে শুনেছি অনেক মাইনে, জয় কালিমাতা প্রেসে বটকৃষ্ণ নস্কর বলেছিলেন বাবাকে। তবে মুস্কিল কী জানো গণনাথ, মাটির মায়া তো ক্রমশঃই কমে যায় জাহাজীদের। তখন রোজগার ভাল, তবে বেশির ভাগই পয়সা রাখতে পারে না। বন্দরে নামে, আর সমস্ত রোজগারের টাকা ফুঁকে দেয় — পৃথিবীর সব দেশের পোর্টই সমান, পয়সা উড়িয়ে দেওয়ার রাস্তার কী শেষ আছে? বিদেশ এক সমুদ্র থেকে আরেক সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে।

আজকাল আমি চোখ বুজলেই একটা মোটর লঞ্চ দেখতে পাই। গতিতে, হেডলাইটের আলোয়, জলে উত্তাল অন্ধকার সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে মোটর লঞ্চ। একটা মুণ্ডহীন ধড়, ডেকের ওপর সারেং-এর কাঁচঘরে, লঞ্চটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আমার রোজগার একার হিসেবে মন্দ ছিল না। মাসে প্রায় সাত আটশো। যখন ওভারটাইম হত, তখন মাসে বারো তেরশ টাকা পর্যন্ত হয়ে যেত। চাকরি পাকা হলে, মানুপিসী আর মালতিকে নিয়ে ট্যাক্সি করে কালিঘাট মন্দিরে গিয়েছিলাম। মানুপিসীই যেতে বলেছিল।

জয় কালিমাতা প্রেসে খবর পেয়ে বাবা এসেছিলেন, বাবাকে একটা জরি পাড় ফরাসডাঙার ধুতি দিয়েছিলাম। বাবা চিরকাল ধুতি আর হাফসার্ট দিয়ে চালিয়ে গেলেন। মিতব্যায়ী মানুষ, নেশার বালাই ছিল না, সকালে সন্ধেয় এককাপ চা। জয় কালিমাতার কর্মচারীরা বলত, বাবার মত মানুষ নাকি আজকাল হয় না। বটকৃষ্ণ নস্কর, জয়কালিমাতা প্রেসের মালিক বলতেন, গণনাথ আমার মায়ের পেটের ভাইয়ের চেয়েও বেশি। ও না থাকলে আমি প্রতিমাকে ফিরে পেতাম না। বাবা বললেন, এত দামি কাপড় আবার কিনতে গেলে কেন? আশীর্বাদ করলেন, সুখী হও। বাবা তো এখন ক্যানিং ছেড়ে চলে এলেই পারেন। বিদেশ না হয় অস্ট্রেলিয়ায়, আমি তো আছি। কিন্তু জানতাম বাবা আসবেন না।

প্রতিমার সঙ্গে বাবার সম্পর্কটা আমার কাছে এখনও অস্বচ্ছ লাগে, আবছা কুয়াশায় লঞ্চের ডেকে মাদুর পেতে বাবা বসে আছেন প্রতিমার মাথা তার কোলে। বাবা আলতো আঙুলে প্রতিমার চুলে বিলি কাটছেন। হাওয়ায় প্রতিমার চুল উড়ছে অল্প অল্প। সারেং-এর ঘরে মুণ্ডহীন ধড়। প্রতিমা এত লোক থাকতে বাবাকে আঁকড়ে ধরল কেন? ডাকাতির রাতের ভয়াবহ স্মৃতি কী আজও প্রতিমার মনে থেকে গেছে? বাবাই বাঁশঝাড় থেকে প্রায় আধ কিলোমিটার রাস্তা প্রতিমাকে বুকে করে বয়ে নিয়ে এসেছিলেন। প্রতিমার নগ্ন ক্ষতবিক্ষত দেহের ওপর নিজের আকাশি হাফসার্ট চাপা দিয়েছিলেন। রেখেঢেকে এই বর্ণনা সেবারই ক্যানিংয়ে গিয়েই শুনেছি।

বাবা কথা বলতেন কম। কিন্তু প্রতিমার কথা বাবার মুখে ছেলেবেলাতেও শুনেছি। প্রতিমা নাকি কলকাতাতেও এসেছিল-- আমাদের বাড়িতে বাবা তাকে আনেননি।

প্রতিমার বিয়ের সময় আমরা আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। বটকৃষ্ণ আমাদের দুভাইকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন নিজে, সঙ্গে একজন কর্মচারী। আমাদের তখন ছন্নছাড়া অবস্থা, বিদেশ আর আমার থাকার ঠিক নেই, খাওয়ার ঠিক নেই।

চাকরি পেয়ে বটকৃষ্ণ নস্করকেও একটা ধুতি দেব ভেবেছিলাম, হয়নি। তার বদলে প্রেসের সকলের জন্য আমি একবাক্স মিষ্টি নিয়ে গিয়েছিলাম। বটকৃষ্ণ আমার প্রণাম নিতেন না, আমি ব্রাহ্মণ বলে। সেদিন মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, সুখী হও।

মানুপিসীকেও একটা ভালো কাপড় দিয়েছি। মালতি তার শাড়িটা নিজেই পছন্দ করে কিনেছে। দামটা একটু বেশিই পড়ে গেছে। আমার মাইনে ওভারটাইমের রোজগারে মালতি খুব একটা খুশি হত না। প্রায়ই বলত, কী হবে এই কটা টাকায়, তাছাড়া বিয়ে-থা করলে, আমি তো বরদা ভবনে থাকবই না। এটা কী একটা থাকার মত জায়গা। মালতি যোধপুর পার্ক, বালিগঞ্জ, নিউ আলিপুরে ফ্ল্যাটবাড়ির স্বপ্ন দেখত।

রামদাস হনুমানদাস ফাউন্ড্রিতে চাকরি হওয়া, চাকরি পাকা হওয়ার পেছনে অবিনাশদার হাত অনেকখানি। অবিনাশদা দাদার কথা খুব মানেন। সেই দাদাকে বটকৃষ্ণ নস্কর হয়ত গণনাথের কথা বলেছেন, বিদেশের কথা বলেছেন, আমাদের কৃষক সংগ্রামের কথা বলেছেন। সবটাই অনুমানসাপেক্ষ । এটা বুঝি চেনাশোনা কেউ না থাকলে আজকাল কারও কিছু হয় না। স্টোরের পুলিনদা বলতেন, পৃথিবী চিরকালই বীরভোগ্যা, তবে তদ্বিরেও কাজ হয় — পৃথিবী তদবিরভোগ্যাও বটে। মালিকের সঙ্গে লড়াইও করতে হবে, আবার তাকে জো হজুরও বলতে হবে। এটাই ডায়ালেকটিকস্, অন্ততঃ এই দেশে। অবিনাশদার সঙ্গে প্রথম আলাপের পর আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি কী করেন?

অবিনাশদা বলেছিলেন, আমি ইউনিয়ন করি।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি রামদাস হনুমানদাসে চাকরি করেন না?

করি তো, মাস গেলে মাইনে পাই, ওভারটাইম পাই, অবিনাশদা বলেছিলেন, কিন্তু আসল কাজ, একমাত্র কাজও বলতে পার, ইউনিয়ন করা।

ইউনিয়ন করা একটা কাজ এটা ক্রমে আমি বুঝতে পেরেছিলাম। রামদাস হনুমানদাসের ফোরম্যান উজ্জ্বল সমাদ্দার মার্কস লেনিন পড়া লোক, কতই বা বয়েস তিরিশ, বত্রিশ। সেবার তিনমাস বন্ধের সময় মাঝে মাঝে ইউনিয়ন অফিসে দেখা হত। ফোরম্যান ইউনিয়নের লোক নয়, কিন্তু উজ্জ্বল আসত, আমাকে সম্ভ্রম করে দাদা বলত। উজ্জ্বলই বলেছিল, ইউনিয়ন করাটা কাজ নয়? কী বলছেন স্বদেশদা, হোলটাইম ওয়ার্ক। এই যে এখন ফ্যাক্টরি বন্ধ, আপনার আমার কাজ আছে? কিন্তু অবিনাশদাকে দেখুন, ইউনিয়ন করা, পার্টি করা এগুলো কাজ — হোলটাইম ওয়ার্ক, ভেরি মাচ প্রফেশনাল। কারখানাটা খোলার জন্য অবিনাশদাকে কত জায়গায় ছোটাছুটি করতে হচ্ছে— মিটিং, মিছিল অরগানাইজ করা, বেশ শক্ত কাজ।

ইউনিভার্সালে সেই ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা আগামীকাল আসবেন। ওরাই সাদা মারুতিতে আমাকে এই নার্সিংহোমে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। আমি নাকি সল্টলেকে বনবিতানের সামনে, উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আমি ওদের চিনি না নিশ্চিত, অস্ফুটভাবে চেহারা দুটো মনে পড়ছে। মাথা ফাটা, কানের পাশ দিয়ে মাথার ভেতর থেকে বটের আঠার মত ঈষৎ হলুদ রস গড়িয়ে পড়ছে। রাত তখন অনেক, বনবিতানে দুটো শেয়াল ডেকে উঠল। ভদ্রলোক আমার কাছে বোধহয় ঠিকানা জানতে চাইলেন, চোখে রূপোলি ফ্রেমের চশমা, ঘিয়ে রঙের সাফারী সুট পরনে। পাশেই ভদ্রমহিলা একটু মোটা, বোধহয় একটু বেঢপ মোটাই, শরীরের তুলনায় মাথাটা ছোট ঘাড় পর্যন্ত চুল, ঠোঁটে গাঢ় করে লিপস্টিক দেওয়া, বয়স্কাই—আমি মাথার মধ্যে তোলপাড় করতে থাকি, মগজের ভেতরে ঢেউ উঠতে থাকে, চেনা অচেনার মধ্যে দুজন মধ্যবয়স্ক রাত বারোটায় সল্টলেকে দুলতে থাকে। আচ্ছা লোকদুটোর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে ডাঃ বোস? রাত বারোটায় সল্টলেকে বনবিতানে ওরা কী করছিল, সঙ্গে একটা সাদা মারুতি? ওরা কী আমাকেই খুঁজছিল!

ডাক্তার বোস বললেন, ওঁরা নাকি ডাক্তার ভার্গবের খুব পরিচিত। বিরাট এক্সপোর্ট ইমপোর্টের কারবার-- তাছড়া, নানা ধরনের অর্ফানেজ, অনাথ আশ্রম, নার্সিংহোম, চ্যারিটেবল আরও কাজ কর্মে ওরা আছেন। ইনফ্লুয়েনশিয়াল লোক মনে হয়, না হলে রাত একটায় ইউনিভার্সাল নার্সিংহোমের মত জায়গায় আমরা অনেক ভি আই পিকেই অ্যাডমিশন দিই না, আর আপনি তো কিছু মনে করবেন না, গোটা ব্যাপারটা আমিও জানি না ঠিক, আপনি এখানে অ্যাডমিশন পেলেন কী করে?

আমি ডাক্তার বোসকে জিজ্ঞেস করলাম চ্যারিটেবল কাজকম্ম কী প্রফেশান? হোল টাইম ওয়ার্ক? রোজগাবের জন্য মানুষ চ্যারিটেবল কাজ করে? আমি ঠিক বুঝি না ডাক্তার বোস।

হৃদয়ের গান

পুজো এসে গেল বোধহয়। চারদিকে কাঁচঘেরা, ভারি পর্দা ঝোলানো এয়ার কনডিশনড ঘরের ভেতরে বসেও আমি শরতের একটা স্পর্শ পাচ্ছি যেন। পুজোর সময়ে বরদা ভবন, আমাদের পাড়া, পরিচিত লোকজন কেমন যেন বদলে যেত। উৎসবের ছোঁয়া লাগলে মানুষের এক আশ্চর্য রূপান্তর ঘটে যায়, আমি দেখেছি। মা, মানুপিসী, সোহাগবালা, মুকুল, পারুল, মালতি সবাই যেন তখন অন্যরকম হয়ে যেত। মাঠের দিকে একটা শিউলি গাছ ছিল, গাছতলাটা শিউলি ফুলে ভরে যেত। বিদেশ শিউলি ফুল হাতের

আঁজলা ভরে নিয়ে এসে টেবিলে রেখে দিত। শিউলির সুবাসে বরদা ভবনের আমাদের চুন সুরকি খসা, বিবর্ণ দেয়াল ঘেরা দেড়খানা ঘরে শরত নেমে আসত।

সেবার পুজোয় মালতি প্রথম শাড়ি পরেছে, রঙিন উৎসবের শাড়ি সেটা। নীল পাড়, সাদা খোলের শাড়ি, ওদের ইস্কুলের ইউনিফর্ম। সেই শাড়ি পরা মালতিকে আমি ইস্কুলে যাওয়া আসার পথে দেখেছি, অন্য রকম — তবে আরও পাঁচটা মেয়ের ভীড়ে, মালতি আলাদা করে নজরে পড়েনি। লাল উজ্জ্বল শাড়ি ডুরেকাটা, একই রঙের ব্লাউজ, গলায় একটা সরু সোনার চেন, কানে ছোট্ট ঝুমকো, লজ্জায় সামান্য জড়সড় এ মালতি অন্য এক অচেনা মালতির গন্ধ বয়ে নিয়ে এল যেন।

মালতির সঙ্গে পাশাপাশি থেকেই বড় হয়েছি, মা মারা যাবার পর বহুদিন ওদের দোতলার ঘরে আমি আর বিদেশ খেয়েছি, রাত্রে ঘুমিয়েছি। বয়ঃসন্ধির ভালোলাগার প্রকাশ বড় অন্যরকম। ছাদের ওপর হঠাৎ দুজনে একা হয়ে গেলে নিজের সুখ-দুঃখের কথা বলেছি, সন্ধ্যার আকাশে চাঁদ উঠলে এক রহস্যময় আলো আঁধারিতে হয়ত আঙুলে আঙুল জড়িয়েছি, নিজেদের অদ্ভুত স্বপ্নের কথা বলেছি, ভবিষ্যৎ কল্পনার কথা বলেছি। আমার খুড়তুতো বোন পারুল পাশের পাড়ার একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। মালতি কোনো এক নিভৃত মুহূর্তে এই ছাদে দাঁড়িয়েই বলেছিল, চল না স্বদেশদা আমরা দুজনে কোথাও পালাই, অনেক দূরে কোথাও, এখানে আমার ভালো লাগে না একটুও। আমার তখন সামনে টেস্ট পরীক্ষা, ক্লাস নাইনে উঠবে মালতি।

লজ্জার ভাবটা একটু কাটলে মালতি বলল, কই বললে না তো আমাকে কেমন দেখাচ্ছে। এটাতো বলার কথা নয়, অনুভবের কথা, আমি ভাবি।

নিজের বিমূঢ় ভাবটা কাটাবার জন্যেই বললাম, আমি কী তোকে শাড়ি পরা আগে কখনও দেখিনি?

লুকোচুরির গন্ধ পেয়ে মালতি দুপা এগিয়ে এল আমার নিঃশ্বাসের আওতায়, বলল, আহা সে তো ইস্কুলের ইউনিফর্মের শাড়ি। এই শাড়িটা দাদা দিয়েছে, মাকেও দিয়েছে। বল না স্বদেশদা, আমাকে খারাপ দেখাচ্ছে?

মালতির শরীর থেকে পারফিউমের একটা ভারী সুবাস আসছিল, কোমরের বিঘৎ খানিক উন্মুক্ত জায়গাকে দুহাতে জড়িয়ে আমি মালতির কপালে সন্তর্পণে দুই ভুরুর মাঝখানের উজ্জ্বল টিপ বাঁচিয়ে চুমু খেলাম। ঠোঁটের গাঢ় লাল লিপস্টিকের দিকে একপলক তাকিয়েছিলাম। সাজ নষ্ট হলে কিশোরী ক্ষুণ্ণ হবে, অতি সন্তর্পণে আমার ভালোবাসা তাই মালতির কপালে ঠোঁট ছোঁয়াল।

মালতি চোখ বুঁজেছিল। হঠাৎ চোখ খুলে, ওই বিপদজনক ঘনিষ্ঠতায়, ঘরের দরজা খোলা, যে কেউ আসতে পারে যে কোনো মুহূর্তে, বেপরোয়া মালতি ঝাঁঝিয়ে উঠল, এইভাবে কেউ চুমু খায়, কপালে। তুমি না স্বদেশদা একটা আস্ত হাঁদা।

আমি বললাম, বাঃ তোর ঠোঁটের লিপস্টিক নষ্ট হয়ে যেত না।

মালতি সরে গেল, বলল, যেত তো যেত, আবার লাগিয়ে নিতাম। ঠোঁটের ওপর ঠোঁট

রাখার, আহ, ইউনিভার্সালে শুয়ে শুয়ে আমার মনে পড়ছে, সেই গভীর মুহূর্ত আর এল না, সারাজীবনে এল না। সেদিন সারা শরীরে, স্নায়ুতন্ত্রীতে একটা অস্ফুট সুর শোনা গিয়েছিল, হৃদয়ের গানের সুর। এরপর মালতির শুধু ঠোঁটে কেন, সমস্ত শরীরে আমি দশহাজার এক বার আমার ঠোঁট চেপে ধরেছি কিন্তু সেদিনের সেই অস্ফুট সঙ্গীতের সুর শরীরে আর কখনও বেজে ওঠে নি। শুধু সেদিনের ওই সন্ধ্যার কয়েকটা মুহূর্তেই কী ভালোবাসা ছিল? ভালবাসায় হৃদয় ছিল— হৃদয়ে অস্ফুট সঙ্গীত! তারপর সবটাই নিয়মিত, একান্তই প্রাকৃতিক, অভ্যাসবশত?

রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে বিদেশকে বললাম, আমি মালতিকে ভালবাসি। বিদেশ বলল, সেতো আমিও বাসি, আরও অনেকে বাসে।

আমি বললাম, না সেরকম না।

বিদেশ বলল, তবে কীরকম?

আমি উত্তর দিলাম না।

একটু পরেই বিদেশ আমার দিকে পাশ ফিরে আমার মুখের ওপর ঝুঁকে এল। অন্ধকারেও ওর চোখ জ্বলজ্বল করছিল, বলল, তুই মালতির বুকে হাত দিয়েছিস?

আমি বললাম, না। তবে আমি ওর কপালে আলতো করে একটা চুমু খেয়েছি।

বিদেশ বলল, আমি ওর বুকে হাত দিয়েছি।

মালতির সঙ্গে আমার তখনকার সম্পর্কটা মানুপিসীর খুব একটা সুনজরে ছিল না। নানাভাবে মালতিকে তিনি আড়াল করেই রাখতে চাইতেন। শিবুদা অবশ্য তেমন কিছু বলত না। তবে সাবধান করত অন্যভাবে, ভালোভাবে লেখাপড়া কর, ভাল চাকরি বাকরি পেতে হলে পড়াশোনাটা লাগে। আমাদের তো আর মুরুব্বি নেই যে বলামাত্র একটা খালি চেয়ারে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেবে। আমি বুঝতাম শিবুদা মালতিকে নিয়ে একটা অস্পষ্ট ভবিষ্যতের কথা বলছে।

মালতির ফাইন্যাল পরীক্ষা হয়ে গেছে, এরপর মালতি কলেজে যাবে। মালতি খুব সিনেমা দেখছে, কোনো কোনোদিন আমার সঙ্গে, কোনোদিন বিদেশ না হলে মুকুল, পারুলের সঙ্গে। মালতি খুব সিনেমার ম্যাগাজিন পড়ত। ফিলম্ স্টারদের কেচ্ছাকাণ্ড, স্ক্যান্ডাল, গসিপ ওর খুব আগ্রহের বিষয় ছিল। আমিও যে কিছু কিছু খবর রাখতাম না তা নয়, কিন্তু রাজকাপুরের সঙ্গে নার্গিসের কী সম্পর্ক, ওয়াহিদা রহমনকে গুরু দত্ত কেন বেশি চান্স দেয়, সত্যি বলতে কী আমি জানতামই না।

আমাদের ঘরে একটা সেকেলে ড্রেসিংটেবিল ছিল। সেগুন কাঠের, কারুকার্য করা। কাঁচটাও দামি, কিন্তু অনেক পুরনো বলে কেমন যেন ঝাপসা দেখাত। মালতি ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখত, কখনও সোজাসুজি, কখনও পাশ ফিরে, অদ্ভুত বঙ্কিম ভঙ্গিতে। চুলের বিনুনির ছাঁদ বদলে বদলে, দেখত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, কখনও চুল এলো করে, ঘোমটা টেনে দাঁড়াত। নিজের শরীরকে আয়নার মধ্যে আবিষ্কার করার অক্লান্ত খেলায় আমাকেও মাঝে মাঝে যোগ দিতে হত। মালতি দেখত,

আর জিজ্ঞেস করত, বলতো, এভাবে আমাকে কেমন লাগছে? প্রথম দিকে এই আবিষ্কারের খেলায় অল্পস্বল্প যোগ দিলেও, কিছুদিনের মধ্যে ক্লান্তি এসে গেল।

প্রথমবার বি. এ. পরীক্ষায় ফেল করার পর মালতি বলল, তোমার দ্বারা কিস্‌সু হবে না। তুমি যদি ভেবেই থাক, আমাকে নিয়ে ঘর করবে, তাহলে বরদা ভবনের এই এঁদো পচা ঘর ছাড়তে হবে।

তখন সত্যিই আমি রুজিরোজগারের সন্ধান করতে শুরু করেছি। অস্পষ্টভাবে হলেও মালতির সঙ্গে আমার ভবিষ্যৎ সংসারের একটা ছবি জলরঙে আঁকা হতে শুরু করেছে। কলেজে ঢোকার পর মালতি পড়াশোনার পাট প্রায় চুকিয়েই দিয়েছিল। মালতি গান শিখত, নাচ শিখত। আমি ভাবতাম মালতি যদি খানিকটা সংসারের ভার নেয় তাহলে বালিগঞ্জ যোধপুর পার্ক না হোক, কসবা না হলে ঢাকুরিয়ায় একটা জায়গা হয়ে যাবে। প্রাণকাকারা বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর বরদা ভবনে আমার অংশটা বেচে দেওয়ার ইচ্ছে হয়েছে মাঝে মাঝে, সে তো ঢাকুরিয়ার সেই না দেখা ছশো স্কোয়ার ফুটের দু কামরা ফ্ল্যাটের স্বপ্নের জন্যই। সে স্বপ্নে বিদেশ, আমার যমজ ভাই কোথায় আমি খুঁজে পেতাম না, কিন্তু লালপেড়ে ডুরে শাড়ি পরে, মায়ের মত আঁচলে চাবি বেঁধে মালতিকে ঘুরে বেড়াতে দেখতাম।

স্বপ্নের এই ব্যক্তিগত বিস্তারের পাশাপাশি তখন কৃষক সংগ্রাম যে কিভাবে এক ব্যাপক বিস্তৃতি পেয়ে গেল, আমি টেরও পেলাম না। দ্বিতীয়বার বি. এ. পরীক্ষায় গণটোকাটুকির অভিযোগে আমাদের সেন্টারের একশো পনের জনের পরীক্ষা বাতিল হয়ে গেল। আমিও ছিলাম বাতিলদের দলে। বিপ্লবের লাল আগুন বরদা ভবনকে স্পর্শ করলে বিদেশ ঘরে ফেরা বন্ধ করে দিল। শিবুদাও আর দিনের আলোয় খুব বেশি ঘোরাফেরা করত না। মালতিকে মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন দেখাত, কিন্তু তার ভাবনার মুক্তাঞ্চলে তখন লং শটে কেবল রুপোলি পর্দা আর তার নায়ক-নায়িকা।

বিদেশই একদিন বলল, মালতি নাকি সিনেমায় নামছে। তুই কিছু জানিস?

বিদেশ আমাদের সম্পর্কের কথাটা ভালোমতই জানতো। মালতির সঙ্গে মাঝে মাঝে ঠাট্টা ইয়ার্কিও করত। বিদেশ কী সত্যিই মালতির বুকে হাত দিয়েছিল। বিদেশ হয়ত মিথ্যে বলেছিল। একদিন একান্তে মালতিকে, খুব বোকা বোকা জিজ্ঞেস করেছিলাম, মালতি তুমি আর কাউকে ভালোবাসো, মানে আমি ছাড়া অন্য কাউকে?

মালতি বলেছিল, সেতো বহু লোককেই ভালোবাসি, কতজনের কথা বলব?

আমি বললাম, না ধরো বিদেশকে, বিদেশকে ভালোবাসো?

বাসিই তো, মালতি বলল, অমন ভাল ছেলে, তাকে ভালোবাসব না?

আর কেন মালতিরানী, এবার দোতলা ছেড়ে একতলায় শ্বশুরঘরে এসো, হাঁড়ি হেঁসেল ধর, বিদেশ বলত। আমি বিদেশকে বললাম, মালতি সিনেমায় নামছে, আমি বলার কে? তুই তোর নেতাকে বল, তারই তো বোন, সেই তো গার্জেন।

মালতি ক্রমশ আমার ঘরে আসা-যাওয়া কমিয়ে দিল। বাড়িতেও খুব একটা থাকত

না। তার আজকে অমুক প্রোডিউসার, তো কাল কোনো নামকরা ডিরেক্টর। মানুপিসী মাঝে মাঝে আক্ষেপ করতেন, শিবুটা কিছু দেখে না। বিয়ের যুগ্যি বোন, দিন নেই রাত নেই ধিঙ্গিপনা করে বেড়াচ্ছে, তিনি নাকি সিনেমায় নামবেন। সিনেমায় কী ভদ্র গেরস্থ বাড়ির মেয়েরা নামে রে? সিনেমা করে যত রাজ্যের ছিনাল মাগীরা।

রামপদ জ্যাঠা একদিন বললেন, তার ছেলে এক ক্লায়েন্টকে নিয়ে এলফিনে গিয়েছিলেন। বলতে আমার খারাপ লাগছে স্বদেশ, তুমি একটু দ্যাখ, রাত আটটা নটার সময় আমাদের বাড়ির অবিবাহিত মেয়ে বারে বসে তিন চারটে মাতালের সঙ্গে হি হি হা হা করছে, ভাল দেখায় না। মেয়েটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

ব্যাপারটা নিয়ে কথা তুলতে ঝগড়াই হয়ে গেল মালতির সঙ্গে। আমি বুঝতে পারছিলাম মালতি আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। হৃদয়ের সম্পর্ক তো দূরস্থান, কোনো সম্পর্কের বাঁধনেই মালতি বাঁধা পড়তে আর রাজি নয়। বেশ করেছি বারে গেছি, মালতি বলল, ওর মুখে কী সেদিন মদের গন্ধ ছিল? তুমি আমাকে শাসন করার কে? আমি সিনেমায় নামি, জাহান্নামে যাই তুমি বলার কে? এখনও তো ভাত কাপড় দাওনি, তাতেই এতো! মায়ের কাছে বসে আবার চুকলি খেয়েছ?

শিবুদাকে, মানুপিসীকে বলব ভেবেছিলাম, ব্যাপারটা বড় বোকা দেখাবে, বললাম না। বলে কোনো লাভ নেই, আমি বুঝতে পারছিলাম। সেদিনই বোধহয় কাছাকাছি একটা অ্যাকশন হয়েছে। সন্ধে লাগতে না লাগতেই দোকানপাট বন্ধ, বি. টি. রোড থেকে আমাদের গলির মুখ পর্যন্ত ফাঁকা, একটা পুলিশের গাড়ি দ্রুত পার হয়ে গেল। গলির মুখ থেকে বরদা ভবনের ছাদের একটা অংশ দেখা যায়। কাছাকাছি আসতে নজরে পড়ল, মালতি----হ্যাঁ মালতিই আলসেয় ভর দিয়ে রাস্তার দিকটায় পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। মালতি তাহলে আজকে টালিগঞ্জে স্টুডিও পাড়ায় যায়নি। ইতিমধ্যে ও নাকি দুটো ছবিতে ছোট রোল পেয়েছে, একজন উঠতি পরিচালক বলেছে, ওর ভবিষ্যৎ আছে। মানুপিসীই বলেছিল কথাটা।

মালতি আজকাল টাকা আনে। আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে মানুপিসী বলেছিল, কোথায় জোয়ান মদ্দ ছেলে, লেখাপড়া শিখেছে, রোজগার করবে, তা না, দেশ উদ্ধার করে বেড়াচ্ছে। ঘরে অবিবাহিত বোন, ভাগ্য, একেই বলে ভাগ্য। নাচগান শিখতে গেলেও তো টাকা লাগে, কে দেয় বল। আমার যা ছিল, তাতো শেষ—ঘড়ার জল কদিন গড়িয়ে খাওয়া যায়। মালতি রোজগার করছে, আমি কিছুই করতে পারছি না।

আকাশের এককোণে মেঘের আড়ালে একফালি চাঁদ। অল্প হাওয়ায় মালতির চুল উড়ছে। আমি যে ছাদে উঠলাম, মালতি যেন টেরই পেল না। আমি মালতির মুখোমুখি দাঁড়ালাম। মালতি কাঁদছিল আমার দিকে পেছন ফিরে আছে ও, তবু কান্নার সঙ্গে ছোট ছোট হেঁচকি তোলার শব্দ আমার খুব চেনা, হেঁচকির সঙ্গে ওর ফুলেফুলে ওঠা পিঠও অজানা নয়। হঠাৎ যেন নিজেকে ফিরে পেয়ে আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, তুমি? একটু আগে যে দেখলাম তুমি ঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে গেলে।

আমি মালতির কথার কোনো উত্তর দিলাম না কেমন যেন মনে হল, আমার রাস্তা থেকে ওকে দেখা নিঃশব্দে ছাদে উঠে আসা মালতি সবটাই জানত। শুধু আমাকে দেখবার জন্য, মালতির পিঠ কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

মালতি আঁচলে চোখ মুছে বলল, বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলে কেন বললে নাতো! আমি বললাম, একটা চাকরির তদ্বিরে এক জায়গায় যাব বলে বেরিয়েছিলাম। সন্ধের মুখেই গলির অবস্থা দেখে ফিরে এলাম। মালতিকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি বেরোওনি? আজ স্টুডিও পাড়ায় কাজ ছিল না?

মালতি মাথা নীচু করে আমার শার্টের বোতাম নিয়ে খেলা করতে লাগল, বলল— কতদিন বাদে আবার দুজনে ছাদে উঠেছি, তাই না? ছাদে কেমন পুরু শ্যাওলা পড়েছে দেখেছ? হঠাৎ কথা থামিয়ে দিয়ে বলল, লাইনটা বড় খারাপ স্বদেশদা, আমার কিছু হবে না জানো? আমি বেশ বুঝতে পারছি, এই ছুটকো ছাটকা রোল পর্যন্তই, বড় কিছু আমার দ্বারা হবে না। চেষ্টা তো কম করলাম না।

মালতির সিনেমায় নামার ব্যাপারটা আগাগোড়াই আমার পছন্দ নয়, তবু সেই দুর্লভ মুহূর্তে আমার নিজের কথা মুখে এনে আমি সুরটা কাটতে চাইছিলাম না। আমি ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, উত্তমকুমার কতদিনে উত্তমকুমার হয়েছে বল। লেগে থাকতে হবে, বাহুল্য শোনাল, তবু বললাম—আমি তো আছি মালতি।

প্রাণকাকারা নিজেদের অংশ বিক্রি করে দেবে বলে চিঠি দিয়েছে, একঘর ভাড়াটেও উঠে গেল। শিবুদার জন্যে পুলিশ বারবার হানা দিচ্ছে। বিদেশ প্রায় আসেই না। স্টুডিও পাড়াতেও খুব গোলমাল, সন্ধের শিফটে কাজকর্ম প্রায় হচ্ছেই না। মালতিও খুব একটা বাড়ির বাইরে বেরচ্ছে না। পুলিশ তো একদিন মাঝরাতেই মালতিকে তুলে নিয়ে যাবে বলে বরদা ভবনে এসে হাজির।

বেশ কদিন এরপর মালতি আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াল। আমার সঙ্গেই একদিন বরানগরে পালিত পাড়ায় মাসীর বাড়ি গেল। তিন চারটে ছবিও দেখল। ওর একটা ছবি খুব তাড়াতাড়িই রিলিজ করবে, মালতি বলল, যদিও রোলটা ছোট, তবে কাজ আছে। আমি তখন একটা অর্ডার সাপ্লাইয়ের ফার্মে কমিশনে কাজ করি। বাবা বলেছিলেন, ক্যানিংয়ে গিয়ে ভেড়ির কাজ দেখতে, বিভিন্ন দ্বীপে বটকৃষ্ণ নস্করের যেসব ব্যবসায়িক লেনদেন আছে সেগুলো দেখতে। দিবাকর মণ্ডলের লঞ্চের ব্যবসায় অনেক সুযোগ আছে, বাবা সেটাও বলেছিলেন। মালতি বলল, ক্যানিং আমি মরে গেলেও যাব না। বটকৃষ্ণবাবু প্রেসের কিছু কাজকর্ম, বিশেষ করে প্রুফ দেখার কথা বলেছিলেন, হল না। প্রেস মারফৎ বাবা তখনও টাকা দিতেন, তাতেই আমার আর বিদেশের চলে যেত। অর্ডার সাপ্লাই থেকে যে কমিশন পেতাম, তার অনেকটাই আমি মালতিকে দিয়ে দিতাম। নাচগান শেখারও তো একটা খরচ আছে।

এমন গার্হস্থ্য সুখের দিন, যেন আমরা ভবিষ্যতের এক সংসার তৈরির জন্য এখন থেকেই মহড়া দিচ্ছি, খুব বেশিদিন চলল না। মালতি বলল, কমিশনের দু তিনশো টাকায়

একটা সংসার কতদিন চলে? মামাবাবু কী সারা জীবন তোমাকে বসিয়ে খাওয়াবে? মালতি আবার স্টুডিও পাড়ায় যাতায়াত শুরু করে দিল, ফেরে প্রায়শঃই বেশি রাতে। একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে মানুপিসী আমার ঘরে বসে থাকে সন্ধে থেকে রাত আটটা নটা পর্যন্ত।

সেদিন রাত প্রায় দশটার সময় মালতি ভেতরের দিকে দরজায় টোকা দিল। আমি ভেবেছিলাম, বিদেশ। চোখটা অল্প জড়িয়ে এসেছিল, হঠাৎ পারফিউমের চেনা গন্ধ নাকে যেতেই বুঝলাম মালতি।

দরজা খুলতেই মালতি প্রায় ধাক্কা দিয়ে আমাকে ঘরের মাঝখানে নিয়ে এল। আয়নার দিকে একবার অপাঙ্গে চেয়ে দেখল। তারপর প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায় এভাবে গলা জড়িয়ে ধরে, আধবোঁজা ঠোঁট দুটো প্রত্যাশায় তুলে ধরল। মালতির মুখে মদের গন্ধ। আমার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বলল, কনট্রাকটা পাকা হয়ে গেল, দশদিনের কাজ, রোজ পাঁচশো টাকা। হাতের ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে কয়েকটা একশো টাকার নোট বার করল, মালতি বলল, অ্যাডভান্স। তোমার অর্ডার সাপ্লাইয়ের কমিশনে মাসে পাঁচশো টাকা হয়? হয় না। ফিলমটার নাম জানো? হৃদয়ের গান।

মার্থা ইউনিভার্সাল নার্সিংহোমে দুদিন হল আসছে। ও আমার একটা সাক্ষাৎকার, একান্ত সাক্ষাৎকার নিতে চায়। নরওয়ে কিংবা সুইডেনের মেয়ে মার্থা। ইউনিভার্সালের কাজকর্ম সম্পর্কে ও অনেক কিছু জানে। আমি এতদিন হল এখানে আছি, বেশ কয়েকজন ডাক্তার, নার্সের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে অনেক ব্যক্তিগত কথাবার্তাও হয়েছে, কিন্তু ইউনিভার্সাল সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছুই জানি না।

মার্থার কাছেই শুনলাম, ইউনিভার্সালের কাজকর্ম নাকি সারা পৃথিবী জুড়ে। ইউরোপ, আমেরিকার বড় বড় শহরে ইউনিভার্সালের লোকজন আছে, বড় বড় নার্সিংহোম হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। ইউনিভার্সাল নার্সিংহোমের প্রধান কাজ নাকি মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেনাবেচা, হিউম্যান অরগ্যানের এক্সপোর্ট, ইমপোর্ট। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে অপারেশন রোগ নিরাময়, এটা তো আছেই, কিন্তু ইউনিভার্সালের খ্যাতি ওই হিউম্যান অর্গান জোগাড় করা আর তা ট্রানসপ্ল্যান্ট করার কাজের জন্য।

সাপোজ ইউ ওয়ানট টু গেট ব্যাক দি লস্ট পার্ট অফ ইওর ব্রেন। ইউনিভার্সাল তোমাকে ব্যবস্থা করে দেবে। সব সময় যে মানুষেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লাগবে এমন কথা নয়, জন্তুর

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গতেও কাজ হতে পারে, মার্থা বলল। আমার মগজের খানিকটা অংশ নাকি মাথার ওই আড়াআড়ি ফাটা জায়গা দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে গেছে। কানের পাশ দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যে রসটা নামছিল, ঘিয়ের গন্ধ—সেটা হয়ত আমার মগজ, ঘিলু। মগজের ফাঁকা জায়গাটায় হয়ত এখন বাতাস ঢুকে গেছে, অথবা কিছুটা আকাশ।

মার্থাকে বললাম, আমি কী আবার আমার গলে যাওয়া মগজ ফেরত পাব? মার্থা বলল, ভবিষ্যতে ব্রেনের সেই বিশেষ অংশের কাজে অসুবিধে হতে পারে, হয়ত ইউনিভার্সাল একটা বাঁদরের মগজ থেকে কয়েক চামচ ঘিলু তোমার মগজের খোলে ভরে দেবে। ওরা অবশ্য কমপিউটার, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মাইক্রো চিপস্ ভরে দেওয়ার কথাও ভাবছে।

আই থিংক, মার্থা বলল, বাঁদর উইল বি গুড! আফটার অল, বাঁদরই তো মানুষের পূর্ব পুরুষ। আফ্রিকাতেও তোমার ঘিলুর সঙ্গে মিলতে পারে এরকম হিউম্যান ব্রেনের খোঁজ চলছে। আই থিংক, কিছু একটা হয়ে যাবে, তুমি ভালো হয়ে যাবে সোয়াদেশ। আমি মার্থাকে বললাম, আমার মাথার ভেতরে যে এত কাণ্ড ঘটেছে, আমি কিছুই জানি না। শুধু কানের পাশ দিয়ে রস পড়ছে, বুঝতে পারি।

মার্থার পেশা জার্নালিজম। নারী মুক্তি আন্দোলনেরও মার্থা একজন অ্যাকটিভ কর্মী। এছাড়া নানা ফিলানথ্রপিক কাজ কর্মে ও আছে, ছেলেবেলা থেকেই। ইন্ডিয়াতে ও এই প্রথম এল, ন্যানির কাছে ও ইন্ডিয়ার কথা শুনেছে। সী ইজ মোর দ্যান এইট্টি নাও। ছেলেবেলায় সে কলকাতাতেই ছিল। বাবা মাকে অনেক ছেলেবেলায় হারিয়েছে মার্থা। নাও, তোমার জন্য সোয়াদেশ ফর দ্য এক্সক্লুসিভ ইনটারভিউ অব দি টিপিক্যাল কেস ইউ নো, আমি কলকাতায়। দুদিন ধরে মার্থার সঙ্গে গল্প করছি, আমি তত ভালো ইংরেজি বুঝতে পারি না! বরং রামদাস হনুমানদাস ফাউন্ড্রিতে কাজ করার সময় খানিকটা হিন্দি শিখেছিলাম। আমাদের ফোরম্যান উজ্জ্বল ভাল ইংরেজি বলত।

মার্থা বিড়ি খায়। ফ্যানটাসটিক এনড সো ইনডিয়ান, আজকাল বিড়ি এক্সপোর্ট হচ্ছে তুমি জানো? মেড ইন ইনডিয়া। মার্থা গডেস কালির খুব ভক্ত, সী ইজ দি রিয়েল সিম্বল অফ্ উইমেনস লিব, নারীমুক্তির প্রতীক নেকেড, আর সমস্ত মেল ডেমনদের মুণ্ডু কেটে সী মেড হার নেকলেস্। পা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অন্ দি গ্রেটেস্ট অব মেল গড্ শিভা। সামনের বিশ্ব নারীমুক্তি সম্মেলনে গডেজ কালি নিয়ে একটা পেপার পড়বে মার্থা। ওনলি প্রবেলম, কালি ইজ ব্ল্যাক এনড শিভা ইজ হোয়াইট। সারা পৃথিবীতে বিশেষ করে সাউথ আফ্রিকার রেসিয়াল রিলেশনস্ আরও কমপ্লিকেটেড। ব্ল্যাক গডেজ অন হোয়াইট গড, প্রবলেম—ইউ নো।

মার্থার সঙ্গে অনেক ব্যক্তিগত কথাবার্তা হয়েছে, ওর রিপোর্টের জন্য দরকার। শুধু ইউনিভার্সালের মেডিকেল রিপোর্টের জন্য তো আর লোকে মার্থার রিপোর্ট পড়বে না। দুর্গাপুজো এসে গেছে, সী ইজ অলসো এ সিম্বল অব উওমেনস পাওয়ার। মার্থা ছবি তুলবে, কলকাতার দুর্গা পুজা সম্পর্কে রিপোর্ট পাঠাবে সানডে টাইমসে।

আমার নিজের মধ্যে যে এত কথা আছে, সম্ভবতঃ আমার মাথার খুলি দুফাঁক না হলে আমি জানতেও পারতাম না। আমার সেইসব কথা পৃথিবীতে কারও, কোনো মেয়ের,

বিশেষ মার্থার মত মেয়ের কাছে যে এত জরুরী, ইউনিভার্সালে না এলে, মার্থার সাথে দেখা না হলে তাও কী আমি বুঝতে পারতাম! মালতির সঙ্গে তোমার এত ইনটিমেসি, বাট ইউ নেভার হ্যাড্ সেকস্। আমাদের ওখানে তো দুটো একটা ডেটিং এর পরেই, বাট আই মাস্ট সে ইট ইজ গুড। আমাদের দেশে টিনএজার মাতৃত্ব ইজ এ সোস্যাল এনড পলিটিক্যাল প্রবলেম। তাহলে তুমি কী করতে? ইয়ং ম্যান অফ টুয়েনটি ফোর অর ফাইভ, ইউ নেভার হ্যাড দ্য অ্যাপেটাইট ফর সেকস?

আমার সেই যন্ত্রণার, আনন্দের বর্ষণমুখর রাত্রের কথা আমি মার্থাকে বলতে চাইছিলাম না। সেটা কী শুধুই অ্যাপেটাইট, খিদে — হৃদয়ের কোনো সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা কী কোথাও ছিল না। শরীরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কী কেবল শারীরিক!

সন্ধে থেকেই তুমুল বৃষ্টি। আমি ঘর ছেড়ে বেরোইনি; মানুপিসী সেই সকলবেলায় চলে গেছে বরানগরে তার বোনের বাড়ি। দু দুবার পুলিশ মানুপিসীকে থানায় নিয়ে গেছে, একবার নিয়ে গেছে মর্গে। পুলিশের সঙ্গে এনকাউনটারে তিনটে ছেলে মারা গেছে, শিবুদার এজ গ্রুপে, খানিকটা নাকি মেলেও শিবুদার সঙ্গে, পুলিশের কাছে তো শিবুদার ছবি ছিল—তাও মানুপিসীকে পুলিশের গাড়ি এসে তিনবার তুলে নিয়ে গেছে। লাশগুলোর মধ্যে কোনোটা শিবুদার কিনা, আইডেনটিফাই করতে হবে।

মানুপিসী বোধহয় শিবুদার ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। বরানগর পালিত পাড়ায় কয়েক দিন থেকে, তিনি ভাবছেন কিছুদিন পরেই আলিপুরদুয়ারে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবেন। মালতির স্টুডিও পাড়ায় যদি কাজ থাকে তাহলে সে বরানগর থেকেই যাতায়াত করবে।

রাত প্রায় নটার সময় মালতি এল বৃষ্টিতে ভিজে চান করে। সন্ধ্যে থেকে একা একা কেমন যেন মালতির কথাই ভাবছিলাম। একটা পাকা চাকরি হয়ে গেলে আমাদের বিয়ের কথাটা বাবাকে বলব। বাবা হয়ত বটকৃষ্ণ নস্করের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। বাবার চেয়ে আর কতই বা বড় বটবাবু, কিন্তু বাবা কোনোদিন তার পরামর্শ ছাড়া চলেন না।

ঘরে ঢুকেই মালতি বলল সাবান আর গামছাটা দাও, গা ঘিনঘিন করছে, গলিতে একহাঁটু জল, খোলা নর্দমার যত নোংরা, এখানে মানুষ থাকে? মালতিই বলল, মা বরানগরে গেছে, আমারও তো সোজা ওইখানে যাওয়ার কথা ছিল। কী হয়েছে জানি না, ট্রাম বাস সব বন্ধ। ট্যাক্সিতে একগাদা পয়সা দিয়ে শ্যামবাজার পর্যন্ত এলাম তারপর আর ট্যাক্সি আসবে না।

স্নান করে মাথার ভিজে চুলে গামছা জড়িয়ে ঘরে এল মালতি। দোতলার ঘরের চাবি নেই, মালতি আমার বাবার একটা ধুতি পরেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, বিধবাদের মত লাগছে, তাই না। তারপর নিজেই বলল, বিয়েই হয়নি, তার আবার বিধবা। ঘরে সামান্য রুটি তরকারি ছিল, মালতি স্টোভ জ্বালিয়ে চায়ের জল বসাল। বলল, কী বিশ্রী ব্যাপার হল বলতো, বরানগর পর্যন্ত তো আর এখন পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় না।

মালতি খুব কথা বলছিল সেদিন। খাটের এককোণায় বসে পা দোলাতে দোলাতে ও বলল, একজন প্রোডিউসর নাকি ওকে বম্বেতে চান্স করে দেবে বলেছে। এখানে রোল

করে ও পাঁচ হাজার পায়, বম্বেতে সেটাই নাকি পঞ্চাশ হাজার। হিন্দীটা অবশ্য আমার তেমন ভাল আসে না, শিখে নেব, মালতি বলল।

স্নান করে এসেছে মালতি, তবু ওর চোখ মুখের ক্লান্তি আমার চোখে পড়ে। যখন পুরনো কথা বলছিল, তখন ওর চোখ মুখে একটা চাপা কৌতুক খেলা করছিল। ও সেই পুজোয় প্রথম লাল শাড়ি পরার কথা বলছিল। সিঁড়ির চিলেকোঠায় একদিন দুপুরে কোনো ছুতোয় ওর বুকে হাত দিয়েছিলাম, ও ভয় দেখিয়েছিল, মাকে বলে দেব। তুমি স্বদেশদা, চিরকাল একটা হাঁদা রয়ে গেল। ঘরের চল্লিশ পাওয়ারের হলুদ বাতিটা নিভিয়ে দিল মালতি। অন্ধকার ঘরে আমি আর মালতি মুখোমুখি। বাইরে অবিশ্রান্ত বর্ষণ। মালতি বলল, তোমার ভয় করছে?

শরীরের আশ্চর্য যাদুতে স্থান কাল পাত্র বিস্মরণ হয়। শুধু শরীর যখন কথা বলে, তখন আর কোনো কথা থাকে না, শুধু অবিশ্রান্ত বর্ষণ সারারাত, শরীরের কথায় সারারাত মুখর হয়ে থাকে।

মালতি বলল, ওর শ্বাস এখন স্বাভাবিক, পরণের পাটভাঙা ধুতি পায়ের কাছে, বরদা চাটুজ্জে মানে, তোমার ঠাকুর্দার বাবার হীরের আংটিটা খুঁজে পেয়েছ? মা বলে, ওটা নাকি তোমাদের কাছেই গচ্ছিত আছে।

আমি ফিসফিস করে বললাম, পেয়েছি। মালতি ধড়মড় করে উঠে বসতে চাইছিল, কোথায়? আমি ওকে আলতো হাতের চাপে আবার শুইয়ে দিলাম দুই বুকের মাঝখানে, ঘামেভেজা উপত্যকায় উত্তপ্ত ঠোঁট দুটো চেপে বললাম, এইখানে।

মালতি প্রায় আমাকে ধাক্কা দিয়েই সরিয়ে দিল। বলল, ওষুধপত্র খাইনি, তুমিও এমন হাঁদা কোনো ব্যবস্থা রাখনি, কিছু হলে, তুমি বুঝবে। ধুতিটা কোনমতে গায়ে জড়িয়ে, জলের ঘটি থেকে ঢকঢক করে জল খেল। তারপর বলল, সরে শোও, আমার ঘুম পেয়েছে।

হঠাৎ আমার দিকে পাশ ফিরে মালতি বলল, তুমি হীরের আংটিটা কখনও দেখেছ? আমি বললাম, না দেখিনি, তবে গল্প শুনেছি মায়ের মুখে, সোহাগ খুড়ির মুখে।

মালতী বলল আমি প্রায়ই হীরের আংটিটা দেখি, স্বপ্নে। কত দাম হতে পারে আংটিটার। হঠাৎ যদি কখনও আংটিটা পেয়ে যাও, তুমি আমাকে দেবে তো!

আমি মালতির মাথার চুলে খুব আস্তে আস্তে বিলি কাটতে লাগলাম। বললাম, তুমি ছাড়া আমার এই মুহূর্তে আর কে আছে মালতি!

মানুপিসী অনুমান করেছিল, শিবুদা কী কিছু জানতে পেরেছিল? শিবুদা তো তারপর একবারই এসেছিল সেই থানা থেকে আমাদের চারজনকে ধরে নিয়ে যাবার পর অল্পক্ষণের জন্য রাত্রিতে আমার ঘরে এসেছিল। আমি বরানগর পালিত পাড়ার ঠিকানা বলে দিয়েছিলাম। শিবুদা বলেছিল, তোকে ওরা আবার ধরবে, তুই মামার কাছে ক্যানিংয়ে পালিয়ে যা। ভজাদাকে পুলিশ ছাড়ল না, ভজাদা কী পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে মারা গিয়েছিল?

ইউনিভার্সাল নার্সিংহোমের কাউকেই আমি মালতির কথা বলিনি। ওরা তো জানতে চাইছিল, আমি রেডলাইট এরিয়া মানে বেশ্যাপাড়ায় কখনও গিয়েছিলাম কিনা! মালতি তো আমাদের বরদাভবনের মানুপিসীর মেয়ে। পাড়ার লোকে অকথা, কুকথা বলত, ঠারে ঠোরে ইঙ্গিত করত। মাঝে মাঝেই মালতিকে সন্ধের পর চৌরঙ্গী এলাকার কিছু বারে, রেস্তরাঁয় দেখা যাচ্ছে। রামপদ জ্যাঠা, আমাদেরই এক শরিকের ভাড়াটে আমাকেই বলেছিল। একটু দ্যাখ ব্যাপারটা। এতদিন পরে ইউনিভার্সালের এই ঘরে শুয়ে মালতির সম্পর্কে আমি খানিকটা অভিমানী হতে পারি। তার ধীরে ধীরে খারাপ হয়ে যাওয়া নিয়ে কষ্ট পেতে পারি, কিন্তু কিছুতেই বেশ্যা ভাবতে পারিনা।

রামদাস হনুমান দাস ফাউনড্রিতে স্টোরের চাকরিটা সবে পাকা হয়েছে। মাইনে ছাড়াও স্টোর ক্লার্কের দেখলাম, এক দেড়শো টাকা উপরি পাওনা আছে। মালতি কিছু না বলে কয়ে হঠাৎ একদিন বোম্বে চলে গেল, যাবে জানতাম। বোম্বের এক প্রযোজকের কলকাতার দালাল ওর পেছনে পড়ে গিয়েছিল। বোম্বে যাওয়ার আগে মনেপ্রাণে চেয়েছিলাম মালতির সঙ্গে কয়েকটা নিভৃত মুহূর্ত। মালতি দেখেনি, দেখলে হয়ত পাগল হয়ে যেত — কাঁচের বয়ামে পাঁচমাস তিনদিনের একটা ভ্রূণ আমাকে হন্ট করত। আমারই ঔরসজাত তো। মালতি কলকাতায় ছিল, এটাই আমার কাছে অনেকখানি মনে হত। আসত না, দেখা করত না — তবু আমি ওর ফিরে আসার প্রত্যাশায় গুণগুণ করে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে দিতাম, রাত গভীর হওয়া পর্যন্ত ভাবতাম, হয়ত আসবে, মালতি একবারের জন্য হলেও আসবে বরদা ভবনে, আমার ঘরে।

সীতাপতি কাজ করত ফার্নেসে, ফাউন্ড্রির বিভিন্ন ফরমায়েশের লোহার জিনিস হাইড্রান্টের ঢাকনা থেকে কোদাল বেলচা পর্যন্ত সবকিছুর জন্য প্রয়োজনীয় উত্তাপের হিসাব ছিল সীতাপতির নখের ডগায়। শিফট ডিউটি ছিল ফাউন্ড্রিতে। ওভারটাইমের জন্য সীতাপতি ফার্নেসের গনগনে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত কখনও টানা দু'সিফট — কখনও রাউন্ড দি ক্লক্। সন্ধেয় কোনোদিন যদি ডিউটি না থাকত, সীতাপতি ফ্যাক্টরির খুব কাছেই টুল্লুর ঠেকে যেত, গলায় তরল আগুন ঢালত। আমাকে বলেছিল, আমার ব্রান্ডটা কী জানিস — অমানুষ!

সরকার স্বীকৃত এমন একটা ব্র্যান্ড আছে, আমি জানতাম না। সীতাপতি, বয়সে আমার চেয়ে বছর দশেকের বড়, বলল খাও, পিও, জিও — আমি খেলাম! সীতাপতি আমার উরুতে চাপড় মেরে বলল, আগুনে টইটুম্বুর, এ আগুন নামাই কোথায়?

সীতাপতির সঙ্গে সরযূপ্রসাদ — ফার্নেসের সেকেন্ড অ্যাসিসট্যান্ট। সেই প্রথম আমার রেড লাইট এরিয়া দর্শন, কারখানা থেকে পাঁচশো গজের মধ্যে এমন একটা পাড়া আছে, জানতাম — যাইনি কখনও।

ইউনিভার্সালের ডাক্তার, নার্স এত ডিটেল জানতে চায়নি, বলিনি। আমার লাল এলাকার প্রথম অভিজ্ঞতা, মোটেই সুখের নয়। সীতাপতিই মুখের সামনে দেশলাই জ্বেলে বলেছিল, মাল ঠিক আছে, চলে যাও, আধঘণ্টা পাঁচটাকা, পারলে দু'এক টাকা বেশি দিও, বখশিশ।

ঘরে টিমটিমে একটা হলুদ বালব, ঘর বলতে প্লাস্টার হীন দেয়াল, দম আটকানো চৌহদ্দি, একদিকের দেয়ালে সেই চিত্রাভিনেত্রীর প্রায় নগ্ন ছবি, কৈশোরে একে দেখেই প্রথম উরুসন্ধিতে আমি মনুষ্যত্বের ঋজু বিকাশ অনুভব করেছিলাম।

মধ্যবয়সী মেয়েছেলেটি নিঃশ্বাসের আওতায় এলে, আমি দেখলাম, তার দুগালে বসন্তের গভীর ক্ষত, দুটি ভারি স্তন প্রায় পেটের ওপর, একটা গামছা জড়িয়ে নিয়েছিলেন তিনি শাড়ি ছেড়ে। আমার মুখের ওপর ভারি স্তনের একটিকে নামিয়ে আনতে আনতে বললেন, এত গুটিয়ে আছেন কেন? আমি বললাম, এখন এমার্জেন্সি, অনুশাসন পর্ব চলছে, আপনি জানেন।

অনুশাসন পর্বে সবকিছু নাকি স্বাভাবিক হয়ে যাবে আর কিছুদিনের মধ্যে। মানুপিসী তখনও বরদা ভবনের দোতলায়। আমি যতটুকু পারি দেখাশোনা করি। মালতি হঠাৎ পাঁচশো টাকা মানিঅর্ডার করে পাঠাল। মানুপিসী কুশল জানতে মালতির ঠিকানায় চিঠি দিয়েছিল। মালতির কাছ থেকে বহুদিন উত্তর আসেনি। শিবুদা নাকি বিহারে আত্মগোপন করে আছে, গয়া কিংবা জাহানাবাদে। বিদেশ জাহাজ কোম্পানীতে চাকরি নিয়ে সিঙ্গাপুরে।

দ্বিতীয়বার আর সেটাই শেষবার ওই পাড়ায় যার কাছে গিয়েছিলাম, সে বলেছিল, তার নাম মালতি। আমি একটু ধাক্কা খেয়েছিলাম। মুখে চড়া রঙ মাখা, ঝকমকে শাড়ি পরা মেয়েটাকে আমি বলেছিলাম, এটা তোমার আসল নাম? 'আলো থাকবে না নিভিয়ে দেব' জিজ্ঞেস করতে করতে সে বলেছিল, কেন নামটা পছন্দ নয়, তাহলে পছন্দসই একটা নাম দিলেই হয়—চাইলে হেমা মালিনীও বলতে পারেন। টেবিলের একটা ড্রয়ার থেকে একটা কনডোম বার করে খাটের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল, তাড়াতাড়ি করুন, রাত দশটায় ঘর ছেড়ে দিতে হবে, তার আগে আরও একটা খদ্দের চাই — না হলে খরচা উঠবে না।

গোলগাল, কালো চেহারা অনেকটা ক্যানিংয়ের প্রতিমার মত। সৌন্দর্যের সাধারণ মাপকাঠিতে, আমার প্রেমিকা ছিল বলে নয়, মালতি অনেক সুন্দরী। বিছানায় শুয়ে বলল, ভদ্রঘরের বউ, ঘঁরে চারটে লোক খেতে, স্বামীর কারখানায় লক আউট তিনবছর, কী করব বলুন। তবু যতটা সাবধান হওয়া যায়, সন্ধ্যে থেকে দশটা অবধি থাকি আর ওই শুনে বুঝে শিখেছি — ক্যাপটা রাখি। এখানে যারা আসে তাদের তো রোগের অন্ত নেই। আপনি ক্যাপের দুটো টাকা আলাদা দেবেন কিন্তু। কুড়ি পয়সায় তিনটির একেকটার দাম দুটাকা চাইছে শুনে আমার খারাপ লাগল, কিন্তু কারখানায় লকআউট শুনে বুকের কোথাও একটু চিনচিন করল যেন। হৃদয়ের গান নয়, তবুও অন্য একধরনের অনুভূতি। আমি পাঁচ টাকার নোট বাড়ালাম। ব্যাগ খুলে খুচরো ফেরৎ দিতে দিতে হেমা মালিনী নাকি প্রতিমা বলল, বেশি নেব নি, যা রেট হয়েছে তাই।

মাদুরের ওপর লঞ্চের ডেকে প্রতিমার কোলে মাথা রেখে গণনাথ শুয়ে আছে। আসলে লঞ্চে নয় ক্যানিংয়ে যে খামার বাড়িতে বাবা থাকত, সেখানেই একদিন সন্ধ্যায় আমি বাবাকে ওভাবে শুয়ে থাকতে দেখেছিলাম। মায়ের কোলে ওভাবে মাথা রেখে বাবাকে শুতে দেখিনি। বাবা কী এই বৃদ্ধ বয়সে হৃদয়ের গান শুনেছিলেন ক্যানিংয়ে।

প্রাণকাকা নাকি আমার মাকে হীরের আংটিটা দিয়েছিলেন। মালতি আংটিটার কথা জানে হয়ত, সেদিন রাত্রে জানতে চাইছিল।

মার্থার প্রশ্নের শেষ নেই, আমারও কথা বলার বিরাম নেই। গাধাবোটে খড়ের মানুষ হয়ত আমি ইউনিভার্সালে ঘুমের ওষুধের আচ্ছন্নতায়, স্বপ্নে দেখেছি, মার্থাকে বললাম।

মার্থা বলল, ইটস্ সিম্বলিক, ইস্ট তো ওপেন আপ করছে। এখন মানুষেরা খড়ের মানুষ কিনা দ্যাটস্ এ কোয়েশ্চন।

মার্থাকে আমার শৈশবের কথা, মায়ের কথা — বিদেশের কথা বললাম। বরদাকান্তর ভূতের কথা বললাম, হীরের আংটির গল্প বললাম। এমনকি সদ্য কৈশোরে এক অর্ধনগ্ন চিত্রাভিনেত্রীর ছবি দেখে, প্রথম যে মাস্টারবেট করেছিলাম, তাও বলে ফেলেছি মার্থাকে। মার্থা বলেছে, হাউ সুইট। মার্থা একটার পর একটা বিড়ি খেয়ে যাচ্ছে। ঘরটার ভেতরে ধোঁয়া ভারি হয়ে আছে। আমার কষ্ট হচ্ছে বোধহয় বুঝতে পারল মার্থা। পর্দা সরিয়ে দিয়ে একটা কাঁচের পাল্লা খুলে দিল। বাইরে থেকে শরতের ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে আসছে। আমার বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় আমি স্কাইস্ক্যাপারের ওপাশে একচিলতে কলকাতার আকাশ দেখতে পাচ্ছি। মখমলের মত নীল আকাশে তারার ফুলঝুরি।

মার্থা বলল, স্যাড ভেরি স্যাড, তুমি বড় লোনলি, একা। তবে বেশিদিন আর সাফার করতে হবে না। আই থিংক তোমার মেডিকেল রিপোর্ট ইতিমধ্যে থরো দেখা হয়ে গেছে। একটা কিডনিরই তো কত দাম। নিউইয়র্কের এক বিজনেস টাইকুন তো ফিফটি থাউজ্যান্ড ডলার দেবে বলে অফার দিয়েছে। তারপর ধর তোমার লিভার, প্যাংক্রিয়াস, প্রস্টেটের একটা পার্ট এনড্ ইউ হ্যাভ অফারড ইওর টেসটিজ অলসো। দিস ইজ সামথিং— হিউম্যান অর্গান নিয়ে এতবড় ডিল এর আগে আর হয়নি। তুমি জানো তুমি কত টাকা পাবে?

আমি চোখ বুজেছিলাম, শরীরের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের নাম আমি জানি। কিন্তু এগুলো আমি বেচব কেন? আমি তো বলিনি, আমি বেচব। তাহলে কে বেচল, কে কিনল?

আমি চোখ খুললাম। খুব ক্লান্ত লাগছে, মার্থার সঙ্গে কথা বলার পর মাথার মধ্যে আবার যন্ত্রণা হতে শুরু করেছে। আড়াআড়ি ফাটা জায়গা থেকে কানের পাশ দিয়ে বটের আঠার মত রস গড়াচ্ছে, আমি টের পাচ্ছি।

মার্থা বলল, ইউ আর টায়ার্ড ইউ মাস্ট স্লীপ। হালকা চাদর দিয়ে গলা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে দিল মার্থা। আমার মাথার কাছে বসল, মাথার কাটা জায়গাটা আলতো আঙুলে ছুঁয়ে গেল। তারপর ওর আঙুলের যাদু আমার সারা শরীরে গলা বুক, কোমর ছুঁয়ে, ক্লান্ত দুই উরুতে অস্থির ঘোরাফেরা করে উরুসন্ধিতে স্থির হয়ে রইল।

মার্থা বলল, উইল ইউ মাইনড, আমি যদি আরও কিছুক্ষণ তোমার কাছে থাকি? আমি দেখেছি ফ্রম ইওর রিপোর্ট, ফ্রম সেভেনটি এইট টু নাইনটি তুমি একা, ভীষণ একা, টুয়েলভ ইয়ার্স। একা থাকতে আমারও ভয় করে সোয়াদেশ। তুমি এখনও অসুস্থডাক্তার বলেছে — ইউ ক্যান নট হ্যাভ সেকস্ রাইট নাও। সুইচ টিপে ঘরের উজ্জ্বল আলোটা নিভিয়ে

দিল মার্থা। একটা সবুজ ঠাণ্ডা আলো জ্বলছে ঘরে। মার্থা আমার পায়জামাটা টেনে একটু নামিয়েদিল কোমর থেকে, পাতলা শার্টটা ঠেলে তুলে দিল বুকের ওপর। তারপর ফিসফিস করে বলল, আই লাভ ইউ সোয়াদেশ, ইউ পুওর হেলপলেস চ্যাপ, আই লাভ ইউ।

মার্থাকে বললাম, বেশ্যাপাড়াকে রেড লাইট এরিয়া বলে কেন তুমি জান? রেড মানে লাল—সে রঙ তো বিপ্লবের রঙ, তারুণ্যের রঙ। সাতাত্তরের ভোটের পর আমাদের পাড়ার সমস্ত লাইটপোস্টের বাল্বে আমরা লাল কাগজ মুড়ে দিয়েছিলাম। বিপ্লবের লাল আগুন দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও।

মার্থা বলল, লাল অনুরাগের রঙ, ভালোবাসার রঙ, আজকের দুনিয়ার প্রস কোয়ার্টাসকে রেডলাইট এরিয়া বলা ঠিক কিনা, আমি জানিনা স্বদেশ। মার্থার জিভ, ঠোঁট আমার নাভি স্পর্শ করে ক্রমশঃই নিম্নগামী অমোঘ উরুসন্ধির দিকে।

পাশের কোনো কেবিনে কেউ একটা রেকর্ড প্লেয়ার চালিয়েছে। ধীর লয়ে একটা পিয়ানো বাজছে। আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, সারা শরীরে একটা অদ্ভুত কাঁপুনি শুরু হয়েছে, নীল অন্ধকারে তলিয়ে যেতে যেতে আমি বললাম, মার্থা আমি তোমাকে ভালবাসি। বরদাকান্তর সেই হীরের আংটিটা যদি কখনও খুঁজে পাই, আমি তোমাকে দেব।

সওদা

ইউনিভার্সাল নার্সিং হোমে কয়েকটা দিন আমাকে ঘিরে জোর তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। আমার যে কটা অর্গান—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ফর সেল বলে অফার করা হয়েছিল, সবই নাকি বেশ ভালোদামে বিক্রি হয়ে গেছে। ডাক্তার ভার্গব বললেন, ফেবুলাস অফার পাওয়া গেছে মিস্টার চ্যাটার্জী। ডাক্তার ভার্গব বললেন, আপনি এই ডীলটা থেকে কত পাচ্ছেন জানেন? দুলক্ষ ডলার, ইনডিয়ান কারেনসিতে ষাট লক্ষ টাকা। ইনকাম ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, প্রফেসনাল ট্যাক্স ইত্যাদি কত লাগবে আমাদের কনসালটেনট হিসেব করে দেখেছেন।

তবে এটা তো এক ধরনের এক্সপোর্ট, আই মীন, আমরা তো আপনাকেই আপনার অর্গান শুদ্ধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, সমস্ত ক্লায়েনটই হার্ড কারেন্সির দেশগুলোতে। বোম্বে বা বাঙ্গালোরে যে ব্যবস্থা করা যেত না তা নয়, কিন্তু আমাদের ক্লায়েন্টদের আবার থার্ড ওয়ার্লড কানট্রির হাসপাতালের ওপর আস্থা কম। তাছাড়া ওদের দেশের ইনসিওরেনসের ব্যাপারটা অনেকটা অ্যাডভানসড্। ব্যালে নর্তকী পায়ের বুড়ো আঙুল ইনসিওর করছে পাঁচ লাখ ডলারে। ফুটবলার হাঁটুর মালাইচাকি, কিংবা হয়ত হ্যামস্ট্রিং ইনসিওর করছে পঞ্চাশ লাখ ডলারে।

আমাদের এখানে কাজ হচ্ছে কিছু কিছু—তবে সময় লাগবে, দশবছর, বিশবছর। সবে তো আমরা লিবারালাইজেশন নিয়ে ভাবতে শুরু করেছি। হয় জেনেভায়, নয়ত লস এনজেলসে অথবা দুজায়গাতেই, আমাদের ডাইরেকট কনট্যাকট— দরকারে একটা ভেন্যুও ঠিক করা যেতে পারে। কিডনিটা ধরুন জেনেভায় দিয়ে দিলেন, তারপর বাকি অর্গানগুলো, যাই হোক আপনার কোনো চিন্তা নেই, উই উইল টেক কেয়ার অফ দ্যাট।

একটা খুশি প্রায় সকলেরই চোখে মুখে। ডাক্তার বোস তো বলেই ফেললেন, ডীলটা ফাইন্যাল হয়ে গেলে তাজ বেঙ্গলে একটা পার্টি থ্রো করতে হবে। আমাকে ফিসফিস করে বললেন, ট্যাক্স-ফ্যাক্স বাদ গেলেও মশায়, লাখ পঞ্চাশেক টাকার তো মার নেই। তারপর ধরুন, যদি এক্সপোর্টের জন্য, আই মীন ডলারের জন্য কিছু ইনসেনটিভ পাওয়া যায়, তাহলে তো—ওহ, ভাবা যাচ্ছে না।

আমি ডাক্তার বোসকে বললাম, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। আমার অর্গানগুলো ওই যে বললেন না কিডনি, আধখানা ফুসফুস, টিসু কালচারের জন্য খানিকটা পাছার মাংস, একটা প্রস্টেট গ্ল্যান্ড, এগুলো তো আমারই মানে আমি বলতে চাইছি, আমারই শরীরের ভেতরে এইসব কলকব্জাগুলো আছে। এগুলো বেচল কে? আমি তো কিছুই জানি না।

ডাক্তার ভার্গব হাসিহাসি চোখে চশমার ফাঁক দিয়ে দেখলেন, আপনার সেন্স অব হিউমার আমরা এ্যাপ্রিসিয়েট করি। জন্তু জানোয়ারদের মধ্যে কাম ক্রোধ লোভ মোহ এটসেটরা ছটা রিপুই পাবেন, কিন্তু হিউমার পাবেন না। আপনার ব্রেন সেলগুলো দ্রুত রিকভারির পথে, তবে এত ফাস্ট যে আপনার রসবোধ আই মীন সেন্স অব হিউমার ফিরে আসবে— সো আই মাস্ট সে, ইউ আর আ লাকি ডগ্।

কুকুরকে আদর করার মতই ডাক্তার ভার্গব আমার গালে দুটো মৃদু চাপড় মেরে বেরিয়ে গেলেন। আমি বয়স্কা নার্সটিকে বললাম, সরু ফ্রেমের চশমা, বেশ রাশভারি চেহারা, বিশ্বাস করুন সিসটার, আমার অর্গানগুলো মানে ওই কিডনি টিডনি কে কিনছে, টাকা দিচ্ছে, আমি কিছুই জানি না। তবে আপনারাই যখন সব ব্যবস্থা করেছেন, হয়ত আপনারা জানেন। কিন্তু আমার কিডনি, লাঙ্গ তারপর টিসু কালচারের জন্য পাছার মাংস, আরও কী কী সব, এগুলো বেচল কে?

ইউ নটি চ্যাপ, বলে উনি আমার মাথার ফাটা জায়গার সেলাইটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন, তারপর বললেন, আমাদের কাছে কাগজপত্র আছে, স্ট্যাম্প পেপার। আপনার অথরাইজড এজেন্টই তো আপনার হয়ে দাম দস্তুর করছেন। ইউ হ্যাভ গট্ এ রিয়েল প্রফেসন্যাল এজেন্ট, আপনি জানেন, ও টোটাল ডিলের জন্য কত দর হেঁকেছিল, ওয়ান ক্রোর রুপিজ, গুড হেভেন, এক কোটি টাকা।

কানের পাশ দিয়ে খুব সামান্যই রস গড়াচ্ছিল। রসটা এখন একটু পাতলা, ফিকে হলুদ, তুলো দিয়ে উনি ঘাড় ও কানের পাশ মুছে দিলেন, বললেন, স্বদেশবাবু আমাদেরও তো কমপিটিটর আছে। এশিয়ার দেশগুলো থেকে, বিশেষ করে পুওর দেশগুলো থেকে আস্ত মানুষ এক্সপোর্ট হয়ে যাচ্ছে। অলমোস্ট গরু ছাগলের দরে, আর আপনি বলছেন অর্গান।

মার্থাই একদিন বলছিল, মিডল ইস্টে ক্যামেল রেসের জন্য বাচ্চা বাচ্চা ছেলে এক্সপোর্ট হয়ে যাচ্ছে। মার্থা নাকি একবার উটের রেস দেখেছে। উটের পিঠে বাচ্চাগুলোকে দড়ি দিয়ে বেঁধে বসিয়ে দেওয়া হয়, উট ছুটতে থাকে বাচ্চাগুলো চীৎকার করে কাঁদে, আর্তনাদ করে, উট আরও জোরে ছোটে এনড্ ইউ নো দ্যাট ইজ দি মোস্ট থ্রিলিং পার্ট অব দি গেম। বাচ্চাগুলো কেনাবেচা হয় সোয়াদেশ। দেয়ার আর এজেন্টস। তারা বাংলাদেশে আছে, ইন্ডিয়ায় আছে, এশিয়া আফ্রিকার দেশগুলোয় তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে বাচ্চা কেনার জন্য। কোথাও বাচ্চার বাবা মা বেচে দিচ্ছে, কোথাও কোথাও অরফানেজ, অনাথ আশ্রম। বাচ্চাগুলো ইন মোস্ট অব দি কেসেস মরেই যায়, বাট ইউ নো, ইটস এ লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স।

মার্থাই বলেছিল, ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর, হংকং অ্যাজ ফার অ্যাজ আমস্টারডাম ফ্রেশ ট্রেডের জন্য, ব্রথেলগুলোর রেগুলার ডিমান্ড মেটানোর জন্য ম্যাকসিমাম নাম্বার অব গার্লস এক্সপোর্ট হয় তোমাদের সাব কনটিনেনট থেকে। ইয়েস, ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, নেপাল দে আর দি বিগেস্ট এক্সপোর্টার অব গার্লস টু দি গ্লোবাল ফ্রেশ ট্রেড।

এশিয়ার অনেক শহরে ট্যুরিজম ফ্লারিশ করছে, কেন জানো, ফ্রেশ ট্রেডের জন্য। এটাকে তুমি সেক্স্ ট্যুরিজম বলতে পার।

মার্থার চোখের রঙ বেড়ালের চোখের মত কটা। সেই কোন ছেলেবেলায় অবশ্য সেই প্রথম আর সেই শেষবার আমরা বরদা ভবনের সবাই মিলে ডায়মন্ডহারবারে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম, আমার একটা মার্বেল হারিয়ে গিয়েছিল, মার্থার চোখের রঙের মত। এখন ইউনিভার্সালের বেডে শুয়ে আমার মনে পড়ল, আমি মার্বেলটা খুঁজে পাইনি আর।

আজ কথায় কথায় মার্থা নিজের বয়স বলল, থারটি সিক্স, আমি ভেবেছিলাম ছাব্বিশ। মাথায় আমার প্রায় সমান সমান, গায়ের রঙ দুধে আলতা, কোথাও কোথাও ফ্যাকাশে, চওড়া কাঁধ, কবজি আমার চেয়েও মোটা, সরু ফিতেওয়ালা ব্লাউজে বন্ধনহীন বুক বেশ ভারি, আনত নম্র। কোমরে চওড়া বেল্ট, মুখে তেমন প্রসাধনের বালাই নেই। ঠোঁটটা এমনিতেই একটু লাল, রঙ নেই। মার্থাকে চুমু খেলে লিপস্টিক নষ্ট হবে না।

মার্থা বলল, সেবার আমরা ব্যাংককে গেছি আমার বন্ধু ড্যানিয়েলের সঙ্গে। এর পরের বার ইন্ডিয়াতে এলে ড্যানিয়েলকে সঙ্গে আনব। মার্থার বাচ্চাকাচ্চা নেই। ওর আরলি এজের বয়ফ্রেন্ড মরে গেছে ভিয়েতনাম ওয়ারে। তারপর থেকেই ও ফিলানথ্রপিক কাজে। ভেবেছিল চার্চে নান হবে, হয়নি। বিয়ে একটা হয়েছিল, ভেঙে গেছে। এখন ও আর ড্যানিয়েল মাঝে মাঝে একসঙ্গে থাকে। তেমন হলে একসঙ্গে ঘুরতেও বেরিয়ে পড়ে আফ্রিকান সাফারিতে অথবা মিডল ইস্টের মরুভূমিতে।

সেবার মার্থা আর ড্যানিয়েল ব্যাংককে। ওখানে নেহাৎ কিউরিওসিটি, ড্যানিয়েল একটা বাচ্চা মেয়ের খোঁজ করেছিল, ইউ নো, টু স্লিপ টুগেদার। এক দালাল খোঁজ করে একটা বাচ্চাকে নিয়ে এল। সোয়াদেশ, ইউ উইল নট বিলিভ সী ওয়াজ ইলেভেন ওনলি। মে বী টেন, এনড দে আসকড ফর ওয়ান হানড্রেড বাকস। একটা রাত্রের জন্য একশো

ডলার। এর থেকে মেয়েটা কত পাবে জানো? অনলি ফাইভ ডলারস। বাই দি স্ট্যাণ্ডার্ড অফ্ ইওর কানট্রি অনেক টাকা তাই না?

আমার মাথার মধ্যে যন্ত্রণা হচ্ছিল। মার্থা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বোধহয় বুঝতে পারল। আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল, মার্থা তার রুমাল দিয়ে চোখটা মুছিয়ে দিয়ে বলল, তুমি দুঃখ পাচ্ছ বাট ইটস্ রিয়েলিটি। এভরিথিং ইজ এ কমোডিটি, এভরিথিং হ্যাজ ইটস্ ওন প্রাইজ।

নিজেকে আমার মাঝে মাঝে খুব অসহায় বোধ হয়। মালতি আমাকে চরমপত্র দিয়েছিল, আর কটা দিন দেখব, তারপর আমার নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নেব। আমার তখন কীই বা করার ছিল? বরদা ভবনের দেড়খানা ঘর কখন বেহাত হয়ে যাবে তার ঠিক নেই, দুবেলা নিজেরই দুটো অন্নসংস্থানের স্থিরতা নেই। জয়কালিমাতা প্রেসের দয়ায়, বাবার নামে তুলে দেওয়া দেড় দুশো টাকার মাসিক ব্যবস্থা, আমি কী করতে পারতাম। মালতি বলেছিল, কিছু একটা কর শেষ পর্যন্ত কী আমি গলায় দড়ি দেব, বিষ খাব। পরপর দুটো মাস শরীরের নিয়মের বদলে মালতি কেমন যেন খেপে গিয়েছিল। মালতির পেটে সন্তান এসেছিল।

একটা বিড়ি ধরিয়ে মার্থা বলল, আমি সেদিন একজন মেল প্রসটিটিউটের সঙ্গে কাটিয়েছি। আই থিংক এ পাকিস্থানী অর মে বী ফ্রম ইরাক অর ইরান। এনড জাস্ট টু হ্যাভ এ গুড স্লীপ, খাওয়া-দাওয়া, হোটেল খরচ ছাড়াও আমাকে টোয়েনটি ডলার খরচা করতে হয়েছিল। একটু ঘন করে আমার চোখের তাকিয়ে মার্থা বলল—ইউ ফীল ব্যাড, তাই না?

মার্থা বেশ কদিন হল কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে। কাগজে আমাকে নিয়ে রিপোর্টটা বেরিয়েছে কিনা জানি না। জেনেভা কিংবা লস এঞ্জেলস্ যেখানেই আমি থাকি না কেন, মার্থা আমার সঙ্গে দেখা করবে, কথা দিয়ে গেছে, হয়ত ড্যানিয়েলকেও সঙ্গে আনবে।

আজ সন্ধেবেলা মার্থা থাকলে, আমি ওকে হয়ত গাধাবোটে খড়ের মানুষদের কথা বলতাম। গাধাবোটটার মাঝখানে অনেগুলো কচি কাঁচা মা বাপ ছাড়া, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। ওরা কী আরব সাগর পার হয়ে মরুভূমির দেশে যাবে? ক্যামেল রেসের লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্সের জন্য ওরা কি বিক্রি হয়ে গেল? আর খড়ের মানুষগুলো? ওরা কী আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকার খনিগুলোতে চালান হয়ে যাবে? গিরমিটিয়া—এগ্রিমেন্ট টিপ ছাপ দিয়ে, ওরা নিজেদের বেচে দিয়েছে। মার্থা নিশ্চয়ই কোনো উপসাগরের কূলে পড়ন্ত সূর্যের আলোয় গাধাবোটে কতকগুলো শূন্য মানুষ দেখেনি, ওরা খড়ের মানুষ। কমোডিটি সোলড্, বিক্রি হয়ে যাওয়া সওদা। আমার অর্গানগুলো কে বেচে দিল? আমার আবার এজেন্ট কে? আমি কাগজে সই করে নিজেকে বেচে দিতে বলেছি?

আসলে আপনি অসুস্থ ছিলেন তো, ডিনারের পর দক্ষিণী সেই ছেলেটি নরসিমহন হাতে কয়েকটা স্টাম্পড পেপার নিয়ে ঢুকল, সেইই বলল, হয়ত আপনার খেয়াল হচ্ছিল না মাথায় যে চোটটা লেগেছিল—এই কাগজগুলোতে আপনার সই সাবুদ আছে। আপনার এজেন্টের নাম ঠিকানা সই সমস্ত কিছু আছে। সাক্ষী হিসেবে আছেন সলিসিটর মিস্টার

ভার্মা আর আপনার এজেন্টের স্ত্রী। আপনি তো একেই অথরিটি দিয়েছেন, আপনার অর্গানগুলো অ্যাজ ফার অ্যাজ প্র্যাকটিকেবল, বেচে দিতে এনড ফ্রম ইউনিভার্সাল নার্সিং হোম ওনলি। এগুলো সবই ফোটোকপি, চাইলে আপনাকে অরিজিন্যালও দেখাতে পারব। আপনার নিজের তো কেউ নেই বোধহয়। একটা ইনসিওর করানো হবে, অনেক টাকার—আপনার কোনো নমিনির নাম বলবেন? আমি অস্ফুটে বললাম, আমার এক যমজ ভাই আছে বিদেশ, কিন্তু সে তো অস্ট্রেলিয়ায় ওখানেই সেটল্ করেছে নন্ রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান। ওর একটা ঠিকানা তো ছিল আমার কাছে, এখন কী সেটা খুঁজে পাব?

নরসিমহন বললেন, এখানে কলকাতায়, ইন্ডিয়ায় আপনার কেউ নেই? শুনলাম, কেউ তো খবরও নিতে আসে নি।

ছিলতো, আমি বললাম, মালতি, মানুপিসী বরদাভবনের জ্ঞাতগোষ্ঠী, প্রাণকাকা মুকুল—কিন্তু ইউনিভার্সাল থেকে কার সঙ্গে যে কীভাবে যোগাযোগ করা যাবে।

নরসিমহন বললেন, কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য, আপনার গোটা ব্যাপারটা একটু সিক্রেট। নরসিংহমকে বললাম, নমিনির নামটা পরে দিলেও তো অসুবিধে নেই। আমি একটু ভাবি।

ইউনিভার্সাল নার্সিংহোমে বোধহয় মাস খানেকের ওপর হয়ে গেল। আমার ঘরে একটা রঙিন টি.ভিও আছে, নতুন। যখন কিছুই ভাল লাগে না তখন টি.ভি. দেখি। দুয়েকদিনের মধ্যে ওরা আমাকে অল্পস্বল্প বাইরে বেরবার অনুমতিও দেবে বলে কথা দিয়েছে। বাইরে বলতে নার্সিংহোমের সীমানার মধ্যে, ছতলার ব্যালকনিতে, অথবা নীচে একতলায় সুন্দর ঘাসের লনে। মাথার আড়াআড়ি ফাটা জায়গাটা থেকে রস পড়া পুরোপুরি বন্ধ না হলেও অনেক কমে গেছে। দুতিন দিন অন্তর স্ক্যানিং হচ্ছে—মাথার জন্য তো বটেই তাছাড়া আরও হাজার টেস্ট সমস্ত শরীরের জন্যেই। সব ঠিকঠাক চললে, দেওয়ালির পরেই হয়ত আমাকে জেনেভা কিংবা লস্ এঞ্জেলস রওনা হতে হবে। এখন শুধু চূড়ান্ত চুক্তিপত্র অনুমোদনের অপেক্ষায়।

আমার এজেন্টের নাম দেখছি কমল পাকড়াশি। কদিন ধরেই চেষ্টা করছি মনে করতে, কিন্তু কিছুতেই পারছি না—লোকটা নাকি বহুদিন আগে আমার এজেন্ট ছিল আমাকে বছর পনের ধরে চেনে। বছর পনের ধরে আমাকে চেনে এমন কোনো লোকের মধ্যে, অনেক হাতড়েও কমল পাকড়াশি নামে কাউকে আমি খুঁজে পেলাম না। তাছাড়া বছর পনের

আগে, হনুমানদাস ফাউন্ড্রিতে চাকরি পাওয়ার আগে, আমিইতো এজেন্ট ছিলাম—কমিশন এজেন্ট। বেলেঘাটায় এক বাঙালি ভদ্রলোক, কেমিস্ট, শিবনাথ মাইতি বোধহয় নাম ছিল, একটা ছোট কারখানা খুলেছিল। শ্যাম্পু, মাথায় মাখার তেল, স্নো আরও দুতিন রকমের কসমেটিকস তৈরি হত। আমি সেই মাইতিবাবুর কোম্পানির এজেন্ট ছিলাম বেশ কিছুদিন। বরানগর থেকে দক্ষিণেশ্বরে কিছু দোকানে মাল দিতাম। আমার আবার এজেন্ট কে ছিল?

সল্টলেকে বনবিতানের সামনে রাত বারোটায় মারুতির হেড লাইটের আলোয় দেখামাত্র কমল পাকড়াশির মনে হয়, আরে এতো আমার পুরনো ক্লায়েন্ট। ওর স্ত্রী ললিতা পাকড়াশি না কি গাড়িতে তোলার সময় আমাকে দেখামাত্র চিনতে পারেন, নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমার নাম ধরে ডাকেন, আমি জ্ঞান হারাবার আগে বলি, আমি বরদা ভবনে যাব। এসব কথা টুকরো টুকরো, আমি ইউনিভার্সালের ডাক্তার আর নার্সদের মুখে শুনেছি।

নরসিমহন অবশ্য বলেছেন, আমার এজেন্ট মিস্টার পাকড়াশি, কয়েকদিনের মধ্যেই ইউনিভার্সালে আসবেন, সস্ত্রীক। আমার নিয়মিত খোঁজখবরও রাখছেন তিনি প্রায়ই, ফোন করেন।

বরদা ভবন থেকে সল্টলেকে বনবিতানে আমি এলাম কি করে কিছুতেই মনে করতে পারছি না। গাছপালা, হাঁটু সমান ঘাসের মাঝখানে হঠাৎ জেগে উঠে, জায়গাটা যে সল্টলেক তাইই আমি বুঝে উঠতে পারিনি। একটা সিমেন্ট বাঁধানো চত্বরে আমি শুয়েছিলাম। একটু আগে বোধহয় বৃষ্টি হয়ে গেছে। মাথার ওপর তাঁবুর মত একটা ছাউনি ছিল, বৃষ্টির ছাটে বেশ খানিকটা ভিজে গেলেও, আমি হয়ত যন্ত্রণায় এপাশ ওপাশ করেছি, পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে পাইনি। হঠাৎ কাছেই একটা শেয়াল ডেকে উঠল, আমার মাথার দিকে খুব কাছেই। আমি চোখ মেললাম, মাথার ওপর ছাউনির একপাশে অনন্ত আকাশ, ছেঁড়া কালো মেঘ তরতর করে ভেসে যাচ্ছে, বাঁকা চাঁদ হলুদ আলো নিয়ে মেঘের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে, আবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে আসছে। মাথাটা যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে। ঘাড় তুলে কোথায় শুয়ে আছি দেখার চেষ্টা করতেই তিনটে শেয়াল, স্পষ্ট দেখলাম, আমার মাথার দুহাতের মধ্যেই, চাতালটার একধাপ নীচে বসে আছে। হঠাৎ মেঘের আড়াল থেকে চাঁদটা বেরিয়ে পড়তেই শিয়াল তিনটে আকাশের দিকে মুখ তুলে তিনবার ডেকে উঠল, হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া।

ইউনিভার্সালে জ্ঞান ফিরে আসার পরে বলেছিলাম, শিয়াল তিনটে বোধহয় আমার মাথার ফাটা জায়গাটা চাটছিল জানেন? তারপর কীভাবে ঝোপঝাড় জঙ্গল ভেঙে আমি রাস্তায়, আমার এজেন্টের সাদা মারুতির হেড লাইটের সামনে এসে পড়লাম, আমার কিছুই মনে নেই। ভাবতে গেলে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘগুলো মাথার ভেতর ঢুকে যাচ্ছে, ভীষণ ভয় করছে।

জেনেভা যেতে হলে পাসপোর্ট লাগবে। পাসপোর্টে আমার অকুপেশন, মানে পেশার কথাটা লিখতে হবে। রামদাস হনুমানদাস ফাউনড্রিতে স্টোর ক্লার্ক ছিলাম একসময়ে, আমি বললাম, কিন্তু এখন তো আমি বেকার। সাত মাস ধরে লক আউট চলছে। রামদাস হনুমানদাস খুলেছে কিনা আমি জানি না, খুললেও আমার চাকরি আছে না গেছে তাও জানি না। এ অবস্থায় পেশা চাকরি লেখা যাবে কিনা কেউ বলতে পারল না। আমার এজেন্ট

পাকড়াশি নাকি বলেছে পেশা বিজনেস লিখতে। নট ব্যাড, নিউরোসার্জন ডাক্তার বোস বলেছেন, আফটার অল আপনার অর্গান বিক্রির ব্যাপারটা তো বিজনেসই।

বরদা ভবনে সেদিন সেই ছেলে দুটো এল। টেনে হিঁচড়ে আমার জিনিসপত্র রাস্তায় ফেলে দিল। আমি পুরোনো স্টীল ট্রাঙ্কটা নিজে নিতে চেয়েছিলাম। প্রাণকাকার সঙ্গে আমার বাবা গণনাথের ভাগবাটোয়ারার সোলেনামার কাগজ, বাবার নামে করপোরেশনের রসিদ সবই তো ওই ট্রাঙ্কে ছিল।

ছেলে দুটো প্রথম যেদিন এসেছিল, বলেছিল, আপনিই তো স্বদেশ চাটুজ্জে, আপনি জানেন বরদা ভবন বিক্রি হয়ে গেছে, সেদিনই আমি জয় কালিমাতা প্রেসে যাই, বাবাকে ক্যানিংয়ে একটা খবর পাঠাতে চেষ্টা করি। বাবা ঠিক এই সময়ে বরদাকান্তর পিণ্ডি দিতে গয়ায়, বরদা কী ক্যানিংয়েও বাবাকে দেখা দিয়েছিল? বলেছিল, বড় কষ্ট, বড় কষ্ট। গয়া, কাশী, মথুরা বৃন্দাবন করে বাবা একমাস পরে ফিরবেন।

রামপদ জ্যাঠা বললেন, আমাদের তো কোনো রাইট নেই, কাগজপত্রও নেই। উঠে যেতে বলছে, কিছু টাকা দেবে বলছে, উঠে যাব—দিন পনের সময় চেয়েছি। প্রাণকাকার কাছে লেখা চিঠি রিডাইরেকটেড হয়ে ফিরে এল। অন্য দুই শরিক নাকি তাদের অংশের হিসেব বুঝে পেয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। মানুপিসী দোতলার ঘরে এখন একাই থাকে, সকাল সন্ধ্যে গঙ্গায় যায়, ঠাকুরবাড়ি যায়। চোখে চালসে, কানেও কম শোনে। কদিন আগেও বলছিল, ছানিটা একটু কাটিয়ে দে না বাবা, শিবু ফিরে এলে তাকে দেখলে তো চিনতেও পারব না। মালতির খবর নেই বছর দুই। মানুপিসী বলেছিল, থানায় একটা ডায়েরি করে দে স্বদেশ। দুটো বছর হয়ে গেল, মেয়েটার খবর নেই। দুবছর টাকা আসেনি।

দেখা হতেই মানুপিসী হাউহাউ করে কেঁদে উঠল, হ্যাঁরে স্বদেশ এরা যে বলছে, বরদা ভবন বিক্রি হয়ে গেছে। মালতির টাকা আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বছর দুয়েক হল ভাড়া দিইনি, তেনারাও চায়নি। দুটো ছোঁড়া এসে বলে গেল, সাত দিনের মধ্যে ঘর ছেড়ে দিতে হবে। আমি ওদের শিবুর কথা বলেছিলুম। শিবু ফিরে এলে, সে আমায় কোথায় খুঁজে পাবে, মালতি বম্বে থেকে এসে কোথায় উঠবে? মানুপিসীর কাছে বরদা ভবনের দেড়খানা ঘরের সমস্যার কোনো সমাধান নেই।

সেই সময়ে, বহুদিন পরে আমি রামদাস হনুমানদাস ফাউন্ড্রিতে গিয়েছিলাম। অবিনাশদা, উজ্জ্বল, ভাবছিলাম এদের সঙ্গে একটু পরামর্শ করি। ফ্যাক্টরিতে সাত মাস লক আউট। বরদা ভবনের দুখানা ঘর, এজমালি কুয়োতলা, দরমা ঘেরা রান্নাঘর ভেতরের বারান্দায় আর একটা খাটা পায়খানা—জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই জেনে এসেছি এই অংশটুকু আমাদের, গণনাথ আর তার পুত্রদের ওয়ারিশক্রমে খাস দখলে।

অবিনাশদা তার পরিচিত এক উকিলের ঠিকানা দিলেন। বললেন, উকিলের সঙ্গে পরামর্শ কর। আর ছেলে দুটো যখন থ্রেট করছে, থানায় একটা ডায়েরি করে দাও। থানায় তিনবার ফিরিয়ে দেওয়ার পর ডায়েরি নিল। ডিউটি অফিসার বলল, কোথাকার ছেলে, কেমন দেখতে কিছুই তো ঠিকমত জানেন না আর বরদা ভবন আপনার বাবার না কার

বাবার সেটা থানার জানবার কথা নয়। সিভিল কোর্টে যান, কাগজপত্তর দেখান।

বহুদিনের পুরনো হাত ঘড়িটা বেচে শ'খানেক টাকা পেয়েছিলাম। ষাটটা টাকা উকিলের টেবিলে রেখে আসতে হল। বৈঠকখানা বাজারের পিছন দিকে চেম্বার, বললেন, নেহাৎ অবিনাশবাবু পাঠিয়েছেন, কেসটা নিলাম। কাগজপত্র তো কিছুই নেই, দলিল দস্তাবেজ, খাজনার রসিদ আছে কিছু?

আমি বললাম, সব কিছু তো আমার কাকা প্রাণনাথই দেখতেন। বাবা তো মা মারা যাওয়ার পর থেকে ক্যানিংয়ে।

তা সে কাকা কোথায়? তাকে বলুন। এভাবে কেস লড়া যায়? ঢাল নেই তরোয়াল নেই। টাকাটা সার্টের পকেটে গুঁজে দিয়ে বললেন, দেখি কতদূর কী করা যায়। পজেসান যখন আছে একটা একশো চুয়াল্লিশ তো ঠুকে দিই, তারপর যা থাকে বরাতে। থার্টি ইয়ার্স প্রফেশানে আছি, এখন আপনার কপাল আর আমার হাতযশ।

টাকমাথা উকিলবাবু একটা সবুজ রঙের কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন, দস্তখত করুন।

আমি বললাম, এটা কী?

উকিলবাবু বললেন, প্রথমবার আসছেন তো কোর্ট কাছারি করতে, কিছুই জানেন না। পেটে দুকলম আছে, পড়ে দেখুন—ওকালতনামা বলে কাগজটাকে। উকিলবাবুর এগিয়ে দেওয়া ডটপেন দিয়ে আমি নাম সই করে দিলাম।

উকিলবাবু রুমাল বার করে টাকমাথা মুছলেন, বললেন, দুদিন কোর্ট বন্ধ— খুললেই আমি মুভ করব। সঙ্গে কিছু টাকা রাখবেন। এক্স্ পার্টি একশো চুয়াল্লিশ তো আর মুফতে হয় না।

আমি শুকনো মুখে বললাম, কত, মানে কত টাকা রাখতে হবে?

শখানেক তো বটেই, উকিলবাবু আমার সই করা ওকালতনামা, দুআঙুলে আলতো করে তুলে নিলেন, বললেন, কী ভবন যেন, বরদা ভবন—এই শহরে যে কত ভবন আছে, সিভিল ম্যাটারটা নিয়ে আপনি ভাববেন না। আমি অম্বিকাকে বলে দেব, দুঁদে উকিল— একবার প্যাঁচমেরে দিলে চলবে, চলতেই থাকবে, পাঁচ দশ পনের বছর—তেমন হলে আপনি মরা ইস্তক।

মাটি সরে যাচ্ছে, পায়ের নীচে থেকে ক্রমে মাটি সরে যাচ্ছে, একটার পর একটা ঢেউ আসছে, লোনা নীল জলের ঢেউ আমার নাকেমুখে ঢুকে যাচ্ছে আমি পায়ের নীচে মাটি খুঁজে পাবার চেষ্টা করছি, পারছি না—এমন একটা অনুভূতি নিদ্রায় জাগরণে আমাকে

ঘিরে বৃত্তাকারে পাক খাচ্ছে। এমনই একটা অবস্থার মধ্যে আমি দোতলার সিঁড়ি ভেঙে মানু পিসীর ঘরের দরজায় টোকা দিলাম। রাত তখন প্রায় দশটা।

দরজায় টোকা দিচ্ছি, টোকা দিচ্ছি, খোলেনা— শেষে ধাক্কা দিতেই দড়াম করে দরজাটা খুলে গেল।

মানুপিসী খাটেতে হুড়মুড় করে উঠে বসল, আর্তস্বরে ককিয়ে উঠল, কে? কে? আমি ছুটে গেলাম, মানুপিসীর হাত চেপে ধরে বললাম, পিসী, আমি স্বদেশ।

পিসী আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল, বলল, তুই ভয় পেয়েছিস? আমি উত্তর দিলাম না।

পিসীই বলল, একবার প্রেসে যা— প্রেস মানে জয়কালিমাতা প্রেস, একবার মালিকের সঙ্গে কথা বল, জমি জিরেতের ব্যাপার তো, বরদা ভবনে তুই থাকলে আমিও আছি। মালিকের সঙ্গে কথা বল। মালিক মানে বটকৃষ্ণ নস্কর।

পিসীর বুকের মধ্যে আমি হারিয়ে যাওয়া শৈশবের কৈশোরের গন্ধ পেলাম, মালতির গন্ধের একটা ফিকে সুবাস পেলাম।

আমি বললাম, মালতির কোনো খবর পেলে আমাকে জানিও পিসী।

জয়কালিমাতা প্রেসে বটকৃষ্ণ নস্করের সঙ্গে দেখা করার আমার দুটো উদ্দেশ্য ছিল। এক, হনুমানদাস বন্ধ হওয়ার পর বেশ কিছুদিন আমার বাবা গণনাথের অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা তুলিনি কিছু টাকা চাওয়া, অন্ততঃ একশো চুয়াল্লিশের প্রয়োজনে। দুই, সিভিল সুটের ব্যাপারে সুন্দরবন লাট এলাকায় জোতদার হিসেবে তাঁর যদি কোনো পরামর্শ থাকে বরদা ভবনের ব্যাপারে, আমার দখলীসত্বের দেড়খানা ঘরের ব্যাপারে যদি কোনো চেনাজানা উকিল মোক্তার থাকে বটকৃষ্ণর। আমৃত্যু মামলা চালানো সহজ কথা নয়।

আমহার্স্ট স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট এলাকার এলোমেলো গলিতে পাক খেতে খেতে, তখনতো কিছুই করার নেই, রাস্তায় রাস্তায় কত পাক খেয়েছি, জয়কালিমাতা প্রেসের দরজায় পৌঁছে দেখি—দরজা তালা বন্ধ সিল করা। বন্ধ দরজার একপাশে রাস্তার ওপর চাটাই পেতে ওপরে দড়ি দিয়ে টেনে দেওয়া ত্রিপল, জনা সাত আষ্টেক সম্ভবতঃ অবস্থানে অথবা অনশনে—ধর্মঘট। পাঁচদফা দাবি সম্বলিত পোস্টার, ফেস্টুন—লাল পতাকা।

দুতিনটি চেনামুখ ত্রিপলের নীচে—লাল পতাকার এমন সমারোহ আগে দেখিনি জয়কালিমাতার সামনে। অচেনা একজন ভাষণ দিচ্ছিলেন, বলছিলেন, মালিক ন্যূনতম বোনাস দেয়নি, চক্রান্ত করে প্রেসের ক্রেডল মেশিন থেকে শুরু করে নিজস্ব বাড়ি এমনকি গুডউইল পর্যন্ত বেচে দিয়েছে। চলবে না চলবে না ধ্বনির মধ্যে বসন্ত, এর কাছ থেকেই আমি গণনাথের হিসেবে মাইনের আগাম টাকা নিতাম, বেরিয়ে এলেন, বললেন, টাকার জন্য এসেছেন, বাবু তো প্রেসে তালা লাগিয়ে হাওয়া। আজ সাতদিন হল আমরা বসে আছি প্রেসের দরজায় তালা মেরে।

আমি বললাম, আমার একটু অন্য দরকার ছিল। বটকৃষ্ণ বাবুকে কোথায় পাব বলতে পারেন?

সেই ছেলেদুটো এল সেদিন সন্ধ্যায়, বলল, কেন মিছিমিছি কোর্ট কাছারি, থানা-পুলিশ করছেন। যেদিন বলবেন, টাকাটা দিয়ে যাব। পাবেন তো হাজার দশেক টাকা, তার মধ্যে দুহাজার যাবে কমিশনে, পাড়ার ক্লাবের চাঁদা হাজার টাকা।

আমি মরিয়ার মত বললাম, আমি তো বেচিনি, তাহলে টাকা নেব কেন? কে কিনল, কে বেচল কিছুই জানলাম না। আর আমার দেড়খানা ঘর বিক্রি হয়ে গেল? দুজনের একজন আমার সামনে পা ফাঁক করে দাঁড়াল। তারপর বলল, তোর বাপ বেচেছে রে শালা, সাতদিনের মধ্যে যদি বাড়ি খালি না করিস তো এমন হুড়ো দেব।

ফ্যাক্টরিতে লক আউটের পর প্রথম দু-চারদিন যাতায়াত করেছি। বাড়ি নিয়ে ঝামেলায় পড়ে প্রায় মাসখানেক যাওয়া হয়নি ওদিকে। লক আউটের পর অবিনাশদার সঙ্গে যোগাযোগই রাখিনি প্রায়।

ফ্যাক্টরির গেটের সামনে সেদিন ছোটোখাটো একটা জমায়েত। অবিনাশদা বলল, তোমার তো পাত্তাই পাওয়া যায় না। কতদিন পরে এলে বলতো। এরকম করলে, কারখানা খুলবে? আন্দোলন ছাড়া কোনো কাজ হয়?

রামদাস হনুমানদাস ফাউন্ড্রি নাকি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। দুজন এন. আর. আই ইতিমধ্যে কারখানা দেখে গেছে। তারা নতুন যন্ত্রপাতি বসাবে, নতুন টেকনোলজি আনবে, উৎপাদন বাড়বে, কিন্তু বলছে, অন্তত, তিরিশজনকে ছাঁটাই করতে হবে। আজকের মিটিংয়ে আমরা এর বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

শ দেড়েক লোকের জমায়েত। আমাদের কারখানার কিছু চেনামুখ রয়েছে, অধিকাংশই স্থানীয় লোকজন। অবিনাশদা বলল, যাই হোক ভালো দিনে এসে পড়েছিস, ভবেশদা ভাষণ দেবে আজকে গ্যাট চুক্তি, ডাংকেল ড্রাফট নিয়ে বলবে।

আমি বললাম, তার সঙ্গে রামদাস হনুমানদাস ফাউন্ড্রির সম্পর্ক কী?

অবিনাশদা বলল, ইডিয়েট, সেজন্যই তো বলছি ভবেশদার ভাষণ পর্যন্ত থেকে যাও। সম্পর্ক আছে গ্যাট, ডাংকেল এসবের সঙ্গে প্রতিটি শ্রমিকের সম্পর্ক জড়িয়ে আছে।

আমি বললাম, বরদা ভবন নিয়ে যে অবস্থায় আছি, করুণভাবে বললাম, অবিনাশদা ওরা আমাকে বের করে দিলে দাঁড়াব কোথায়?

অবিনাশদা বলল, এইজন্যেই আমাদের কিছু হল না, এত সংগ্রাম বিমুখ হলে চলে? চা খাও, সিগারেট খাও, উকিলের ঠিকানা তো দিয়েই দিলাম, থানায় একটা ডায়েরি করে দাও। গ্যাটের সঙ্গে দেশের কোটি কোটি মানুষের স্বার্থ জড়িয়ে আছে, তুমি শুধু তোমার নিজের স্বার্থটুকুই দেখছ, সেম সেম স্বদেশ, তোমার মত ছেলে যদি এই করে, তা হলে দেশের অশিক্ষিত মজদুররা কাদের ভরসায় লড়াই করবে?

আমি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম। সেভাবে ইউনিয়নের সঙ্গে আমার গভীর কোনো সম্পর্ক নেই। চাঁদা দিই, সভাসমিতি মিছিলটিছিলে যেতে বললে যাই, সমবেত স্লোগানে গলা মেলাই। রামদাস হনুমানদাস ফাউন্ড্রি বিক্রি হয়ে গেলে, হয়ত আমার চাকরি থাকবে না, কিন্তু তিনপুরুষের বাস এই শহরে মাথা গোঁজার দেড়খানা ঘর চলে গেলে,

আমি দাঁড়াব কোথায়—আমি অবিনাশদাকে বলতে চাইলাম, বললাম না। ভাবলাম, মিটিং শেষ হলে বরং ভবেশদাকে বলি। নামী সাংসদ, যদি পুলিশ কোর্ট কাছারিতে কিছু সুরাহা হয়।

রামদাস হনুমানদাসে চাকরিটা অবিনাশদাই ঠিক করে দিয়েছিল। যদিও পনের বছরে পাঁচবার লক আউট হয়েছে, তবু আমার রুজি রোজগার বলতে তো ওই চাকরিই। বিদেশ অস্ট্রেলিয়ায়, এন. আর. আই—তার অনেক টাকা। আমার তো ওই সামান্য সম্বল নিয়েই স্বপ্ন দেখা, স্বপ্নে মালতিকে নিয়ে যে কটা সুখের মুহূর্ত গড়ে তুলেছিলাম, তার মূলধন তো এক অর্থে অবিনাশদাই জোগাড় করে দিয়েছে। আজকেও উকিলের ঠিকানা দিল। কৃতজ্ঞতাবশতঃ আমি ভবেশদার, আমাদের সংসদ সদস্যর ভাষণ শুনি, অবিনাশদার সঙ্গে থেকে যাই।

উজ্জ্বল না কি রাজস্থানে চাকরি নিয়ে চলে গেছে, মাইনে এখানকার ডাবল। ভাল ছেলে, কেরিয়ার আছে, এখানে পড়ে পড়ে মার খাবে কেন? আমিও একমত হলাম।

উজ্জ্বলই আমাকে প্রথম গ্যাট আর ডাংকেল রহস্য বুঝিয়েছিল। গ্যাট কথার অর্থ যে জেনারেল এগ্রিমেন্টস অন্ ট্যারিফ এন্ড ট্রেড, বহু দেশ যে সেই চুক্তিতে সই করেছে, আমাদের দেশও যে ঠেলায় পড়ে চুক্তিতে সই করতে বাধ্য হবে, উজ্জ্বল একদিন সন্ধ্যায় ক্যান্টিনে বসে আমাকে এসব কথা ব্যাখ্যা করেছিল।

পুরনো সঙ্গী সাথীদের পাল্লায় পড়ে, অনেকদিন পরে, আজ কারখানার কাছেই দিশী মদের *ঠেকে* গিয়েছিলাম। শরীর চাইছিল না। সাতমাস ভালো করে দুবেলা ভাত জুটছে না, পাড়ার মুদি দোকান ধার দেওয়া বন্ধ করেছে, ইলেকট্রিক লাইন কেটে দিয়ে গেছে কদিন আগে। আজ মিটিংয়ের পর দু চারজন একটু আশার আলো দেখতে শুরু করেছে। ভবেশদা, আমাদের সাংসদ নাকি দুজন এন. আর আইয়ের একজনের বাবাকে বিলক্ষণ চেনেন। আগে আলমবাজারে থাকত ওই এন. আর. আই। ওরাই তো রামদাস হনুমানদাস কিনবে বলছে। কিনতেও পারে, টাকা যখন আছে আর যদি কেনে তাহলে কারখানা আজ হোক, কাল হোক খুলবেই।

রামদাস হনুমানদাস ফাউন্ড্রির গেটের সামনে রামদাসের একটি আবক্ষ পাথরের মূর্তি আছে। আগে জায়গাটায় ফুলের টব থাকত, আলো থাকত। কারখানা বন্ধ, ফলে রামদাস অন্ধকারে আবদ্ধ একা। রাস্তার নিয়ন আলো থেকে রামদাসের মুখের একপাশে একটু আলো পড়ছে। পা টলছে, প্রায় খালি পেট—দিশী মদের সঙ্গে কয়েকটা আলুর চপ আর আদাকুচো খেয়েছি। চার পাঁচজনের দল ছেড়ে, আমি রামদাসের আবক্ষ মূর্তির দিকে এগিয়ে গেলাম, চীৎকার করে বললাম, গ্যাট হলে কী ফাউনড্রি খুলবে?

আবক্ষ রামদাস ভাবলেশহীন রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি বললাম, তুমি কৃতি পুরুষ, রাজস্থান থেকে লোটা কম্বল নিয়ে এসে দশ বছরের মধ্যে তুমি এই ফাউন্ড্রি তৈরি করেছিলে। ইউনিয়ন ফিউনিয়ন শালা কিসস্যু বোঝে না। তুমি বললে আমি মেনে নেব। গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করলাম গ্যাট না

হলে কী রামদাস হনুমানদাস খুলবে?

উত্তর পাওয়ার জন্য মাথা তুলে রামদাসের দিকে তাকাবার আগেই হড়হড় করে নাকমুখ দিয়ে বমি, তেতো বমি।

বাজার

ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ছটার সময় কমল পাকড়াশি ইউনিভার্সালে, আমার কেবিনে সস্ত্রীক চলে এলেন। স্টীল গ্রে রঙের সাফারি স্যুট, হাতে দামি সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার। দাড়ি গোঁফ কামানো, তকতকে মুখটা একটু ফুলোফুলো, বিশেষ করে চোখের কোলটা। চশমার ফাঁক দিয়েও চোখের কোলটা নজরে পড়ে। একে কী আমি কখনও দেখেছি? সল্টলেক থেকে ইনিই রাত বারোটায় সাদা মারুতিতে তুলে আমাকে ইউনিভার্সাল নার্সিংহোম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। ডাক্তার ভার্গবকে রাত একটায় বিছানা থেকে তুলে, আমাকে ভর্তির ব্যবস্থা করেছেন। ইউনিভার্সাল বলছে, ইনি আমার এজেন্ট, আমি নাকি কাগজপত্র সইসাবুদ করে আমার অর্গানগুলো নিয়ে দরদাম করার অথরিটি ওকেই দিয়েছি।

ওঁর স্ত্রী ললিতা পাকড়াশির হাতে বড়সড় একটা মিষ্টির বাক্স। কী চিনতে পারছেন না তো, তা কমদিন হল না তো, পনের বছর, তারও বেশি, মনে থাকা সম্ভব নয়। মিস্টার পাকড়াশি গোলাপের তোড়াটা সেন্টার টেবিলে রাখলেন, পকেট থেকে ব্যাগ বার করে নিজের নামলেখা সুন্দর একটা কার্ড এগিয়ে দিলেন কমল পাকড়াশি, কমিশন এজেন্ট, এক্সপোর্টার এন্ড ইমপোর্টার ভবতারিণী ট্রেডিং সেন্টার।

কি কিছু মনে করতে পারলেন? মিষ্টির বাক্সটা হাত বাড়িয়ে দিতে দিতে শ্রীমতী পাকড়াশি জিজ্ঞেস করলেন। মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, গায়ের রঙ ফর্সাই, মুখে চড়া মেক আপ, ঠোঁটে পাঁশুটে কালো রঙের লিপিস্টিক, শরীরের তুলনায় মাথাটা একটু ছোট। কাঁধ পর্যন্ত চুল, মিশকালো, মনে হয় রঙ করা, একটা বেশ দামী শাড়ি পরেছেন, একহাতে মোটা সোনার বালা, আরেকহাতে রিস্টওয়াচ, ব্যান্ডটা সোনারই বোধহয়।

আমি ভেবেছিলাম ভবতারিণী নামটা দেখেই আপনার মনে পড়বে। কমল পাকড়াশি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন।

ওর স্ত্রী বললেন, আমি কিন্তু অত রাতে শুধু গাড়ির হেডলাইটে একবার ওকে দেখামাত্র চিনেছি। নামটা মনে করতে পারছিলাম না। প্রথমে মনে হচ্ছিল সদানন্দ কিংবা

স্বাধীন, অ্যাডমিশনের সময় অবশ্য আপনি নামটা বলতে পেরেছিলেন। অ্যাড্রেস জিজ্ঞেস করার সময় কেমন যেন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। ললিতা পাকড়াশি আমার বেডে আমার পাশেই বসলেন। ওঁর গা থেকে খুব মিষ্টি একটা সেন্টের গন্ধ আসছে। আমার গায়ে সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, যা দুশ্চিন্তা ছিল, মাথাটা দুফাঁক হয়ে আছে। ঘাড়ে পিঠে, মাথার পেছনে চাপ চাপ রক্ত। আপনি যে বেঁচে উঠবেন, আমরা ভাবিনি।

ভবতারিণী, ভবতারিণী ট্রেডিং সেন্টার, আমি বিড়বিড় করছিলাম। ভবতারিণী নামটা যেন আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেরাল। পনের বছরের ফেলে আসা ইতিহাসে, বরদা ভবন থেকে বসিরহাট বাগানবাড়ি, রামদাস হনুমানদাস ফ্যাক্টরি থেকে ক্যানিং পর্যন্ত আঁতিপাতি আমি একটা রঙচটা সাইনবোর্ড, গলির ভেতরে একটা স্যাঁতসেতে দোতলা বাড়ির দোতলার তিনটে অন্ধকার ঘর খুঁজে বেড়াতে থাকি। মাথার মধ্যে যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। খুব বেশি উথাল পাতাল হলে, এখনই বটের আঠার মত রস গড়াতে থাকবে কানের পাশ দিয়ে। অন্ধকার হাতড়াতে হাতড়াতে আমার মুখ যন্ত্রণায় বেঁকে যাচ্ছে, ঠোঁট কাঁপছে দেখে, কমল পাকড়াশি সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন আপনার কষ্ট হচ্ছে?

শ্রীমতী পাকড়াশি সুইচ বোর্ডের নির্দিষ্ট বোতাম টিপলেন, কাঁচের জগ থেকে একগ্লাস জল এগিয়ে দিলেন, তাড়াহুড়োর কিছু নেই, আপনি টেনসড্ হবেন না। এখনও তো সময় আছে, আমরা দুচারদিন পরেই না হয় আসব। প্লীজ আপনি টেনসড্ হবেন না।

ইউনিভার্সালের বয়স্কা সিসটার প্রায় দৌড়োতে দৌড়োতে এলেন, আমাকে একটা ঘুমের ইনজেকশন দিলেন বোধহয়। বালিশে মাথা রেখে আমি চোখ বুজলাম। আমার এজেন্ট সস্ত্রীক বেরিয়ে গেলেন বোধহয়। বয়স্ক সিসটার, সোনালি ফ্রেমের আড়ালে ওর নরম চোখ আমার চোখে রাখলেন, বললেন, ঘুমোন, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, এখনই ঘুম এসে যাবে।

ঘুম আসছে না, ঘুম আসছে না, চোখের ভেতর জ্বালা করছে, চোখের পাতা ভারি হয়ে নেমে আসছে, সমস্ত শরীরে ঘুমের ওষুধের আচ্ছন্নতা, তবু ঘুম আসছে না। একটা ঘুণপোকা, ভবতারিণী, ভবতারিণী, মগজের অনেক ভেতরে কুরে কুরে খাচ্ছে, কানের পাশ ভিজিয়ে সিপসিপ করে রস গড়িয়ে পড়ছে, ঘুম আসছে না। ঘরে পুরো স্পীডে পাখা ঘুরছে, এয়ারকুলার মেশিনটাও চলছে, তবুও দম আটকে আসছে, একটু খোলা হাওয়ার জন্য বুকটা হাঁসফাঁস করছে।

ভবতারিণী নার্সিংহোমের অফিস ঘর, ঘণ্টা দুয়েক আগে মালতির অ্যাবরশন করা হয়েছে। সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বার গর্ভপাত, প্রাণের ঝুঁকি ছিল মশাই, তবু ঝুঁকিটা নিলাম। বিজনেসে রিসক থাকে। টেবিলের উলটো দিকের লোকটার কাঁচা পাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি মোটা ফ্রেমের চশমা, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, পরনে হাফ পাঞ্জাবি মত একটা ফতুয়া, পায়জামা। ঘরের ভেতরের ভ্যাপসা গরমে ফতুয়ার বোতাম খুলে দিয়েছেন। টেবিলে

একটা কমদামি হুইস্কির বোতল, ঘণ্টা দুয়েকে বোতলটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। উনি বললেন, আরেকটু দিই। আমি গ্লাস সরিয়ে নিলাম। রাত এগারোটা, বিডন স্ট্রিটের গায়ের এই গলিটা থেকে গোঁসাইপাড়া বাই লেনে বরদা ভবনে হয়ত পায়ে হেঁটেই ফিরতে হবে। ভদ্রলোকের বেশ নেশা হয়েছে, চোখ লাল, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। বললেন, সেলিব্রেট করলেন, দুঘণ্টা ধরে মাল খেলেন, আর বাচ্চার মুখ না দেখেই চলে যাবেন? বলতে বলতেই সাদা এ্যাপ্রন পরা গোলগাল মোটাসোটা মহিলাটি ঢুকলেন। ভদ্রলোক বললেন, এসো বিশাখা, বয়ামটা এনেছ? ট্রের ওপর ভারি তোয়ালে চাপা দেওয়া একটা বয়াম। ট্রে-টা টেবিলে রেখে বিশাখা তোয়ালেটা সরিয়ে নিল। প্রায় হাতখানেক সাইজের একটা পুরু কাঁচের বয়াম, মুখটা মোটা রবারের ঢাকনি দিয়ে সাঁটা, ভেতরে কোনো তরল রাসায়নিক। তার মধ্যে একটা কাঁচের লম্বা স্লাইডে বাঁধা, লালচে গোলাপি একটা ভ্রূণ। আমার আর মালতির ভালোবাসার ফসল।

আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল, পেটের মধ্যে থেকে পাক দিয়ে হুইস্কি উঠে আসতে চাইছিল। বুঝতে পেরেই বোধহয় বিশাখা তোয়ালে চাপা দিয়ে জারটা সুদ্ধ ট্রে-টা সরিয়ে নিয়ে গেলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, পেশেন্টের সঙ্গে আজ আর দেখা করার দরকার নেই। টাকাটা চাইলে নিয়ে নিতে পারেন, রেডি আছে।

ক্যানিং থেকে ফিরে আসার পরই মানুপিসী বলল, কী কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছ স্বদেশ। মান ইজ্জত সব গেল। ছেলেটাও কিছু দেখে না শোনে না সে থাকলে তোমার মাথা নামিয়ে দিত। মানুপিসীর কথায় কিনা জানি না, বরানগর পালিত পাড়া পর্যন্ত আমি নিজেকে শ্রেণীশত্রুই ভাবতে শুরু করেছিলাম।

মালতিকে শুকনো মুখে জিজ্ঞেস করলাম, এখন কী করব মালতি, আমার হাতে টাকা পয়সা কিছুই নেই। বরানগরে ওর মাসীকেই বললাম, মালতিকে বুঝিয়ে বলুন আমি যে কোনো দিন বিয়ে করতে রাজি আছি। বাবা রাজী না হলে রেজিস্ট্রী করেই।

মালতির তখন হৃদয়ের গান ছবির কাজটা চলছে। প্রযোজকের কিছু অসুবিধের জন্যে সুটিং তিনমাস পিছিয়ে গেছে। মালতির চোখমুখ বসে গেছে, শরীর ভারি হয়ে গেছে, বলল ভাগ্যিস দুমাস ছবিটার কাজ বন্ধ হয়ে আছে। এ ছবিটাতে বাদ গেলে, আমি পাগল হয়ে যেতাম। মালতির মাসতুতো দাদা বলল স্কাউন্ড্রেল,, মানুমাসীর আত্মীয় না হলে তোমাকে আমি জেলে দিতাম।

ঝাড়া দুঘণ্টা আলোচনার পরও মালতি গোঁ ধরে রইল, পেট থেকে বাচ্চাটাকে খসাতেই হবে। আর বিয়ে স্বদেশ চাটুজ্জেকে, তোমার নিজেরই খাবার ঠিক নেই, তারপর আমাকে খাওয়াবে। তোমাকে বিয়ে করে আমার কেরিয়ার নষ্ট করতে পারব না। এখানকার ছবির কাজটা মিটতে দাও, সব ঠিক করে রাখা আছে, আমি বম্বে চলে যাব। মালতি একদিন সত্যিই বম্বে চলে গেল, কাউকে কিছু না জানিয়ে। শুধু মানুপিসীকে একটা চিঠি দিয়েছিল, পৌঁছেছি—ভালো আছি, চেষ্টা করছি, কাজ পেয়ে যাব।

ভবতারিণী নার্সিংহোমের যোগাযোগটা কীভাবে হয়েছিল, মনে পড়ছে না। ঘরের

একটা কাঁচের জানালা খুলে দিলাম। এসি চলছে, চলুক, পাখাটাও ঘুরুক।

ভবতারিণী আমার শাশুড়ী, ওই যে ছবি দেখছেন দেয়ালে, ওঁর নামেই ট্রাস্ট, নার্সিং হোম। আমার স্ত্রী পাশ করা নার্স। সরকারি হাসপাতালে ছিল, ছেড়ে দিয়ে এসে বলতে পারেন সমাজসেবা করছেন। অবশ্য ব্যবস্থা খুব ভালো নয়, চ্যারিটেবল প্রসূতি সদন কি আর বেলভিউ নার্সিহোম হবে! ছটা বেড আছে, খালি থাকে না বিশেষ, আজ আছে। একজনই পেসেন্ট আছে, আমরা ভর্তি করে নিচ্ছি। চেক্ আপ করে বিশাখা বলছে সাত মাস, আপনি বলছেন পাঁচ মাস। আমাকে সাত মাসই লিখতে হবে। আমি অনারারি সেক্রেটারি। ট্রাস্টের সবকিছুই বিশাখা। ফর্মটা ফিল আপ করে দিন।

ফর্মে আমার নাম সদানন্দ, আর মালতি মালা সরকার। সেক্রেটারি বললেন, বিয়েটা করে ফেললেই তো হত। গার্জেনরা মানছে না, চাকরি বাকরি নেই। সমস্যা মশাই, সত্যিকারের সমস্যা।

আমার পকেটে এখন সামান্য শ দেড়েক টাকা। জয়কালিমাতা প্রেস থেকে বাবার নামে নিয়ে এসেছি। কৈফিয়ত দিতে হবে, বেশি চাইনি, গণনাথের মাইনে থেকে এডভান্স নেওয়া, যদি জিজ্ঞাসা করেন কী বলব? আমি শুকনো মুখে বললাম, খরচের ব্যাপারটা যদি একটু বলেন।

সেক্রেটারি ফ্রেঞ্চকাটে হাত বোলালেন, তা এত ম্যাচিওর স্টেজ, খরচা তো আছেই। পেশেন্টকে ব্লাড দিতে হলে তো কত লাগবে ঠিক নেই, হাজার দেড়েক টাকা ধরুন, বেড ভাড়া তো সামান্যই।

আমার মুখের দিকে তাকিয়েই বোধহয় আমার পকেটের খবব পেয়ে গেলেন সেক্রেটারি। মালতি একজোড়া বালা বেচে দিতে চেয়েছিল। আমিই বলেছিলাম, দরকার নেই, যা হোক করে যোগাড় হয়ে যাবে।

সেক্রেটারি সিগারেট ধরালেন, প্যাকেটটা এগিয়ে দিলেন। আপনি কীভাবে নেবেন জানি না, বাচ্চাটা তো নষ্টই করবেন, বেচে দিন না। আমার কাছে খদ্দের আছে। ভালো ডিল—খালাসকে খালাস, মালপানিও পেয়ে যাচ্ছেন। আয়নায় দাগ দেখলেও আমি বুঝতে পারছিলাম, আমার মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গিয়েছিল। বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস ধড়াস করে লাফাচ্ছে টের পাচ্ছিলাম। আর একটা ঠাণ্ডা ঘাম গলা থেকে বুক পিঠ বেয়ে জামা ভিজিয়ে নেমে যাচ্ছিল, সেক্রেটারি নির্বিকার।

আমি আপনাকে জোর করছি না, বাইরের অর্ডার, এক্সপোর্ট। খরচ খরচা তো কিছু লাগবেই না। উলটে আপনি হাজার তিনেক টাকা পেয়ে যাবেন, সেক্রেটারি মৃদু হাসছিলেন।

যে পেটে ধরেছে, তাকে তো একবার জিজ্ঞেস করতে হবে। আমি কাঁপতে কাঁপতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম।

বেশতো, সন্ধেতেই বলবেন। নটার সময় ডাক্তার টাইম দিয়েছেন। ডাক্তার সাঁতরা নাম করা গাইনি, আমি কোনো রিসক নিচ্ছি না।

পাগলের মত কলকাতার এ মাথা থেকে ও মাথা ঘুরে বেড়িয়েছি মালতি, ইউনিভার্সালে

খোলা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমার বালাজোড়া বেচলেও ডাক্তার সাঁতরার কী ফীজ উঠত না! আজকে স্বীকার করতে লজ্জা নেই, একবার বিষ খাবার কথাও মনে এসেছিল; নিজে খাব, অপারেশন টেবিলে তোলার আগে তোমাকেও খাওয়াব। কিছুই হল না। সন্ধেবেলায় ভবতারিণীতে ঘুপচি অফিস ঘরে বসে আমি চুক্তিপত্রে সই করে দিলাম। সস্তা হুইস্কি দিয়ে সওদাটা সেলিব্রেট করলাম।

বয়ামে তরল আরকে সাত মাসের প্রায় পরিপূর্ণ একটা শিশুকে ওরা কেন দেখিয়েছিল মালতি? আমার স্বপ্নে সমুদ্রের ঢেউয়ের দোলায় দোলায় বয়ামটা কেবল ভেসে আসে। ভারি রবারের ঢাকনা দেওয়া, তবু গত পনের বছর আমি এক মানবশিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রথম চীৎকার শোনবার জন্য কান পেতে থেকেছি আর কেবলই মনে হয়েছে শিশুটা হাত পা ছুঁড়ছে যন্ত্রণায় নীল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কাঁদতে পারছে না, এক তরল আরকে আমি তাকে ধীরে ধীরে ডুবিয়ে দিচ্ছি।

বিশাখা পাকড়াশি টাকাটা দিতে এলে আমি বলেছিলাম, কাল বিকেলেই তো রিলিজ হয়ে যাচ্ছে, পেশেন্টকেই দেবেন, সেই তো পাঁচ মাস না সাত মাস পেটে ধরেছে। সেই বর্ষণমুখর রাত্রি আমাদের প্রথম সন্তানের জন্মের ঠিক পাঁচ মাস তিনদিন আগেকার এক রাত্রি। ক্যালেন্ডারে তোমারই লিপস্টিক দিয়ে আমি একটা লাল দাগ রেখে দিয়েছিলাম। অলস দুপুরে বিনিদ্র রাত্রিতে আমি ওটাকে লাল অনুরাগের রাত্রি ভাবতাম। ইউনিভার্সালের জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললাম, রেড লেটার ডে নাকি নাইট বলবে মালতি?

টাকাটা আমিই নিয়েছিলাম। তিন হাজার চারশো তেষট্টি টাকা, খরচ খরচা বাদ দিয়ে এটাই আপনার পাওনা। ভবতারিণী একটা বিলও দিয়েছিল।

মালতি আর বরদা ভবনে ফেরেনি। বরানগরে আমি তিনদিন ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম. টাকাটাও নিয়ে গিয়েছিলাম, যদি কোনো ছুতো করে টাকাটা দিয়ে দেওয়া যায়। মালতির সঙ্গে দেখা হল না। টাকাটা থাকতে থাকতে কবে যে খরচ হয়ে গেল, মালতি কাউকে কিছু না জানিয়ে বোম্বে চলে গেল।

ফ্রেঞ্চকাট দাড়িটা সরিয়ে দিয়ে, দাড়িগোঁফ কামানো একটা তকতকে মুখ বানিয়ে নিলে আর ফতুয়া পাজামার বদলে একটা সাফারি স্যুট পরিয়ে দিলেই আমার এজেন্ট কমল পাকড়াশির সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রটা খোলসা হয়ে যায়। বিশাখাই এখন ললিতা পাকড়াশি, কমল পাকড়াশি যখন ভবতারিণীর সেক্রেটারি ছিল তার কী নাম ছিল? অমল, বিমল নাকি কমল পাকড়াশি।

দুদিন পরেই কমল পাকড়াশি এল একা। বলল—সেদিন তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। যা অবস্থা হয়েছিল, বাঁচানো যাবে কিনা তাইই সন্দেহ ছিল। একে বলে দৈবযোগ। পনের বছর আগে যে লোকটা নিজের সাত মাসের বাচ্চা বেচে দিল, ভাবছিলাম সে লোকটা এতদিন বাদে নিজের অর্গান, ওই কিডনিটিডনি বেচবে তো। আমি তখনও আপনার এজেন্ট ছিলাম ভবতারিণীতে, ইউনিভার্সালেও পনের বছর বাদে আমিই আপনার অথরাইজড এজেন্ট।

বটকৃষ্ণ নস্করের সঙ্গে হাতিবাগান বাজারে আমার দেখা হয়ে যাবে আচম্বিতে, ভাবিনি। বটকৃষ্ণ বাধা দেওয়ার আগেই আমি তাঁর পা ছুলাম, বললাম, আপনি এখানে? আমি ভীষণ খুঁজছি আপনাকে।

বটকৃষ্ণ বললেন, তিনি ক্যানিং চলে যাবেন, প্রেস বেচে দেবেন ঠিক করেছেন। একটা কথা বলা তোতা খুঁজছেন তিনি, তোতা বলবে, রাধেকৃষ্ণ, রাধেকৃষ্ণ।

আমি বটকৃষ্ণ নস্করকে বরদা ভবনের সমস্যার কথা বললাম। রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তিনি আমার কথা শুনলেন, বেশ মনোযোগ দিয়েই শুনছেন মনে হল। তারপর বললেন, জমি জিরেতের ব্যাপর—সহজে মেটে না, তারপর যদি প্রোমোটারের খপ্পরে পড়ে থাকে তবে তো দফা শেষ। তবু তুমি একবার এস, দেখি কী করা যায়? জানোতো আমি প্রেসের ওপর তলার ঘরে এখন থাকি না। প্রেসে তালা পড়ার পর আমি বৌবাজারের আদর্শ হোটেলে চলে গেছি। ওটাই আমার পুরনো জায়গা, দোতলার একটা ঘর নিয়ে থাকি। চলে এস, একদিন সন্ধেয়।

আমি বললাম, বাবার কোনো খবর পেলেন? আমি তো অনেকদিন কোনো খবর পাই না। কিছু টাকার দরকার ছিল।

বটকৃষ্ণ একটু উদাস হয়ে গেলেন, বললেন গণনাথ বৃন্দাবনে আমার গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নিয়েছে, আমার মেয়ে প্রতিমাও দীক্ষা নিয়েছে। ওরা বৃন্দাবনে আছে, ভালই আছে। তুমি আদর্শ হোটেলে এস, আমি আশ্রমের ঠিকানাটা দিয়ে দেব। আমিও এদিককার পাট চুকিয়ে বৃন্দাবনে চলে যাব।

বটকৃষ্ণ তার হাফসার্টের পকেট থেকে দেড়শোটা টাকা বের করে বললেন, আপাততঃ চালিয়ে নাও, তারপর দেখছি কতদূর কী করা যায়—জমি জিরেতের মামলা, লড়তে গেলে অনেক টাকা দরকার।

মানুপিসীকে বটকৃষ্ণের কথা বললাম। মামলা মোকদ্দমা হলে উনি খানিকটা সাহায্য করবেন বলেছেন, সেটাও বললাম। মানুপিসী বলল, আহা বড় ভাল মানুষরে সদা, আর ভাল মানুষের কপালেই যত দুঃখকষ্ট।

আমি বললাম দুঃখ কীসের? সুন্দরবনের লাট এলাকায় হাজার বিঘের মত জমি আছে, মাছের ভেড়ি আছে, শহরে একটা প্রেস আছে—দুঃখ কিসের?

ওমা, এত কথা বললেন, তোকে টাকা দিলেন—ওঁর সেই পাগলী বৌ সম্বন্ধে কিছু বলেননি!

আমি বললাম, না সেরকম কিছু বলেছেন বলে তো মনে পড়ছে না, তাছাড়া আমিও জিজ্ঞেস করিনি।

সে তো মানকুনডুর পাগলা গারদের তিনতলা থেকে ঝাঁপ দিয়েছে। শিবুর এক বন্ধু তো ওই প্রেসের বই বাঁধায়, সেইই বলল—কাগজেও নাকি বেরিয়েছিল।

ইউনিভার্সালের এই বেডে শুয়ে আমার মনে হল, হয়ত এই ঘটনার পরই বটকৃষ্ণ নস্কর প্রেস বেচে দেওয়ার কথা ভাবেন, কলকাতার পাট তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বটকৃষ্ণ সেদিন কেমন যেন অন্যমনস্ক ছিলেন টাকা কটা দেওয়ার সময় তাঁর হাত কাঁপছিল। ভালো করে তখন লক্ষ্য করিনি, এখন হাতিবাগান বাজারের একধারে অসহায় দাঁড়িয়ে থাকা বটকৃষ্ণ নস্করের উস্কোখুস্কো চুল, খোঁচাখোঁচা দাড়ি ভারি চশমার আড়ালে ঘোলাটে চোখের মনি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম। বটকৃষ্ণ বললেন একটা ভালো তোতা খুঁজছি, খাঁচাটা কেনা হয়ে গেছে, তোতাটা বলবে রাধেকৃষ্ণ, রাধেকৃষ্ণ!

পরিচিত চুল্লুর ঠেকে কেন যে গিয়েছিলাম সেদিন। একটু বেশি পরিমাণে মদ গলায় পড়লে সীতাপতির জ্ঞান থাকে না। উত্তেজিত হয়ে বলল, যত নষ্টের গোড়া তোর বাপ।

সীতাপতির গ্রামসম্পর্কের এক মামা হরেন না নরেন বটকৃষ্ণর দূর সম্পর্কের কীরকম যেন আত্মীয় হয় সীতাপতি। তোমার বাপই তো গণনাথ চাটুজ্জে? বটকৃষ্ণের প্রেসে কাজ করত, লাটে যেত ধানের ভাগ আদায়ে?

আমি বললাম, হ্যাঁ—তুমি তো জানোই, তোমাকে বলেছি। মিছিমিছি আমার বাপকে নিয়ে টানাটানি করছ কেন?

করছি কী আর সাধে? কদিন আগে শুনলাম, তীর্থ দর্শন করতে বটকৃষ্ণর মেয়ে লতিকা না যূথিকা—

আমি বললাম, প্রতিমা।

ওই হল, প্রতিমা আর গণনাথ তোমার বাবা তীর্থ দর্শন করতে বেরিয়ে শেষ পর্যন্ত বৃন্দাবনে গিয়ে বোষ্টম হয়ে কণ্ঠি বদল করেছে।

আমি বললাম, একদম বাজে কথা। এরকম হলে আমি জানতে পারতাম না? এই তো সেদিন বটকৃষ্ণ বাবুর সঙ্গে দেখা হল, কিছু বললেন না তো।

এরপর দেখা হলে জিজ্ঞেস করো। বোতলের তলনিটুকু গলায় ঢেলে সীতাপতি বলল, রামদাস হনুমানদাস কবে খুলবে তা তো ভগবান ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না। আমি হাওড়ার একটা ঢালাই করাখানাতে বদলির কাজে ঢুকেছি।

আমার সামনে এগিয়ে দেওয়া গেলাসটা কোনোমতে খালি করে বললাম, আমার জন্য কোথাও কিছু পেলে জানিও, বরদাভবনের ঠিকানাটা মনে আছে তো—তোমার অ্যাসিসট্যান্টদের সবাই আমার বাড়ি চেনে।

মাথার ফাটা জায়গার ওপর দিয়ে সেলাই হয়েছে। উত্তর দক্ষিণ গোলার্দ্ধে ভাগ হয়ে যাওয়া আমার মাথা জুড়ে দিয়েছে ডাক্তাররা। মাঝবয়সী, চোখে চশমা, ভারি চেহারার নার্স বলেছে আর কদিন বাদে আপনি সেলাইয়ের জোড়টাও খুঁজে পাবেন না।

সেলাইটা শুকোচ্ছে জোরের দাগটা বড় চুলকোতে ইচ্ছে করছে, উনি বললেন, আপনি চোখ বুঁজে ঘুমোবার চেষ্টা করুন, আমি আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

বটকৃষ্ণর গলায় একটা তুলসীর মালা বরাবর দেখেছি। এখন সহসা বাবাকে দেখলাম, নেড়া মাথা কপালে তিলক, গলায় কণ্ঠি। প্রতিমা চুড়ো করে চুল বেঁধেছে, কপালেও তিলকসেবা করেছে, হাতে খঞ্জনি, গলায় তুলসীকাঠির মালা। বাবা বললেন, রাধেকৃষ্ণ, প্রতিমা বলল রাধেকৃষ্ণ। হীরের আংটিটা তুমি কী আর খুঁজে পাবে গোঁসাই?

ডাক্তার ভার্গবকে বললাম, সেলাইটা শুকিয়ে আসছে বলে একটু চুলকোচ্ছে। উনি বললেন, নার্সকে বলা আছে নিওস্পোরিন অয়েনটমেন্ট দিয়ে সেলাইটা মাঝে মাঝে ঢেকে দেবে—ঘাও শুকোবে, চুলকানিও কমবে।

আমি বললাম, কিন্তু আমার মাথার ভেতরে থেকে থেকেই দবদব করছে, মনে হচ্ছে সেলাই ছিঁড়ে ছিঁড়ে কিছু একটা বেরিয়ে আসবে, সেটার কী করা যাবে ভেতর থেকে যে চাপ আসছে মনে হচ্ছে কানের পর্দা ফেটে যাবে। আমার মগজের খানিকটা নাকি গলে বেরিয়ে গেছে, কানের পাশ দিয়ে দিনের পর দিন বটের আঠার মত সেটা গড়িয়ে পড়েছে, আপনি বলছিলেন পুঁজ, পাস— আমার মনে হয় ঘিলু। দুফাঁক হয়ে যাওয়ায় আমার মাথায় বাতাস ঢুকে গেছে, অথবা আকাশ, ওটা মাথার মধ্যে থেকে গেলে আমার কী হবে? হয়ত আমি পাগল হয়ে যাব।

ডাক্তার ভার্গব এসেছিলেন দুপুরের রাউন্ডে। সেদিনই সন্ধ্যায় ওরা আমার দুহাতে দুটো ইনজেকসন দিলেন, বললেন—এমন হয়, যে ইমব্যালানসটা আছে, কেটে যাবে। মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, আপনি ক্রমশঃ স্থির হবেন। মাথার ভেতরের আকাশ বা বাতাসও আশা করছি বেরিয়ে যাবে।

কতক্ষণ ঘোরের মধ্যে ছিলাম, জানি না। হঠাৎ মনে হল নীল আলোটা দুলতে শুরু করেছে, পর্দাগুলো দুলছে, ঘরের কাঁচের সার্সিগুলো এক এক করে খুলে যাচ্ছে, শরতের একটা ঝিরঝিরে হাওয়া ঘরময় শিউলি ফুলের গন্ধ বয়ে নিয়ে এল। আমি ঘুমের মধ্যে শিউলির গন্ধের জন্য বুকভরা শ্বাস নিতে চাইছিলাম, খুকখুক কাশির শব্দ শুনে আমি চোখ খুললাম—বরদা। অয়েল পেন্টিংয়ে তাঁর ধূসর ছবি দেখেছি—আশ্চর্য ছবির সেই ধূসরতা তার অবয়বে লেগে আছে যেন—বললেন, বড় কষ্ট, বড় কষ্ট। যেন মোমের আঙুল বরদা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। বললেন হীরের আংটিটা নীলাম হবে, চল বাজারে যাই।

মানুপিসী তখন তার সম্পর্কিত বোনের বাড়ি বরানগর পালিত পাড়ায়। পরিচিত পোস্টম্যান একটা ভারি পার্শেল নিয়ে এল বলল, উনি তো নেই, আপনারই তো পিসী, পার্শেলটা নিন, সই করে দিন।

বোম্বের ঠিকানা থেকে আসছে দেখেই কৌতূহলী হয়ে পার্সেলটা খুললাম। একটা সাদা লম্বা খামের মধ্যে থেকে একগোছা ছবি মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল—বেশির ভাগই পোস্ট কার্ড সাইজের, কয়েকখানা আরেকটু বড়—মালতির বিচিত্র পোশাকের, নানা ভঙ্গির ছবি। ব্যাংক অব মহারাষ্ট্রর একটা পাশবই, জমার ঘরে দু'শো পঁয়ত্রিশ টাকা, একটা চেকবই, তিনটে পাতা অবশিষ্ট—আর একটা চিঠি, হিন্দিতে লেখা, চিঠি পাশবই, চেকবই আমি দরকার হলে বরানগর পালিত পাড়ায় গিয়ে মানুপিসীর হাতে দেব, কিন্তু ছবিগুলো? এ কোন্ মালতি?

স্যুইমিং কস্টিউমে মালতি। প্রায় অর্ধনগ্ন অবস্থায় একটা উজ্জ্বল হলুদ তোয়ালেয় আধখানা বুক ঢাকা মালতি। হাঁটুর অনেকটা ওপরে শেষ, স্কার্টের সীমানা—কোমড় নিম্ননাভি উন্মুক্ত, বুকের প্রায় তিন চতুর্থাংশ উদোম, এ কোন্ মালতি?

বর্ষণমুখর সেই রাত্রিতে থানের মত সাদা ধুতি পরনে, মালতি বলল, আমাকে কী বিধবার মত লাগছে? আমি বললাম, জীবনে এই প্রথম আমি আস্ত মালতিকে দেখছি, বাসনা আমার জিভকে ভারি করে রেখেছিল, আলোটা জ্বালি—চল্লিশ পাওয়ারের আলোতে আমি গোটা মালতিকে দেখি। মালতি ককিয়ে উঠে আমারই হাত টেনে ভারি বুকে চাপা দিয়েছিল, তখনই উপলব্ধি করেছিলাম, একটা জরুল, একটু অসমতল দুই বুকের মাঝে।

মালতির একটা ছবিতে আমি কৈশোরের সেই স্বপ্নসুন্দরীকে সহসা খুঁজে পেলাম। একটা কাউন্টি ক্যাপ উরুসন্ধিতে, তিনি সী বীচে, অদূরে লবণাম্বুরেখা, বুকে ব্রেসিয়ারের সংক্ষিপ্তসার, নারীসঙ্গ নেই বহুদিন, এজমালি কলতলায় আমার পুরুষার্থ আমাকে টেনে নিয়ে গেল, টানটান স্বদেশ তখন উরুসন্ধির এক বর্গফুটের মধ্যে কাঁপছে, কাঁপছে কাঁপছে।

হঠাৎ তেঁতুলগাছটায় ভারি কিছু এসে বসল, নিশাচর পাখি, নাকি বরদাকান্ত?

বাজারের গেটে ঢোকার মুখেই বদ্যিনাথ, আমার ঠাকুরদা, বললেন জয়তারা এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও, চরৈবতি চরৈবতি— পিশাচসিদ্ধ বংশের পুরুষ তুমি, এগিয়ে যাও। প্রায় ধাক্কা দিয়ে মাংসের বাজারের আঁশটে ভারি গন্ধের মধ্যে আমাকে ঠেলে দিল ভৈরবী—এত গুটিয়ে আছিস কেন, এখন তো বাজারই সব, এগিয়ে যা, এগিয়ে যা। ভৈরবী অট্টহাসি হেসে বাজারের টিনের ছাদের ফাঁক দিয়ে সোঁ সোঁ হাওয়া হয়ে গেল।

হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরল পাকড়াশি— কমল পাকড়াশি। বেকার ঘুরে মরছেন বাজারে, আমাকে বলতে পারতেন, পনের বছর আগেও আমি আপনার এজেন্ট ছিলাম, এখনও তাই। মালতিকে খুঁজছেন তো, আসুন এদিকে আসুন।

একজন কাফ্রি, মিশকালো গায়ের রঙ, ঝকঝকে সাদা দাঁত, পুরু ঠোঁট— মাথায় টুপি, গায়ে ফতুয়া, ঢোলা পায়জামা হাঁটছেন, আইয়ে আইয়ে—রাতকি রাণী, চৌধবী কি চাঁদ, পর্দা তুলে লোক ঢুকছে, যেন সার্কাসের তাঁবু। আমি বললাম, বড় আঁশ গন্ধ পাকড়াশি।

পাকড়াশি বলল, তবু একবার দেখে নিন। মালতি এর মধ্যেই আছে, আস্ত নয় টুকরো টুকরো, মাংসের দোকানে হুকে ঝোলানো থাকে দেখেননি? রাঙ, পাঁজরা, মেটে, গুরদা! মানুষের। মালতি এই কিছুক্ষণ আগে বিক্রি হয়ে গেল। আরও গোটা তিনেক মেয়ে মানুষের সঙ্গে। ধূসর পর্দাটা দেখছেন তো সামনে, ওরা একের পর এক পর্দার আড়ালে ঢুকে যাচ্ছে, ডিসেকসন টেবিলে পা চিতিয়ে শুয়ে পড়ছে। টুকরো টুকরো হয়ে বেরিয়ে আসছে। মাছের বাজারের মত চীৎকারে কান ফেটে যাচ্ছে। ঘরের মধ্যেকার গুমোটে আমার শ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে। আমি কমল পাকড়াশিকে বললাম, বড় কষ্ট হচ্ছে দম নিতে—বাইরে বেরোবার দরজাটা কোন দিকে। কমল পাকড়াশি আমাকে ভীড়ের মধ্যে থেকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে এল, বলল একটু এগিয়ে গেলেই একটা সুড়ঙ্গের মুখ দেখতে পাবেন—বহুদূর বিস্তৃত একটা টানেল। ঠাণ্ডা কনকনে। সুড়ঙ্গের মুখে মোমবাতি আছে, দেশলাই আছে, মোমবাতি জ্বালিয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে নেমে পড়ুন, তারপর এগোতে থাকুন, এগোতে থাকুন। ডাইনে বাঁয়ে আরও অজস্র সুড়ঙ্গ পাবেন, তাকাবেন না—মোমের আলোয় নাক বরাবর সোজা হাঁটবেন। একসময় হয়ত আপনি দেখবেন, বহুদূরে একটা নীল আলো জ্বলছে, ওই নীল আলোর চৌহদ্দি পার হতে হতেই আপনি বাতাস পেয়ে যাবেন—গড়ের মাঠের খোলা বাতাস, শরতের শিউলির গন্ধ।

ইউনিভার্সালে আমার ঘরে একটা হালকা নীল বাতি জ্বলছে, খোলা জানালা দিয়ে ছতলায় গড়ের হাওয়া আসছে, নিবিষ্ট শ্বাস নিলে শিউলির গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে যেন।

হিন্দী চিঠি যেটা বোম্বে থেকে এসেছিল, আমি সরযূ প্রসাদের কাছে নিয়ে গেলাম, কাশিপুর হিন্দী হাইস্কুলে হিন্দি পড়ান তিনি। চিঠি পড়ে সরযূ প্রসাদ বললেন— কোনো এক সবিতা সম্বন্ধে লিখেছে, বোম্বে থেকে বেশ কিছুদূরে ঘাটকোপারের এক বস্তিতে সরিতা নামের এই মেয়েটি থাকত। ফিলমে নাকি একটু আধটু কাজও করত। একমাস ঘর বন্ধ থাকার পর বাড়িওয়ালা ঘরের তালা ভাঙে, জিনিসপত্র কিছুই পাওয়া যায়নি, যেটুকু পাওয়া গেছে সেটুকুই খুঁজে পেতে একটা ক্যালেন্ডারে লেখা ঠিকানা উদ্ধার করে মজিদ শাহ নামের লোকটি পার্সেলটা পাঠিয়েছেন। চিঠি পড়া শেষ করে সরযূপ্রসাদ জিজ্ঞেস করল, সরিতা তো কোনো লেড়কীর নাম, সরিতাটা কে?

আমি বললাম, ঠিক বুঝতে পারছি না, একটু খোঁজ নিয়ে দেখি।

রাতে পার্শেলে পাওয়া সেই রঙিন ছবিগুলো বিছানায় বিছিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম। কোনো তাপ-উত্তাপ নেই আমার শরীরে—পুরো একটা দিশীর বোতল গলায় ঢালার পরও কোনো বিকার নেই ভাবনার। প্রায় খোলামেলা একটা বাস্ট ছবি নিঃশ্বাসের আওতায় এনে বললাম, আমার কোনো বিকার নেই কেন সরিতা?

মালতিই সরিতা এবং বোম্বে গেলে মালতিকে সরিতা হতেই হবে, আমি ভেবেছিলাম। ছবিগুলো সরিতার—আমার মনে বহু বছর ধরে গড়ে ওঠা মালতির ছবির সঙ্গে এর কোনো মিলই নেই।

ক'দিন পরে বোম্বে মেলে টুকরো টুকরো করে কাটা ট্রাঙ্ক বন্দী একটা নারীশরীর হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছেছিল। পুলিশ নাকি মিসিং স্কোয়াডের ডায়েরি দেখে আমাদের খোঁজ করেছিল—মানুপিসীর খোঁজ করেছিল। মানুপিসীর চোখে চালসে কিভাবে আইডেন্টিফাই করবে। অমি হ'লে পারতাম—মালতির দুই বুকের মাঝখানে একটা ছোট্ট কালো জরুল। আমি চিনতে পারতাম, কানের পাশে নেমে আসা কোঁকড়ানো ঘন চুল আমি চিনতে পারতাম। নারীশরীরটি কোনো এক সরিতার। আমি মানুপিসীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম, নিজেও যোগাযোগ করতে চেয়েছিলাম থানায়।

দুটি বর্তুল ভারি মাংসপিণ্ডের মাঝে প্রায় ঢাকা পড়ে যায় এক ইঞ্চি মাপের কালো জরুল আমার ঠোঁটে লেগে আছে, বর্ণে গন্ধে স্বাদে আমার স্নায়ুকোষে ঢুকে আছে, সরিতাকে সনাক্ত বোধহয় আমিই করতে পারি। মানুপিসী তার নিজের মেয়ের নগ্ন শরীর সেভাবে দেখেনি, যেভাবে আমি দেখেছি। বিদেশও দেখেছে কিনা কে জানে? শরীরের সার্বজনীন প্রদর্শনীর জন্যে মালতি সরিতা হয়ে গেল।

আর তারপরই তো অতর্কিতে লোহার ডাণ্ডা—ডাক্তার বলেছিল ধারালো কিছু, পেশাদার খুনীর কাজ।

বরদা ভবন ভেঙে বরদা অ্যাপার্টমেন্ট হচ্ছে। সেই অ্যাপার্টমেন্টে আমার জন্য হাজার বারশো স্কোয়ার ফুটের সাজানো ফ্ল্যাট চারতলায় বা পাঁচতলায়। গ্যারেজে মারুতি গাড়ি। আর এসবই আমার—একান্ত আমারই শরীর বেচা পয়সায় গড়ে উঠবে। এখনকার স্বদেশ মরে যাবে, আরেকটা স্বদেশ বেঁচে থাকবে—খোঁকলা স্বদেশ। খোঁকলা মানুষের আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন কেমন হয় আমি জানিনা। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আমার খিদেও পাচ্ছে, ঘুমও আসছে। হ্যাঁ একটা অজানা ভয় মাঝে মাঝে আমার বুকের ওপর চেপে বসছে। কখনও মাঝ রাত্রিতে কখনও দুপুরে। শরীরের অবশ করা সুখ প্রায় স্মৃতি। মার্থা ছাড়া এই হাসপাতালে শরীরের তাপ আর কারও কাছে পাইনি—পাবার কথাও নয়।

পুরনো স্মৃতিগুলো ছাড়াছাড়া ভীড় করে—অজস্র মানুষের মুখ, মানুষের শরীর। শরীর থেকে সবকিছু বের করে নেওয়ার পরেও শরীর থাকবে, ডাক্তার বলেছে, আপনি বেঁচে থাকবেন—হ্যাঁ কর্মক্ষমও।

স্বপ্নে বরদাকান্তকে দেখলাম, বাড়িতে জীর্ণ হয়ে আসা তেলরঙে আঁকা পোর্ট্রেটে যেমন দেখেছি, তেমনি।

আমি বললাম, আমার বড় কষ্ট প্রপিতামহ। একটা গাড়ি একটা হাজার বারোশো ফুটের অ্যাপার্টমেন্ট আর কয়েক লাখ টাকা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের জন্য আমি নিজের শরীর বেচে দিচ্ছি। ওরা কিনছে আমি বেচছি। আমার তো আর কিছু নেই প্রপিতামহ যা ভাঙিয়ে আমি বাঁচতে পারি।

বরদা বললেন, এই শরীর তার অস্থি মজ্জা তোমার পূর্বপুরুষের দান, তুমি বেচতে পার না।

আমি বললাম আমার তো আর কিছু বেচার মত নেই নিজের শরীরের কলকজ্জা ছাড়া।

বরদা বললেন, আত্মা বিক্রির চেষ্টা করতে পার, শরীর থাকবে—আত্মা থাকবে না।

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আত্মা কি? সেটা যদি বেচা যেত ইউনিভার্সালের ডাক্তাররা কী ছেড়ে দিত?

আমার রক্তাক্ত শরীরে অজস্র খোঁচা খুঁচি চলছে—পাঁকাল মাছের মত কিছু একটা পিছলিয়ে যাচ্ছে। সাত আটটা নার্স ডাক্তার রক্তমাখা গ্লাভস পরে অপারেশন টেবিলে আমার ডিসেক্ট করা শরীরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। আচ্ছন্নের মত আমি জিজ্ঞেস করলাম কী খুঁজছেন আপনারা?

ডাক্তার ভার্গব বললেন, আত্মা।

আমি বললাম, আত্মা অমর অবিনশ্বর, আপনারা তাও বেচে দেবেন?

সংকট

ধীরে ধীরে আমি নিজেকে ফিরে পাচ্ছি বোধহয়। চোখ বুঁজেও আমার আস্ত চিত হয়ে পড়ে থাকা শরীরটা আমি অনুভব করতে পারছি। অতল অনন্ত নীল জলের ঢেউয়ে ধাক্কা খেতে খেতে কয়েক মুহূর্ত পায়ের নীচে মাটির ছোঁয়া পাচ্ছি। আবার নিঃশব্দে ঢেউ এসে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অকূল সমুদ্রে। অমি দুলছি, আমার চারপাশের আবছা দেয়াল ছাদের সিলিং, পাখা, টিমটিম করে জ্বলা হলুদ কয়েকটা আলো সব দুলছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোল খাওয়ার মধ্যে অল্প সময়ের জন্য নিজেকে ফিরে পাওয়া, পায়ের নীচে মাটির ছোঁয়া লাগা—এই অবস্থার মধ্যে যেন আমি বহুকাল রয়েছি। আলো আঁধারিতে যেটুকু দেখতে পাচ্ছি, তাতে বুঝতে পারি, আমি ইউনিভার্সালে ছতলার সেই কেবিনে নেই।

আমার হাত পা খাটের সঙ্গে বাঁধা। ঘাড় ঘুরিয়ে আমার পাশে সার দেওয়া আরও বেশ কয়েকটা বেড দেখতে পাচ্ছি। ডেটল ফিনাইল আরও পাঁচমিশেলী গন্ধে এটাকে হাসপাতালেরই একটা ঘর মনে হয়। এখানে আমি এলাম কি ভাবে? এরা আমার হাত পা এভাবে বেঁধে রেখেছে কেন? আমি উঠে বসবার চেষ্টা করি, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মাথার ভেতরটা ফেটে যাচ্ছে। কানের পাশ দিয়ে আবার রস নামছে গড়িয়ে গড়িয়ে। মাথায় কাটা জায়গাটা সুড়সুড় করছে—চুলকোচ্ছে। উঠে বসার চেষ্টা করতেই—হাত আর পায়ে টান লাগল। মোটা টেপ দিয়ে আমার হাত পা বাঁধা। ঘরের কোণার দিক থেকে কে একজন ছুটে এল, গলায় স্টেথো, আমি বুঝলাম ডাক্তার। তিনিই সম্ভবতঃ চীৎকার করে উঠলেন, সিস্টার, ক্যামপোজ। পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে গেল—কালো ঢেউয়ে দুলতে দুলতে আমি ভেসে চলেছি। ভেসে চলেছি। বাঁদিকে প্রায় ভেঙে পড়া একটা লাইটহাউস—নদীর কোণঘেঁষে ছোট্ট পিকনিক স্পট, একধারে খানিকটা উঁচু বাঁধের ওপর ফ্রকপরা মালতি স্কিপিং করছে। আমি অস্ফুটে বললাম ডায়মণ্ডহারবার! ইউনিভার্সাল নার্সিংহোমের বাড়িটা ছতলা। আমার কেবিন ছতলাতে— লিফট আছে। লিফটের সামনে একজন সিকিউরিটি গার্ড। আমাকে ওরা বলেছিল, করিডর পর্যন্ত যেতে পারেন, তার বেশি নয়। চারদিকে কাঁচ দেওয়া ঘেরা বারান্দা কেবিনের কাঁচঘরে ভারি পর্দা আছে, বারান্দায় নেই। লম্বা করিডোরের শেষপ্রান্তে একটা কোলাপসিবল গেট। আমি গেটটা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। লিফটের সামনের গার্ডটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, নীচে যাওয়া যাবে? গার্ড বলেছিল পারমিশন নেই। গার্ডটি অবাঙালি, পুলিশেরই মত খাকি পোশাক মাথায় টুপি, কোমরে একটা পিস্তল।

শক্তপোক্ত খানিকটা রুক্ষ চেহারার গার্ডটিকে দেখে আমি খানিকটা ভয়ই পেয়েছিলাম। নার্সিংহোম এরকম হবে কেন? দুটো দিন লক্ষ্য করে দেখলাম, ছতলায় কোনো ভিজিটর আসে না।

সেক্রেটারি নরসিমহন বলেছিলেন পাঁচতলা, ছতলা ইনটেনসিভ কেয়ার—আমরা ভিজিটর এলাও করি না। আর করলেও ডাক্তারের স্পেশাল পারমিশানে।

সেদিন রাত্রে ডাক্তার ভার্গব বললেন, আপনি তো বেশ সুস্থ হয়ে গেছেন। আর দুই একদিনের মধ্যেই আমরা বম্বে রওনা হয়ে যাব।

আমি বললাম, বম্বে কেন? আমার তো বিদেশে যাওয়ার কথা, আমেরিকা ইংলণ্ড আরও কী কী জায়গায়।

নরসিমহন বললেন, আমাদের ক্লায়েন্টরা যদি বম্বে এসেই ট্রান্সপ্লান্টেশনের কাজটা করে নিতে পারে, তাতে খানিকটা খরচা বাঁচে। তাছাড়া সোজাসুজি একটা মানুষকে অর্গান ট্রানসপ্ল্যান্টেশনের জন্য এক্সপোর্ট করে দেওয়ার ব্যাপারে আইনগত কতকগুলো অসুবিধে আছে। বেম্বোতে যদি ব্যাপারটা মিটে যায় তাহলে সবদিক থেকে সুবিধে।

আমি বললাম, তাহলে আমার টাকাকড়ি যা পাওয়ার কথা সেগুলোর কী হবে?

সেগুলো সব ঠিকই থাকবে, নরসিমহন বললেন, শুধু আপনাকে বিদেশে নিয়ে যাওয়া—নিয়ে আসার খরচ কমবে। ইউ কে কিংবা ইউ এস এ হলে আপনি পেমেন্ট পেতেন ডলারে, এখানে পেমেন্ট ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে, টাকায়। তাও আমরা চেষ্টা করছি কিছুটা যদি ডলারে পাওয়া যায়, নিদেনপক্ষে পেট্রো ডলারে।

ডাক্তার ভার্গবকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি তো এখন প্রায় পুরোই সুস্থ। আমি বাইরে যেতে পারি না? নীচে একটা সুন্দর লন আছে, সেখানে একটু পায়চারি করতে পারি না?

ডাক্তার ভার্গব বললেন, নর্মালি আমরা অনুমতি দিই না। বাইরে নানা ধরনের রুগী। ট্রানস্প্ল্যান্টেশনের জন্য আমরা ডোনারকে পুরোপুরি ক্লিনিক্যালি পিওর রাখতে চাই। একেবারে ফ্রী ফ্রম ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া। তবু ঠিক আছে, আপনি বললেন, আমি ভেবে দেখি। রাত্রি আটটা নটার পর আপনি নীচে যেতে পারেন, তবে সঙ্গে একজন ডাক্তার আরেকজন গার্ড থাকবে।

ক্রমশঃই আমার ধারণা হচ্ছিল, আমি ইউনিভার্সাল নার্সিংহোমের ছতলার কাঁচঘরের ফাঁদে আটকা পড়ে গেছি। বরদা এ্যাপার্টমেন্টে আমার জন্য একটা ফ্ল্যাট, ব্যাংকে দশ লক্ষ টাকা—একটা মারুতি গাড়ি—এসবের বদলে আমার শরীরের কলকব্জা বিক্রির চুক্তির হয়ত কোনো ভিত্তি নেই। আদতে হয়ত এরকম কোনো চুক্তি হয়ই নি। আমি নিজেও তো খেয়াল করতে পারছি না—চুক্তিপত্রে আমি সই করলাম কখন। এরা আমাকে কিছু কাগজপত্র দেখতে বলেছিল, টাকমাথা প্রায় ছফুট লম্বা, মোটাসোটা—সুটবুট ভার্মা তাঁর বিদেশি ক্লায়েন্টদের কথা বলেছিলেন। কমল পাকড়াশি আর বিশাখা পাকড়াশি নাকি আমার এজেন্ট। আমি বাজার যাচাই করে আমার কিডনি থেকে শুরু করে যাবতীয় কিছু বেচে দেওয়ার জন্য ওদের দুজনকে ভবতারিণী ট্রেডিং সেন্টারের নামে পাওয়ার অব এ্যার্টনি দিয়েছিলাম। আমি শুধু নিজের জন্য একটাই জিনিশ চেয়েছি—আমার প্রাণ, সেটা যেন বেচে না দেওয়া হয়। প্রাণই যদি চলে যায়, তবে বাড়ি গাড়ি ব্যাংক ব্যালান্স নিয়ে স্বদেশ চাটুজ্জে করবেটা কী? তা সত্ত্বেও ওরা বলেছিল, একটা নমিনি করে রাখা ভাল। কীসে কি হয় বলা যায় না, যদি তেমন কিছু হয়, তাহলে গাড়ি বাড়ি ব্যাংক

ব্যালান্স যেন আমার উত্তরাধিকারী পায়।

মাথার মধ্যে বেশ খানিকটা চাপ চাপ অন্ধকার। নিজের মধ্যে ঢুকে গিয়ে আমি সেই অন্ধকারে আমি হাতড়াতে থাকি। বাড়ি ব্যাংক ব্যালান্স গাড়ির সুখের একটা স্বপ্ন তো থেকেই গিয়েছিল, বাপ পিতামহের সূত্রে। পিতামহের অর্থাৎ বদ্যিনাথের নাকি একটা মরিস মাইনর ছিল। রামদাস হনুমান দাসে থাকতে থাকতেও আমি একটা হাজার বারোশো স্কোয়ার ফুট এ্যাপার্টমেন্টের স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু তার জন্য আমি নিজেকে বেচতে রাজি হলাম কবে, কী করে?

আমি যতই নিশ্চিত হচ্ছিলাম, চুক্তির ব্যাপারটা ভুয়ো অথবা এরা আমার অচৈতন্য অবস্থায় আঙুলে কলম গুঁজে দিয়ে কিছু একটা করে নিয়েছে, হয়ত টিপ ছাপই নিয়েছে—ততই আমার ভয় বাড়ছিল। ফাঁদে পড়া জন্তুর মত আমি ছটফট করছিলাম, বারান্দার কাঁচের সার্সি ভেঙে চিৎকার করে লোকজন ডাকব কিনা ভাবছিলাম। বেশ কবার আলতো ভাবে সুইং ডোর খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লম্বা করিডোরের অন্যপ্রান্তে কোলাপসিবল গেটটা লক্ষ্য করেছি। লিফটের সামনের দারোয়ানের চোখকে ফাঁকি দিয়ে নীচে নেমে যাওয়া যায় না কি!

বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে হয়েছে—ছতলার ওপরে সিঁড়ির দিক থেকে একেবারে কোনায় আমার ঘর পর্যন্ত আটটা ঘর আছে। এ ঘরগুলোতে কারা আছে, আমি জানি না। দু-একটা ঘরে নার্স ঢুকছে, বেরিয়ে যাচ্ছে দেখলাম। পরিচিত সেই প্রৌঢ়া নার্স একটা ঘর থেকে বেরিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন বললেন—আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?

আমি বললাম, আমি তো ভাল হয়ে গেছি। উনি বললেন, এদিকটা ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট পরপর। আপনি এখনও ভাল হয়ে ওঠেননি। আপনি খানিকটা সুস্থ হলে আপনাকে তিনতলা বা চারতলায় সিফট্ করিয়ে দেওয়া হত। আমি বললাম, আপনি যে কেবিনটা থেকে বেরিয়ে এলেন, ওখানে পেশেন্ট আছে? নার্সটি আমার মুখের দিকে একঝলক তাকালেন। চশমার কাঁচের আড়ালে তার ঠাণ্ডা বরফের মত দুটো চোখের দিকে তাকিয়ে, আমার কেমন যেন শীতশীত করতে লাগল।

উনি বললেন, নিজের ঘরে যান, ডাক্তার ভার্গব এখনই রাউণ্ডে আসবেন।

ঘরে ঢুকে একগ্লাস ঠাণ্ডা জল খেতে খেতে, আমি নিজের হৃৎপিণ্ডের ধকধক শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।

ঘুমপাড়ানি ইনজেকশনের রেশটা শরীর থেকে মুছে যাচ্ছে। যদিও হাত পা বাঁধা, মাথা খানিকটা ভার, তবু বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, এটা একটা হাসপাতালের ওয়ার্ড— বড় হলঘরের মত। বেশ কিছু বেড একটা ঘরে। পুরনো আমলের বাড়ি। সিলিং বেশ উঁচু— কাঠের কড়ি বরগায় সম্ভবতঃ আলকাতরা লাগানো। হলুদ নয়—হয়ত এলা রঙের কোট লাগানো হয়েছে

দেয়ালে। লম্বা তারে ঝোলানো বালবগুলোও ফ্যাকাশে হলুদ। ঘটাং ঘটাং শব্দ করে একটা পাখা ঘুরছে। আমি চোখ বুজলাম। না, এটা ইউনিভার্সালের কেবিন নয়, কাঁচঘর নয়।

ইউনিভার্সালের কাঁচঘরে আমি আটকে পড়ে গেছি, পালাবার কোনো রাস্তা নেই—এই ভাবনাটা যতই আমার মাথায় পাক খাচ্ছে, নিজেকে আটকে রাখা আমার পক্ষে ততই কঠিন হয়ে পড়ছে। ঘুম আসছে না, বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতে একসময় আমি উঠে পড়লাম। জল খেলাম ঢকঢক করে। ঘর প্রায় অন্ধকার, একটা নীলবাতি জ্বলছে টিমটিম করে। দরজাটা অল্প ফাঁক করতে একটা তেরছা আলো বারান্দা থেকে ঘরের মধ্যে এসে পড়ল।

অতি দ্রুত, কিন্তু নিঃশব্দ পা ফেলে কয়েকজন সিঁড়ির দিক থেকে এগিয়ে আসছে বুঝতে পারি। বারান্দার উপর দিয়ে একটা ট্রলি টেনে আনা হচ্ছে। আরও কয়েকজন উঠে এল। লিফটের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আরেকটু ফাঁক করে মাথাটুকু গলিয়ে করিডরটা একবার দেখে নেওয়ার তীব্র ইচ্ছে হচ্ছিল। ঘামছি কুলকুল করে, ঘরে এসি মেশিন চললেও আমার কপাল, ঘাড় মাথায় কেমন যেন গরম ভাপ লাগছে।

দরজায় কান লাগিয়ে, মেঝেতে কার্পেটের ওপর বসেই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ আরেক দফা ঘটাং ঘটাং করে আওয়াজ—রাত দুটো, লিফট উঠছে, নামছে। নিঃশব্দ অথচ দ্রুত পা ফেলে কয়েকজন লিফটের দিকে চলে যাচ্ছে। আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমি অতি সন্তর্পণে বাইরে বেরিয়ে এলাম। এদিকটায় পেছন ফিরে লিফটের সামনের গার্ডটি নীচের দিকে কী যেন দেখছে। আমাকে অবাক করে দিয়ে গার্ডটি লিফটে নীচে নেমে গেল। আমি এক ছুটে লিফটের সামনে, তিনতলায় গিয়ে লিফটটা থেমে গেল। এখনও কিছু লোকের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি, বোধহয় তিন তলা বা চারতলায়। সিঁড়ির কোলাপসিবল গেটে তালা দেওয়া, ভারি তালা আমি হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলাম। লিফটটা তিনতলাতেই দাঁড়িয়ে—কেউ নেই মনে হয়—আমি বোতাম টিপলাম, লিফট নীচে নেমে গেল। একমিনিটও না দাঁড়িয়ে লিফটটা অত্যন্ত দ্রুত ওপরে উঠতে লাগল। কেউ ওপরে আসছে কিনা, না দেখে নিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না। আর শুধু লিফট দিয়ে নীচে নেমে গেলেই তো হবে না। নীচে খোলা লনে চারপাশ থেকে আলো এসে পড়ছে। দেড় মানুষ সমান উঁচু পাঁচিল, লোহার ভারি গেট, এতক্ষণে নিশ্চয়ই তালা বন্ধ। লিফট দিয়ে যদিও বা নীচে নামতে পারি—বড় বড় হ্যালোজেন ল্যাম্পে আলোয় আলো, লন পেরিয়ে, পাঁচিল টপকে, না হয় লোহার ভারি গেট খুলে আমি পালাব কি করে? ধরা পড়ে যাব।

ঘটাস করে লিফটটা এসে ছতলায় ধাক্কা খাওয়ার আগেই, এদিক থেকে তিন নম্বর দরজাটা, দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়িয়েছিলাম, হয়ত পিঠের আলতো চাপেই খুলে গেল। দরজাটা ভেজিয়ে দিতে দিতে দেখলাম—দুজন গার্ড, একজন করিডোরের অন্যপ্রান্তে, আমার কেবিনের দিকে এগিয়ে গেল।

আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে অল্পবয়েসী একটি নার্স। তাঁর নিঃশ্বাস পড়ছে আমার গালে। একটা হলুদ আলো তার পিঠের দিকে, আমি তার মুখ দেখতে পাচ্ছি না। আমি শূন্য বোবা দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমার পাশে বিছানার ওপর একটা ট্রে রাখা, খানিকটা তুলো ছিড়ে উনি আমার কানের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ারস মুছিয়ে

দিলেন। তারপর বললেন, এখন কেমন বোধ করছেন?

আমি ম্লান হেসে একদিকে ঘাড় কাত করলাম। নার্সটি ঠাণ্ডা তোয়ালে দিয়ে আমার কপাল মুছিয়ে দিলেন, বললেন আর ভয় নেই, এবার আপনি ভালো হয়ে যাবেন।

অস্ফুটে বললাম, আমি কোথায়? নার্সটি মাথার বালিশের ওপর ছোট একটা তোয়ালে ঘাড়ের নীচে গলিয়ে দিলেন, বললেন বাঙ্গুর হাসপাতালে।

চোখ বুঁজে আবার হালকা অন্ধকার ঘুমে তলিয়ে যেতে যেতে, আমি বললাম, বাঙ্গুর হাসপাতাল সেটাতো সরকারি হাসপাতাল, এখানে আমি এলাম কী করে? আমি তো ছশো তিন না ছশো চার নম্বর কেবিনের ভেজানো দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ভয়ে তিরতির করে বলির পাঁঠার মত কাঁপছিলাম।

ছশো তিনের কেবিনের একপ্রান্তে বড় একটা টেবিল, অপারেশন টেবিলই বোধহয়। একটা উজ্জ্বল আলো। দরজার সামনে থেকে দেয়ালের দিকে একটু সরে গেলাম আমি—না হলে পেছনের আলো থেকে বারান্দায় আমার ছায়া পড়বে। পায়ের সামনে কয়েক আঁটি খড়, খানিকটা আলগা বিচালি। এখানে খড় কেন? খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে আমি অপারেশন টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। উজ্জ্বল আলোর নীচে মজবুত চেহারার একটা মানুষ পুরোপুরি নগ্ন শুয়ে আছে উপুড় হয়ে। এই কি পেশেন্ট, বেঁচে আছে না মরে গেছে? ভালো করে লক্ষ্য করেও আমি শ্বাস-প্রশ্বাসে পিঠের ওঠানামা দেখতে পেলাম না। শিরদাঁড়া সোজা যেখানে এসে কোমরেরও আঙুল কয়েক নীচে শেষ হয়েছে তার ডানদিকে একটা গভীর গর্ত। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, এখনও টেবিলের গা দিয়ে। স্ক্যালপেল না কী বলে যেন, আসলে ডাক্তারের ছুরিই, সেই গর্তের মধ্যে আটকে আছে, চক্‌চকে হাতলের দু আঙুল মত বাইরে বেরিয়ে আছে গর্তটা ঘন পাঁশুটে রক্তে টইটুম্বুর। আরেকটু ওপরে আড়াআড়ি আরেকটা ক্ষত, তার ওপরে আলগা পড়ে আছে গজ ব্যাণ্ডেজ। পিঠের মাঝামাঝি সাঁড়াশি, চিমটে থেকে শুরু করে আরও বেশ কিছু সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। লোকটির ঘাড় অন্যদিকে ঘোরানো। দুটি হাত আর পা মোটা ব্যাণ্ডেজের মত কাপড় দিয়ে অপারেশন টেবিলের সঙ্গে বাঁধা, কত বয়েস হবে লোকটার পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ।

আমি লোকটির মুখটা একটু দেখব বলে অপারেশন টেবিলের অন্যদিকে ঘুরে যাওয়ার চেষ্টা করি। টেবিলের পাশে রাখা ছুরি কাঁচি শুদ্ধু একটা ট্রে ঝনঝন্ শব্দ করে উল্টে পড়ে। করিডোরের বারান্দার ঘড়ির এ্যালার্মের মত একটা রিনরিন শব্দ বেজে ওঠে, আমি আলোটা নিভিয়ে দিই, অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকি।

আপনি যে প্রাণে বেঁচেছেন, এটাই অনেক, কাঁচাপাকা একমাথা চুল একজন আমার বেডের পাশে একটা টুলে বসে বললেন।

এপাশে, গলায় স্টেথো ঝুলিয়ে অল্পবয়েসি একটি ডাক্তার বললেন, লালবাজার থেকে ইনসপেক্টার বর্ধন এসেছেন, কয়েকটা প্রশ্ন করতে। আপনার টেমপারেচার নর্মাল—ব্লাড

প্রেসার একশো কুড়ি বাই সত্তর, একটু নীচের দিকে, আপনি ইচ্ছে করলে ওঁর মানে মিটার বর্ধনের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। আর যদি মনে হয়—

সাদা হাফসার্ট, নীল ট্রাউজারে মিস্টার বর্ধন বললেন, আমি আই. বি মানে ইনটেলিজেন্স ব্র্যাঞ্চ থেকে এসেছি। জাস্ট কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করেই চলে যাব। দরকার হলে পরে আসব—আপনি ততদিনে অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠবেন আশা করি। আপনি ইউনিভার্সাল নার্সিং হোমে ভর্তি হলেন কি করে? মানে আপনি কী নিজে এ্যাডমিশন নিয়েছিলেন কিংবা কোনো আত্মীয়স্বজন?

আমি বললাম শুনেছি সল্টলেকে বনবিতানের চওড়া রাস্তায় আমি এলোমেলো পাক খাচ্ছিলাম, ঠিক দাঁড়াতে বা চলতে পারছিলাম না। একটা সাদা মারুতিতে দুজন আমাকে তুলে নিল—এক ভদ্রলোক, আর এক মহিলা।

কাঁচা পাকা চুল ওলা লোকটি এগিয়ে এল একেবারে আমার বুকের ওপর। হাতের ফাইল থেকে দুটো ছবি বের করে বলল, দেখুন তো এরাই কিনা?

আমি ভাল করে না তাকিয়েই বলে দিলাম, কমল পাকড়াশি আর বিশাখা পাকড়াশি—প্রায় সতের বছর আগে ওদের দেখেছিলাম, ভবতারিনী নার্সিংহোমে।

দুজনকেই আমরা এ্যারেস্ট করেছি—ডাক্তার ভার্গব ছাড়াও আরও সাতজন ডাক্তার নার্স এ্যারেস্ট হয়েছে, এখনও কয়েকজনকে খুঁজছি, ইনস্‌পেক্টর বর্ধন বললেন।

আপনি কী নিজের ইচ্ছায় আপনার অর্গানগুলো দান অথবা বিক্রি করবেন বলেছিলেন? স্টেথো গলায় ঝুলিয়ে কমবয়েসি ডাক্তারটি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে আমি অনেক কষ্টে বললাম, আমার চোখের কোলে জল এসে গেল, ওরা আমাকে অনেক টাকা দেবে বলেছিল—ডলার। একটা ফ্ল্যাট, গাড়ি ব্যাংক ব্যালেন্স, আমি একটু ভাল থাকব বলে নিজেকে বেচতে চেয়েছিলাম।

ইনসপেক্টর বর্ধন বললেন, যদিও আইনতঃ আপনি পারেন না, তবুও ঠিক আছে। আমরা আরও দুজনকে উদ্ধার করেছি। তাদের মিডল ইস্টে চাকরির লোভ দেখিয়ে, একটা করে কিডনি দিতে বাধ্য করা হয়েছে। বোম্বের একটা ঠিকানা পেয়েছি, যারা সৌদি আরবে ঠিকের লেবার সাপ্লাই করে। তারা বলেছে ইউনিভার্সালের ওই দুজনকে তারা কোনো এ্যাপয়ন্টমেন্ট দেয়নি, তাদের চেনেনা। এটা একটা র‍্যাকেট— কলকাতা হায়দারাবাদ আর বোম্বে তিনজায়গাতেই পুলিশ একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এখন পর্যন্ত গোটা ব্যাপারটা আমরা পাইনি, পেয়ে যাব।

বর্ধন টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার আরও বেশ কিছু প্রশ্ন আছে—আপনি একা নন, ইউনিভার্সাল থেকে সেই রাত্রে আমরা পাঁচজনকে রেসকিউ করেছি। তাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। যাই হোক, আপনি টাকার বিনিময়ে নিজেকে বেচে দিয়েছিলেন—ভালো করেননি—কাজটা বেআইনি।

খবরের কাগজে নাকি ঘটনাটা ফলাও করে বেরিয়েছে। সবুজ পাড়, সাদা খোলের শাড়ি পরা অল্প বয়েসী নার্সটি বলল। মাথার ব্যাণ্ডেজ পালটাতে পালটাতে সেলাইয়ের আড়াআড়ি

দাগে আঙুল বুলিয়ে বলল, আপনার মাথার মধ্যে থেকেও কিছু নিয়ে নিয়েছে না কি?

আমি শুকনো হেসে বললাম, মাথার মধ্যে থেকে কী আর নেবে, ঘিলু?

আমার হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিতে দিতে নার্সটি বলল, খুব সাবধান কিন্তু আপনার তলপেটে টাটকা স্টীচ আছে—পিঠের দিকেও একটা গর্ত আছে—বুঁকের বাঁপাশে একটা পাঁজর এখনও আলগা—ওরা হয়ত হার্টটাও উপড়ে নিত। জোর বেঁচে গেছেন। শরীরের এতগুলো ওপেন করা জায়গা শুদ্ধু ভোররাতে পুলিশের গাড়ি আপনাকে বাদুরে নিয়ে এসেছিল। আরও পাঁচজন আছে এই ঘরে।

সেদিন ইউনিভার্সালের নাম লেখা এ্যাম্বুলেন্স রাস্তায় পড়তেই, পুলিশের দু দুটো জীপ রাস্তা জুড়ে দাঁড়ায়। জনা বারো সশস্ত্র পুলিশ এ্যাম্বুলেন্স ঘিরে দাঁড়ায়। গাড়িটা ব্যাক করে একটা রাস্তা দিয়ে পালাতে চেষ্টা করে—পুলিশ ফায়ার করে। প্রায় ভোররাতে ফলতা ফ্রী ট্রেড জোনের কাছে পুলিশ একটা গুদামে হানা দেয়। চুন আর দুতিন রকমের তরল কেমিক্যালে ডুবিয়ে রাখা আরও তিনটে মৃতদেহ আটক করে পুলিশ। সেগুলো নাকি কবরখানা থেকে তোলা। পঞ্চাশটা মানুষের কঙ্কালের অর্ডার ছিল বিদেশ থেকে। একসপোর্টার ভবতারিণী ট্রেডিং সেন্টার।

ইউনিভার্সালের পুলিশ তালা মেরে দিয়েছে। যে সব রুগীদের চিকিৎসা হচ্ছিল, বাকি তিন চারটে ফ্লোরে, তারা নিজেরাই অন্য নার্সিংহোমে না হলে সরকারি হাসপাতালে চলে গেছে। সত্তর আশি জন এধরনের রোগী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সিফট করা সোজা কাজ নয়।

নার্স চলে গেলে শুয়ে শুয়েই আমি আমার শরীরের ক্ষতস্থানগুলো খুঁজতে থাকি। ক্লান্ত অবসন্ন আঙুলে আমি আদর করে আমার শরীরে হাত বোলাই, নিজেকে আশ্বস্ত করি, তুমি বেঁচে আছ, বেঁচে আছ স্বদেশ। আমার বাঁহাত দুর্বল উরু সন্ধিতে এলিয়ে পড়ে ঘামতে থাকে।

এতক্ষণ চুন দিয়ে একটা গর্তে চাপা দিয়ে রেখেছিল আমাকে। এবার একটা বিশাল লোহার হুকে কপিকল দিয়ে ওরা টেনে তুলল আমাকে। মাংস খসে গেছে বহু জায়গায়। পাঁজরের প্রায় সবকটা হাড়ই দেখা যাচ্ছে। হাতের চেটো, আঙুল, পা দুটো প্রায় সাদা নিরালম্ব ঝুলছে। পাছায়, হিপবোনে নাভির আশপাশে খানিকটা আলগা চুনে ঝল্সানো মাংস লেগে আছে। করোটি প্রায় বিভিন্ন ছবিতে যেসব কঙ্কাল দেখা যায়, তারই মত, ঠোঁট না থাকলেও, একটা আলগা হাসি আছে—দুটো ফোকলা দাঁত সহ দুপাটি বেশ ঝকমকে আর আশ্চর্য কোটরের গর্তে দুটো চোখ অবিকল রয়ে গেছে। চোখে পল্লব নেই পাতা নেই—শুধু ড্যাবডেবে সাদার ওপর কালো মণিদুটো।

আমি বিড়বিড় করে বললাম, চুক্তিতে তো পাকড়াশি তুমি আমার স্কেলিটনের, আস্ত কঙ্কালের দাম ধরনি। পাকড়াশি বলল, ওটা আমার দস্তুরি—আমার কমিশন। আমি তোমার কঙ্কালটা সুইজারল্যাণ্ডে একসপোর্ট করে দেব। ওখানকার মেডিকেল কলেজের ছেলেমেয়েরা তোমার অপুষ্ট হাড়ের কাঠামোতে যখন আঙুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে অস্থি উপস্থি চিনবে, তখন সুইজারল্যাণ্ডে বসন্ত এসে যাবে। কয়েকটা স্ক্রুয়ের ফাঁদে আটকানো তোমার কঙ্কাল বসন্তের বাতাসে দুলবে, দুলতে থাকবে।

ঠোঁটহীন মুখে আমি হাসলাম, তার চেয়ে ভাল আমাকে খড়ের মানুষ করে দাও। কাঠামোর সঙ্গে খড় বেঁধে তার ওপর বেলুনের মত পাতলা একটা চামড়ার মোড়কে আমাকে ভরে দাও। আমি বেঁচে থাকি। আমি বললাম, আমি জানি—আত্মা অবিনশ্বর।

জনসংযোগ

চোখ বুঁজে শুয়েছিলাম। কপালে ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া পেয়ে চোখ খুললাম, মুখ তুলে তাকালাম—তারপর চোখ রগড়ে ধড়মড় করে উঠে বসার চেষ্টা করলাম। মালতি রুমাল দিয়ে চোখের কোলে জল মুছল, আলতো করে মাথায় হাত রাখল, বলল, চিনতে পারছ সদাদা।

আমি চোখ বুঁজতে বুঁজতে বললাম, তোকে কী করে ভুলে যাব মালতি।

মালতি বলল, বিদেশও এসেছে—তোমার জন্য দুয়েকটা ইঞ্জেকশন, ওষুধ বাইরে থেকে কিনে আনতে গেছে। ডাক্তার বিশ্বাস, এখানকার সুপার—তাঁর সঙ্গেও আমাদের কথা হয়েছে। সপ্তাখানেকের মধ্যে তুমি ভালো হয়ে যাবে সদাদা। মালতি চাদরের নীচে ঢাকা দেওয়া আমার বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, বলল, তিনমাস হল আমি কলকাতায় ফিরে এসেছি, দুদিন বরদা ভবনে গেছি। রামপদ জ্যাঠার ছোটছেলে অধীর, ওরা তো এখনও আছে বরদাভবনে। আমি অধীরদার বউ শীলা বৌদির কাছে আমার ঠিকানা রেখে এসেছিলাম। বলেছিলাম, তুমি যাতে অবশ্যই যোগাযোগ কর। তারপর শুনলাম, তোমার খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না। অধীরদা, তোমাদের এক ভাড়াটে অমল সরকার এরা থানায় গিয়েছিল ডায়েরি করতে। কারা নাকি গলির মুখে তোমার মাথায় ডাণ্ডা মেরে গাড়িতে করে তুলে নিয়ে গেছে। মালতির একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললাম, তোর সঙ্গে একবার দেখা হবে বলেই হয়ত মরতে মরতেও বেঁচে গেলাম।

মালতি বলল, আমি কিন্তু বরানগরে মাসির বাড়িতে নেই। নাকতলায় ছোট একটা ফ্ল্যাট নিয়েছি। বিদেশ জানে, একদিন গিয়েছিল মায়ের সঙ্গে দেখা করতে।

আমার মানু পিসীর কথা মনে পড়ল, জিজ্ঞেস করলাম মানু পিসী কেমন আছে?

এমনিতে তো ভালই থাকে— কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ সেই হীরের আংটিটার কথা মনে পড়ে যায়। তোমার আংটিটার কথা মনে আছে সদাদা?

আমি বললাম বরদাকান্তর আংটি, হিলটন না কে যেন সাহেব পাঁচহাজার টাকায় বাঁধা রেখেছিল। মালতি বলল, মা স্বপ্নের মধ্যে আংটিটা খোঁজে—মাঝরাতে ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। আমাকে ঘুম থেকে ধাক্কা দিয়ে তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করে হীরের আংটিটা কোথায় রাখলুম বল দেখি। বরানগরে মাসীর বাড়ি থেকে পালিয়ে বরদা ভবনে চলে আসত। শীলা বৌদিই বলছিল, বাড়ির পেছন দিকের দোতলাটা তো করপোরেশন

ভেঙে দিয়েছে—সেখানে ভাঙা ইঁট কাঠের টুকরো রাজ্যের আবর্জনা, মা একটা লোহার শিক দিয়ে আস্তাকুঁড় ঘাটত, আর বিড়বিড় করে বলত হীরের আংটিটা কোথায় গেল, এইখানেই তো রেখেছিলাম। আমি না থাকলে মাকে ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখি। দেখাশোনার একটা লোক আছে, তবুও। মা মনে হয় বেশিদিন বাঁচবে না। মাথাটা গেছে, শরীরও পুরো পুরি ভেঙে পড়েছে।

আমি বললাম, শিবুদার কথা কিছু বলেনা? মালতি উত্তর দিল না। চোখ বুঁজতে বুঁজতে মনে হল মালতি কাঁদছে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমার বুকের ওপর রাখা মালতির হাত একটু একটু কাঁপছিল, আমি আমার দুর্বল হাতের মুঠোয় ওর হাত চেপে ধরলাম।

বিদেশকে কতদিন পরে দেখব, শেষ দেখা সেই পাঁচ বছর না সাত বছর আগে, সদর স্ট্রিটে লিটন হোটেলে। বিদেশের চেয়ে মাথায় অন্ততঃ চার আঙুল লম্বা একটা মেয়ে ছিল। নীল চোখ, বাদামি চুল—গায়ের রঙ একটু ফ্যাকাশে সাদা। আমি মার্থার কথা ভাবলাম, ইউনিভার্সালে আমার সঙ্গে বেশ কদিন গল্প করে কাটিয়ে গেল। মার্থা একটু অন্যরকম বিদেশের সঙ্গের মেমসাহেবের মত এত ভারি চেহারা নয়। একটু বেশি প্রাণবন্ত ছটফটে। মাথাকে দেখলেই বোঝা যেত ঘরদোর বলে কিছু নেই, পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত দৌড়ে বেড়ানোই ওর নেশা। তুলনায় মার্গারেট অনেক ধীর স্থির, আস্তে আস্তে কথা বলে। মার্গারেটের মা আয়ার্ল্যাণ্ডের মেয়ে, বাবা অস্ট্রেলিয়ার। বিদেশ মার্গারেটের মামার জাহাজ কোম্পানিতেই চাকরি করে। মার্গারেটের এক সৎ ভাই আছে।— তারও জাহাজের ব্যবসা, সিঙ্গাপুর আর হংকংয়ে।

না, মার্গারেটকে এখনও বিয়ে করেনি বিদেশ, বছর তিনেক একসঙ্গে আছে। ওর মা বাবার আপত্তি নেই, মামা একটু আপত্তি করেছিল, কালো চামড়া ইন্ডিয়ান বলে। মার্গারেটের দু দুবার বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে। নিউইয়র্কের বিয়েটা স্থায়ী হয়েছিল মাত্র আড়াই বছর—বাচ্চাকাচ্চা হয়নি টনি। ওর মার্কিন স্বামী নপুংসক ছিল। দ্বিতীয় স্বামী অস্ট্রেলিয়ারই, ডেভিড। তবে গায়ে আদিবাসী মাওরিদের রক্ত আছে। দুটো মেয়ে আছে ডেভিডের। বিবাহ-বিচ্ছেদের পর দুই মেয়েকেই মার্গারেট লণ্ডনে ওর মামা হাওয়ার্ড জনসনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই হাওয়ার্ডই হল জনসন এণ্ড জনসন ওসান লাইনারের ফিফটি পার্সেন্ট মালিক। এতবড় জাহাজ কোম্পানি কিন্তু এখনও প্রাইভেট লিমিটেড।

আমি বললাম, এতদিন পরে এলি—কলকাতা কদিন থাক। বিদেশ বলল, আমার তো হাতে ছুটি আছে। কিন্তু ম্যাগি থাকতে চাইছে না। হঠাৎ লণ্ডনে ওর মেয়েদের জন্য দুশ্চিন্তা হতে শুরু করেছে, যদিও ওর মা ওখানে গেছে, তাও বলছে হাওয়ার্ডকে বিশ্বাস নেই। হাওয়ার্ড ক্যান ডু এণ্ড আনডু এনিথিং এণ্ড এভরিথিং। ওর ভয় হচ্ছে হাওয়ার্ড মে রেপ হার টিন এজ ডটার। মা হাওয়ার্ডকে ভালভাবেই জানে, তবু হাওয়ার্ডকে চোখে চোখে কতক্ষণ রাখতে পারবে।

অবাক হয়ে মার্গারেটকে একবার দেখলাম, লিটন হোটেলের সুটে এখন একটা হাতকাটা গেঞ্জি আর সর্টস পরে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে আধশোয়া, ধবধবে একটা পা বিদেশের

কোলে তুলে দিয়ে সেও খানিকটা অবাক হয়ে আমাকে দেখছে। হাওয়ার্ডের প্রসঙ্গ উঠেছে দেখে সে সোজা হয়ে উঠে বসল। বিদেশকে বলল, কালকেই আমরা রওনা হব, সিঙ্গাপুর হয়ে লণ্ডনে। হাওয়ার্ড আমার নিজের মামা, কিন্তু আমার বাচ্চাদের বিপদ হতে পারে।

আমি বললাম, কী করতে পারে মামা? মার্গারেট বলল হী রেপড্ মী হোয়েন আই ওয়াজ জাস্ট ইলেভন্ ইয়ারস ওলড্। ম্যাগির কথা ভাবতে ভাবতে আমার মার্থার কথা মনে এল। ফর্সা চেহারায় খানিকটা তামাটে আভা—ডায়মণ্ডহারবারের চড়ুইভাতিতে হারিয়ে যাওয়া মার্বেলটার মত চোখ, টানটান গাল আর চিবুকের এখানে ওখানে একটু গোলাপি ছোপ, মসৃণ গলা, শক্ত কাঁধ—ঘাড় পর্যন্ত অবিন্যস্ত বাদামি চুল, শরীরের তুলনায় একটু ভারি বুক দুটো জিনসের ঢিলেঢালা সার্টেও খানিকটা সোচ্চার। মার্থার এক আশ্চর্য ভালোবাসা আমার শরীর, অস্থি মজ্জা স্নায়ুকোষ একটা সন্ধ্যা জুড়ে মুখর করে রেখেছিল। আমাকে ঘিরে জলতরঙ্গের সুর বাজছিল।

মার্থা বলেছিল, আই লাভ ইউ সোয়াদেপ। তুমি যদি অর্গান ডোনেট করতে বিদেশে যাও, আমাকে জানিও—আমি নিশ্চয়ই দেখা করব।

মালতি চলে গেল, বলল তার শো আছে—তপন থিয়েটারে। দুটো ক্যাবারে নাচের দৃশ্য।

বিদেশ বলল, পরশুই আমরা কয়েকজন গিয়েছিলাম, ফ্যানটাসস্টিক নাচে মালতি। বোম্বেতে কেন যে ক্লিক করল না কে জানে? কি যেন নাম ছিল তোমার বোম্বে ফিল্মে?

আমি বললাম, সরিতা।

এখানেও ওই নামে মালতি স্টেজে নামে, ক্যাবারে নাচে— বোম্বের চিত্রাভিনেত্রী মিস্ সরিতা।

বিদেশ আমাকে জিজ্ঞেস করল, মার্থা বলে কোনো মেয়ে তোকে ইউনিভার্সাল নার্সিং হোমে মীট করেছিল?

আমি বললাম, হ্যাঁ—একবার নয় কমপক্ষে তিনচারবার। বলছিল আমার একটা ইনটারভিউ নেবে। ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, ময়নামার, শ্রীলঙ্কা আরও নানা দেশে থেকে মানে মেনলি এশিয়ার গরিব দেশগুলোতে নতুন নতুন ব্যবসার যে এভেনিউ খুলে যাচ্ছে, সেই সম্বন্ধে ও লিখবে। ইন্ডিয়া গ্যাট চুক্তিতে সই করেছে। এবার ওপেন মার্কেট ইকনমি—যা প্রাণে চায় ইমপোর্ট কর, যা পার একসপোর্ট কর। বিদেশি পারফিউম থেকে শুরু করে বিদেশি গাড়ি, টিভি ফ্রিজ এমনকি কনডোম পর্যন্ত ইমপোর্ট হচ্ছে।

বিদেশ বলল কালচারাল ব্যাপারটা বল। মাইকেল জ্যাকসন এসে মুনওয়াক দেখিয়ে গেল, ম্যাডোনা এসে শরীর দেখিয়ে যাবে ন্যাংটো শরীর। আমাদের পারভার্ট সেকস্ ষ্টার্ভড বেনেগুলো দুচোখ দিয়ে গিলবে।

আমি বললাম, মার্থা অনেক কিছু জানে দেখলাম। বলল, পেট্রো ডলারের দেশ সৌদি আরবে তোমরা ভিখিরি এক্সপোর্ট করছ। কানা খোঁড়া, পঙ্গু—লেপার এদের মক্কার পথে পথে ফিরি করছ। ক্যামেল রেসের জন্য দুধের শিশুদের তোমরা মিডল ইস্টে পাঠাচ্ছ। আর ফ্লেশ ট্রেডের তো কথাই নেই—পৃথিবীর সমস্ত রেড লাইট এরিয়ায় শুধু ইন্ডিয়ান

সাবকনটিনেন্টের টিন এজ বেশ্যারাই ফিফটি পার্সেন্ট, লেটেস্ট একসপোর্টের কী আইটেম সেটা দেখতে এসেছিল মার্থা। আমরা নাকি এখন হিউম্যান অর্গান বিক্রির একটা ফলাও কারবার ফেঁদে বসেছি। শরীরের কলকব্জা যা পার বের করে বেচে দাও। ফরেন মানি, ডলার ঘরে তোল।

মার্থার একটা রিপোর্ট ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়েছিল আমেরিকান রিপোর্টারে, তারপর মেলবোর্ণ টাইমসে। রিপোর্টে তোর নাম ছিল, বরদা ভবনের কথা ছিল। তুই আমার যময ভাই, একটা হাজার স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট, একটা মারুতি গাড়ি— আর কয়েক লাখ টাকার জন্য শরীরের সমস্ত কিছু বেচে দিচ্ছিলি? ফোঁচফোঁচ করে বিদেশ নাক টানছিল—কাঁদছিল। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। মাথায় একটা ডাণ্ডার চোটে তোর এতটা বুদ্ধিভ্রংশ হল।

আমি বললাম, আমার আবার বুদ্ধি ছিল কবে বল? তুই ভাল ছাত্র ছিলি, এখন কত বড় চাকরি করছিস। রামদাস হনুমানদাসে লক আউট, প্রেস থেকে টাকা পাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। দুবার ক্যানিংয়ে গেলাম, বাবার সঙ্গে দেখাই হল না। তুইও তো খবর রাখতিস না, আগে হয়ত একটু আধটু খবর পেতাম। গত দুতিনবছরে কোনো খবর পাইনি।

তোকে আমার সলিসিটর ফার্মের খবর দিয়েছিলাম, গতবার এসে।

আমি বললাম, সে তো চারবছর আগে। কোথায় হারিয়ে ফেলেছি, তার ঠিক আছে।

বাবা তো যোগাযোগ রেখে গেছে—তোর নাম, বরদা ভবন আর সি.এন.এন নেটওয়ার্কে তোর ছবি দেখে আমি ভার্মাকে ফ্যাক্স করি। তোর ছবির একটা কপি কাঠখড় পুড়িয়ে যোগাড় করে সেটাও পাঠাই। মাস তিনেক হল ইন্ডিয়ায় বসে আছি—মাঝে দুবার একটু সিঙ্গাপুর আর মেলবোর্ণ ঘুরে এসেছি। ভার্মা এই কদিন আগে, ইউনিভার্সাল নার্সিংহোমে তোকে দেখেছে, তুই নাকি অর্গান বিক্রির চুক্তিতে সই করেছিস।

আমি বললাম, কোন ভার্মা—ইউনিভার্সালে যে লোকটা কোন এক বিদেশি কোম্পানির হয়ে আমাকে কিনে নেওয়ার অফার দিয়েছিল?

বিদেশ বলল, হ্যাঁ সেই ভার্মা—রাসকেল, তোকে এই অর্গান বেচার বুদ্ধিটা দিল কে?

আমি বললাম, আমার এজেন্ট কমল পাকড়াশি। কিন্তু তোর এজেন্ট, ওই সলিসিটর ভার্মা কার জন্য আমার অর্গান কিনছিল, তোর জন্য—তোর কোনো কোম্পানির জন্য। বিদেশ বলল, সিলি। আমার যে একেবারে ইনটারেস্ট ছিল না তার নয়। তবে এখন আমার হাতে অনেক অনেক প্রোপোজাল, অনেক এম. ও ইউ মানে মেমোরেণ্ডাম অব আনডারস্ট্যানডিংয়ের খসড়া। সুন্দরবন এলাকায় প্রণ কালটিভেশন—হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড। পাশাপাশি টুরিস্ট রিসর্ট— দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে হোভারক্র্যাফট চলবে। বীচ রিসর্ট হিসেবে খুব আহামরি না হলেও চলে যাবে। আপাততঃ পাঁচশো বিয়ে জমি, ভেড়ি তো গণনাথ চাটুজ্জেই দিচ্ছে। আমি বললাম বাবা? বাবার এত জমি আছে? বিদেশ বলল বটকৃষ্ণ নস্করের বেনামি জমি—এখন সবটাই বাবার হাতে। ভাগিদার টাগিদার কোনো সমস্যা হবে না—লোকাল এম.এল এ বলেছে। কলকাতার ছেলে, এন আর আই সরাসরি ফরেন ইনভেস্টমেন্ট আনছে, তাও পুরোপুরি এক্সপোর্টের জন্য, গভরমেন্ট বলছে গো এ্যাহেড্।

আমি বললাম জাহাজের কাজটা তুই ছেড়ে দিবি? ছেড়ে দেব কেন? ম্যাগীদের কোম্পানিতে তো আমিও একজন ডাইরেক্টর। এখানে গভীর জলে মাছ ধরব—ডিপ সী ফিসিংয়ের জন্য দুটো ট্রলার অপারেট করবে ভাইজাগ থেকে।

বিদেশকে আমি চিনতে পারছিলাম না, আমার মাথার মধ্যে আবার সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। বিদেশ আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল—বলল, এই সদা তোর কষ্ট হচ্ছে? আমারও হচ্ছে। কিন্তু কী করা যাবে বল, জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া—এত পরিবার, লক আউট কারখানার গেটে এত শ্রমিক লক্ষ লক্ষ বেকার—এরা যাবে কোথায়। দে উইল হ্যাভ টু সেল দেমসেলভ। বিশ্ববাজারে অফুরন্ত যোগানের ক্ষেত্র তৈরি হয়ে আছে। হ্যাঁ মানুষের শরীরের কলকব্জা কেনা বেচার ব্যবসার কথাটা পৃথিবী জুড়ে অনেক কোম্পানিই ভাবছে। আমিও যে ভাবিনি তা নয়। কিন্তু জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফ এণ্ড ট্রেডে এ ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ কিছু নেই—লেনদেনটা একটু গ্রে এরিয়ায়। তার আগে ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, নেপাল শ্রীলঙ্কায় আমার কোম্পানিকে একটা বেস তৈরি করতে হবে। কিছু এম. ও ইউ সই করতে হবে। তারপর হিউম্যান অর্গানের বাজারটা যদি খোলে—তখন দেখা যাবে। চাহিদা থাকলে, যোগান আসবেই—এটাই মার্কেট ইকনমি। আর বাজার থাকলে কেউ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। সেটাই ওয়ার্লড ট্রেড অর্গানাইজেশনের মূলমন্ত্র। শিস দিতে দিতে বিদেশ চলে যাচ্ছে।

আমার শরীরের ভেতর পাক দিয়ে নাড়িভুঁড়ি উঠে আসতে চাইছে। মুখে তেতো জল উঠে এল খানিকটা। মুখের ওপর হাত চাপা দিয়েও আমি বমি সামলাতে পারলাম না।

মোহানার দিকে এগিয়ে চলেছে গাধাবোটটা। বেশ কিছু খড়ের মানুষ, তাদের চামড়ার নীচে খড়ের সোনালি কুঠি দেখা যাচ্ছে। ডেকের ওপর নানা রকম প্যাকিং বাক্স, অতিকায় কাঁচের বয়াম, বস্তা। একটা বস্তার গায়ে মনে হল রক্তই, কালো পাঁশুটে রঙের, চাপ বেঁধে জমে আছে আঁশটে গন্ধ। একটা বড়সড় মাটির জালা, মুখ চাপা দেওয়া মাটির সরা দিয়ে। হাত দিতেই একজন খড়ের মানুষ কাঁধে হাত দিল। খুলতে নিষেধ করল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন, কী যাচ্ছে এতে? খড়ের মানুষ বলল, সওদা, অনেক কিছু, কঙ্কাল, মানুষের মাথার খুলি, কলজে, পাকস্থলি, আস্তলাশ আছে—কবর থেকে তোলা।

একেবারে সামনে রেলিংয়ের সামনে মাথায় টুপি, খালি গায়ে রঙীন সর্টস পরা পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো সাদা সোজা একজন খড়ের মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। খানিকটা তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য, খানিকটা বুক ভরে বাতাস নেওয়ার জন্য আমি গাধাবোটের কিনারায় রেলিং ধরে দ্রুত এগিয়ে গেলাম। সামনের রেলিংয়ে দাঁড়ানো সেই লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। আমি চমকে উঠলাম, কতবছর তোকে দেখিনি, বিদেশ—তুই এখানে এভাবে গাধাবোটে। তুই খড়ের মানুষ হয়ে গেলি কি করে?

বরদা ভবনের বেশ খানিকটা বদল হয়েছে। সামনের দেড়খানা ভাঙা থাম, পুরোপুরি ভেঙে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের আর প্রাণকাকার ঘরের সামনে দিয়ে কুড়িফুট লম্বা রোয়াকটা কয়েক জায়গায় ভাঙাচোরা থাকলেও মোটামুটি পরিষ্কার, তকতকে। সামনে দুটো বাঁশের খুঁটিতে টিনের ওপর রঙিন বিজ্ঞপ্তি। মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে বরদা ভবন দাগ নম্বর ১৩৫৯/২ খতিয়ান নম্বর ২৩ এর সতের কাঠা সাত ছটাক জমি এবং

তার নয়কাঠা দু ছটাক জমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বিল্ডিংয়ের কোনো অংশই বিক্রয় ভাড়া বা অন্য কোনো ভাবে ব্যবহার করা যাইবে না। ২রা জুলাই, ১৯৯১ তারিখে যাহা যে অবস্থায় ছিল—সেই অবস্থাতেই থাকিবে। অনুমত্যানুসারে ডি.কে ভার্মা, সলিসিটর।

বিদেশ কয়েকদিনের জন্য বোম্বে গেছে। মালতি বলেছে, শোয়ে থাকার আগে একবার বরদা ভবনে এসে দেখা করে যাবে, পারলে মানুপিসীকেও সঙ্গে নিয়ে আসবে। সলিসিটর ফার্মের একটি লোক নাম বলল অনন্ত রায়, সকালে বাঙ্গুর হাসপাতাল থেকে রিলিজের ব্যবস্থা করে আমাকে বরদা ভবনে পৌঁছে দিয়ে গেল। রামপদ জ্যাঠার ছোট ছেলে অধীরের বউ শীলা এসে ভেতর দিক থেকে দরজা খুলে দিয়ে গেল। বলল, ভেতর দিয়ে একটা যাতায়াতের ব্যবস্থা। এখনতো আপনি, আমরা আর অশ্বিনী খুড়ো ছাড়া আর কেউ নেই। বাইরের দিকে তালা দিয়ে আটকালে, আমরা ভেতর দিক থেকে টেরও পাব না। দরজাটা দেখলাম বেশ মজবুত করেছে—একটা খিল, দুটো হুড়কো। ঘরটাও রঙ হয়েছে—খাটটাও। বিছানা চাদর সবই নতুন।

শীলা বলল, বিদেশ ঠাকুরপোই সব করে দিয়ে গেছে। বলছিল হাইকোর্টে ইনজাংশন পেয়েছি পুরোপুরি সব মিটতে ছমাসও লাগতে পারে, ছবছরও লাগতে পারে।

শীলা পাখা চালিয়ে দিল। অনন্তকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, বসুন। চা খাবেন তো।

শীলা চলে গেল। অনন্ত বলল আপনার ভাই বরদা ভবন কিনে নিচ্ছেন—গোটাটাই, আপনি জানেন? বিছানায় শরীর এলিয়ে দিতে দিতে দেখলাম সিলিংয়ে নতুন ফ্যান—একটা টিউবলাইট, সুন্দর ছোট্ট ব্র্যাকেটে একটা নাইট ল্যাম্প।

আমি চোখ বুঁজে, খানিকটা হাঁফ সামলাতে সামলাতে বললাম, কই বিদেশ তো কিছু বলেনি।

অনন্ত রায় বলল, না যাকে পুরোপুরি কেনা বলে, সেরকম নয়। গত তিনমাসে আমরা আপনার বাবার কাছে দুবার গেছি—প্রথমবার আপনার ভাইও গিয়েছিলেন, পরের বার আমি একা। জমিজমার ব্যাপারটায়—এই বয়সেও ওর মাথা খুব পরিষ্কার। প্রায় সাড়ে পাঁচশো বিঘে জমি আর ভেড়ি মিলিয়ে উনি আপনাদের দুভায়ের নামে দানপত্রর কাগজ তৈরি করেই রেখেছিলেন। ওগুলো বেনামিতে ওঁরই দখলে ছিল। পনের বছর চাষ আবাদ করে উনি প্রায় দশ এগারো লাখ টাকা নিজের নামে রেখেছেন দুতিনটি ব্যাংকে। সেগুলোরও দাখিল দস্তাবেজ আমাদের ফার্মেই দিয়েছেন। বরদা ভবনে ইনজাংকশনটাও আমরাই মুভ করেছি। অন্ততঃ টু থার্ড প্রপার্টি নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই—আমরা ইনজাংশন পেয়ে গেছি। আমিই আপনাদের লইয়ার কিনা, আমি সবটা জানি।

শীলা চা নিয়ে এল। একই বরদা ভবনের সামনের দিক, পেছনের দিক। রামপদ জ্যাঠা আমাদের শরিক না ভাড়াটে আমার সঠিক জানা নেই। প্রাণকাকা দুঘর ভাড়াটে বসিয়েছিল। তার মধ্যে একঘর তো উঠে চলেই গেছে। থাকার মধ্যে একা অশ্বিনী খুড়ো একা পড়ে আছেন। বিয়ে থা করেননি, ব্যাচেলর। বরদা ভবন বিক্রি হয়ে গেছে শুনে বলেছিলেন, তাহলে কলকাতার মায়া কাটাতে হবে। হয় মফস্বলে কোথাও ঘর বাড়ি খুজব না হলে কোনো ওলড এজ হোমে চলে যাব। কদিনই বা বাঁচব। রামপদ জ্যাঠার সঙ্গে দেখা নেই বহুকাল। শীলাকে কি আমি বউদি বলতাম, না শীলা বলতাম। অধীর তো মোটে তিনবছরের বড় আমার চেয়ে। শীলা

বলল, যা দরকার বলবেন সদা ঠাকুরপো। আর বিদেশ বলে গেছে, যতদিন পাকাপাকি কিছু না হয়, ততদিন দুবেলা আমাদের সঙ্গেই খাবেন। চা জলখাবারও আমাদের সঙ্গে।

অনন্ত রায় কিছু টাকা দিয়ে গেছে—বিদেশের অ্যাডভাইসে আপাততঃ আড়াই হাজার টাকা। রসিদে সই করে দিলাম।

শীলা বলল, উঃ আমরা কী দুশ্চিন্তাতেই যে ছিলাম। দুটো মাস একটা লোকের পাত্তা নেই। ঘরের দরজা হাট করে খোলা—কোথায় গেল লোকটা। আমরাই থানায় ডাইরি করি। পুলিশের সঙ্গে কথা বলে, ভেতর দিক থেকে তালা দিয়ে দিই। আপনার স্টীলের ট্রাঙ্কটা আমাদের ঘরেই রাখা ছিল আজ সকালে দিয়ে গেছি। খাটের নীচে ঢোকানো আছে। পাশের ঘরে কাঠের আলমারিটা আছে। টুকিটাকি কয়েকটা জিনিশ দরকার ছিল। বিদেশ ঠাকুরপো টাকা দিয়েছিল, কিনে নিয়েছি। কাপ প্লেটগুলো সরিয়ে নিতে নিতে শীলা বলল, মালতি ঠাকুরঝি দুতিনবার এসেছিল আপনার খোঁজ নিতে, দেখা হয়েছে?

বিছানায় উঠে বসতে বসতে আমি বললাম, হ্যাঁ। বাঙ্গুর হাসপাতালে গিয়েছিল মালতি বিদেশের সঙ্গে। আজ বিকেলের দিকে আসতে পারে।

আপনার ট্রাংকে মালতির কিছু ছবি আছে—বোম্বের। খুব সুন্দর, তাই না? আমি বললাম ওগুলো মিস সরিতার ছবি। শীলা বলল ঠাকুরঝির তিনটে হিন্দি সিনেমা আমি দেখেছি। ছোট পার্ট। মালতি ঠাকুরঝি একটা ছবিতে কতকগুলো যণ্ডা লোকের সঙ্গে দারুণ নেচেছিল। ছবিটার নাম ময়দান ই জঙ্গ লড়াইয়ের মাঠ।

দুপুরে একটা ভাত ঘুমের পর বিকেলে শুধু মালতির জন্য প্রতীক্ষা। লড়াইয়ের মাঠে মালতি নেচেছে—মালতি নয় মিস সরিতা। কিসের লড়াই? আমরা হনুমান দাস রামদাসের তালবন্ধ গেটে অথবা মিটিংয়ে মিছিলে যে লড়াই নিয়ে স্লোগান দিতাম হিন্দি ফিলমে এটা কি সেই লড়াই? এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে। কার লড়াই, কে লড়ছে কার জন্যে। সবাই তো নিজের নিজের জন্য লড়ছে। এমন ময়দানে মিস সরিতা একদঙ্গল যণ্ডা লোকের সামনে বেআব্রু শরীর দুলিয়ে নাচছে কেন?

সন্ধে গড়িয়ে গেল, মালতি এল না। অবিনাশদা এল, সঙ্গে ফার্ণেসের হেডম্যান সীতাপতি আর হনুমান দাস ফাইণ্ড্রির ফোরম্যান উজ্জ্বল সমাদ্দার।

হাসপাতালেই গিয়েছিলাম, বলল আজ সকালেই রিলিজ করে দিয়েছে—সীতাপতি বলল। সীতাপতির চুল অনেকটা সাদা হয়ে গেছে—গনগনে আগুনের তাতে শরীরটা আরও পাকিয়ে গেছে। বলল, ঘুষুড়ির দিকে একটা বন্ধ রোলার মিল চুক্তিতে নিয়েছি। উজ্জ্বল একটু দেখেশুনে দিচ্ছে। বন্ধ কারখানার চাকা ঘুরিয়েছি—কোনোরকমে, কতদিন রাখা যাবে, জানি না।

ব্যাংকের দেনা, পাওনাদারের তাগাদা তার ওপর বাজারের কমিপিটিশান।

অবিনাশদা বললেন, তুমি একটু সাহায্য করলে, কারখানাটা ঠিকমত চালানো যায়, চল্লিশ পঞ্চাশটা লোকের রুজি রোজগারটা ঠিক থাকে। আমি বললাম, এতে আমার কি করার আছে? অবিনাশদা বললেন, তুমি যদি বিদেশ চ্যাটার্জী মানে তোমার এন আর আই ভাইকে বলে একটা ইনভেস্টমেন্টের ব্যবস্থা করতে পার।

আমি বললাম, বিদেশ তো বোম্বে গেছে। আপনারা চাইলে ওর সলিসিটর ফার্মের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

অবিনাশদা বললেন, ব্যারিস্টার ডি.কে. ভার্মা তো। আরে বরদা ভবন নিয়ে হাইকোর্টের অর্ডারের বিজ্ঞপ্তি খবরের কাগজে বেরবার পরই তো জয়সোয়াল ছুটতে ছুটতে আমার কাছে আসে।

অবিনাশদা বললেন, সেই যে হাওড়ার এক কালোয়ার—হনুমানদাস রামদাস ফাউন্ড্রি যখন শেষবার বন্ধ হয়, তখন জয়সোয়াল কিনতে চেয়েছিল। কাজটা এগিয়েও গিয়েছিল অনেকটা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হল না কিছুই। কারখানা বেচার ইস্যুতে ইউনিয়ন দুভাগ হয়ে গেল। ওয়ার্কারদের মাইনে বাকি, বোনাস বাকি—সরকার বলল কে সেসবপাওনা মেটাবে আগে ঠিক হোক, তারপর কারখানা বিক্রির কথা। জয়সোয়াল বলেছিল, কারখানা চালু হয়ে গেলে, সে ধীরে ধীরে পাওনাদার, ওয়ার্কারদের বোনাস সব মিটিয়ে দেবে। ইউনিয়নে নির্মলদের গ্রুপটা বলল, হবে না। আমি সরে গেলাম।

উজ্জ্বল বলল, গ্যাট চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ট্রেড ইউনিয়নের ব্যাপারটা নতুন করে ভাবতে হবে। আরে, কারখানাই যদি না খোলে, কীসের মাইনে কীসের বোনাস?

সীতাপতি বলল, তুমি তো বলবেই—মুরব্বির জোরে তুমি এখন ব্রডগেজ আয়রন ইন্ড্রাস্ট্রির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। মাসে সাত হাজার টাকা মাইনে, বাড়ি গাড়ি টেলিফোন।

উজ্জ্বল সমাদ্দার মলিন হাসল, বলল সরকারি আণ্ডারটেকিং। সাত হাজার টাকায় লোক পাবে কোথায়? গুজরাটে যে কারখানায় আমি ছিলাম, ওভারটাইম নিয়ে দশহাজার টাকা পেতাম। বাবা মা জেদ ধরলেন ঘর সংসার করতে হবে, কলকাতায় ফিরে আসতে হবে।

অবিনাশদা একটা সিগারেট ধরালেন, বললেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হচ্ছে—এখন পশ্চিমবাংলাব ছেলেদের ঘরে ফিরতে হবে। যেমন তোমার ভাই। বিদেশ—সেতো এন. আর আই—ঘরে ফিরতে চাইছে। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এখন রীতিমত এন আর আইদের লাইন পড়ে যাচ্ছে। এবেলা ওবেলা গাদা পাদা এম.ও.ইউ সই হচ্ছে। এই অবস্থায় উজ্জ্বল, আমাদের ছেলে, ঘরে ফিরতে চাইছিল, একটা ব্যবস্থা করে দিলুম আর কি!

অবিনাশদা বললেন, জয়সোয়াল বরদা ভবন কিনেছে। আমার কাকা প্রাণনাথ নাকি বিশ হাজার টাকা এ্যাডভান্সও নিয়েছে। দুই ভাড়াটের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে কে এক কাজেরিয়া নাকি তিন চারটি ঘরে তালা মেরে দিয়েছে, একটা গার্ডও পোস্ট করে দিয়েছে।

সীতাপতি বলল, তুমি যে জয়সোয়ালকে ব্যাক করছিলে সেটা বল। আর জয়সোয়ালের লোকেরাই যে বিদেশের মাথায় ডাণ্ডা মেরেছিল সেই কথাটা বল। অবিনাশদা একটু কুণ্ঠিত হেসে বললেন, আসলে হয়েছে কি জানো? জনসংযোগের অভাব। পার্টি একটার পর একটা দলিলে জনসংযোগ বাড়াতে বলছে। আমরা বাড়াচ্ছি? আমরা যে যার মত বসে আছি, না হলে শুধু নিজেরটুকু দেখছি। আমি জানব কী করে যে বরদা ভবনে তুমিই মানে আমাদের স্বদেশই নুলো কার্তিক আর পলটার টার্গেট।

আমি বললাম নুলো কার্তিক মানে যে সেই পেটো বাঁধত।

না, না আজকাল আর পেটো বাঁধে না, সে এখন দমদম মিউনিসিপ্যালিটির

কাউনসিলর। আমি ভাবছি পল্টা মানে আমাদের পুরনো কমরেড মদন হাঁসদার ছেলে, নতুন উঠছে—ছাত্র যুব করে। সে তোমাকে না চিনতে পারে, কিন্তু নুলো কার্তিকের ভুল হল কি করে। সে তো শিবু মজুমদারের সাগরেদ ছিল। বছর তিনেক বেকার ছিল, তারপর আমরাই বলে কয়ে—আমি বললাম, নুলো কার্তিক হলে আমি চিনতাম, ও ডাণ্ডা মারেনি। পল্টা না কি বললেন সে থাকতে পারে, দুটো ছেলে এসেছিল মোটর বাইকে চেপে—

না, না কার্তিক এখন ওসব কাজ করেনা। ও ডাণ্ডা মারবে কেন? আর তুমি দুটো ছেলে বলছ, ওর ডাকে তোমাদের এই এলাকায় এখনই দুশো ছেলে জমা হয়ে যাবে। কার্তিক আসলে জয়সোয়ালের ব্যাপারটা দেখছিল। বুঝতেই পারছ—ক্লাবের এই বেকার ছেলেগুলো কী করবে? ওই বাড়িভাড়া, ফ্ল্যাট কেনাবেচার দালালি—যা দু'চারটাকা হয়। দেশের এতবড় যুবশক্তি, কিভাবে অপচয় হচ্ছে। যাই হোক, তুমি পুরনো কমরেড—তোমাকে আর কি বলব? বিদেশ চ্যাটার্জী এন আর আই—টাকা আছে, দেশের সরকার, প্রশাসন পুলিশ তার পেছনে দাঁড়াবে। তবু জয়সোয়াল আর কার্তিকদের ইনটারেস্টটা একটু দেখো। জনসংযোগের অভাবেই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেছে।

আমি বললাম, ফাটা জায়গাটা থেকে এখনও মাঝে মাঝে রস গড়ায় অবিনাশদা। অবিনাশদা বললেন সব ঠিক হয়ে যাবে। উজ্জ্বল সমাদ্দার হঠাৎ বলল, আচ্ছা মার্থা মেয়েটা কে বলতো? আমার এক বন্ধু, এখন বিলেতে আছে, বলছিল সেইই নাকি, ইউনিভার্সাল নার্সিংহোমের হিউম্যান অর্গান কেনাবেচার ব্যাপারটা বাইরে ফাঁস করে দিয়েছে।

আমি বললাম, তুমি ইউনিভার্সালের কথা জানলে কী করে?

বাঃ আমি আর অবিনাশদা গিয়েছিলাম না। পুলিশ তো তোমার স্টেটমেন্ট নিয়ে যত মিঠুনমার্কা চুলের অল্পবয়েসী ছেলে ছিল, ধরে নিয়ে গিয়েছিল। কার্তিকদাকে অবশ্য এ্যারেস্ট করেনি—পল্টা, ট্যারা ফণী আরও ছ সাতজনকে পুলিস তুলে নিয়ে গিয়েছিল। অবিনাশদা তখন কলকাতায় ছিলেন না। ফিরে এসে উনি খবব পেয়ে ইউনিভার্সাল নার্সিং হোমে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন। ওরা বলল স্বদেশ চ্যাটার্জী বলে এখানে কেউ নেই। পল্টারা জামিন পেয়ে গিয়েছিল। পুলিশ বলল চেপে যান। কিন্তু অবিনাশদা বারবার বলেছিলেন, জনসংযোগের অভাবে কী কাণ্ডটা হয় দেখ।

অবিনাশদা বললেন, আর মার্থা না কি মেয়েটাকে দ্যাখ—সাত সমুদ্র পেরিয়ে এসে ইউনিভার্সাল নার্সিংহোমের হাঁড়ির খবর নিয়ে চলে গেল। আর নার্সিংহোমই বা কেমন, আমাকে বলে দিল স্বদেশ বলে কেউ নেই—আর এই মার্থা নগ কি যেন তাকে সব দেখিয়ে দিল।

আমি বললাম, ইউনিভার্সাল নার্সিংহোম হয়ত ভাল দিকটাই দেখাতে চেয়েছিল, মার্থা খারাপটাও জেনে গেছে।

উজ্জ্বল সমাদ্দার বলল, আমার মনে হয় লোকটা সি.আই এর চর।

সীতাপতি হঠাৎ বলে উঠল, অবিনাশদা কে.জি.বির নাম একদম শুনিনা, ওরা কি উঠে গেছে?

অবিনাশদা আর উজ্জ্বল বেরিয়ে গেলে সীতাপতি আমার খাটের কোণা ঘেঁষে বসল। একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলল, মেরেই ফেলত তোকে। তুই বিশ্বাস করিস

নুলো কার্তিক, অবিনাশদা জানত না যে লোহার ডাণ্ডাটা তোর মাথাতেই পড়বে।

আমি চোখ বুঁজে রইলাম—মাতার ভেতর গুড়গুড় করে কেমন যেন শব্দ হচ্ছে—ভূমিকম্পে মাটি সরে গেলে বোধহয় এরকমই হয়।

মাথাটা কলের কাছে নামিয়ে নিয়ে এসে সীতাপতি বলল, মালতি ফিরে এসেছে জানিস।

আমি চোখ মেললাম, মালতির সঙ্গে ইতিমধ্যে যে বাঙ্গুর হাসপাতালে দেকা হয়েছে, সে কথা বললাম না।

মালতিকে তুমি চিনলে কী করে? আমি উঠে বসতে বসতে বললাম।

বাঃ, তোমাদের বাড়িতে দেখেছি—দুবার তোমার সঙ্গে কারখানার বিশ্বকর্মা পুজোয় গিয়েছিল। সুন্দরী মেয়েদের আমি সহজে ভুলি না। সেদিন একটা বারে গিয়েছিলাম, ব্লু হেভেন—দেখলাম কে একজন ক্যাবারে নাচছে, মিস সরিতা না কি যেন নাম, আমার চোখকে ফাঁকি দেবে কি করে। আমি মনে মনে বললাম, হতেই পারেনা—এ মালতি শিবু মজুমদারের বোন মালতি।

আমি বললাম, শিবুদা এখন কোথায় বলতে পার? বেঁচে আছে না মরে গেছে জানো?

সীতাপতি বলল, ঘুষুড়ির কারখানাটা নিয়ে এমন ঝামেলায় পড়েছি না কী বলব? আমার জনসংযোগ একদম নেই—আমি কিছুই জানি না।

দলিল

ঠিকানা খুঁজে সীতাপতির ঘুষুড়ির ঢালাই কারখানায় গেলাম একদিন। সীতাপতি অবশ্য উজ্জ্বল সমাদ্দারকে নিয়ে একদিন এসেছিল, অবিনাশদাই নাকি ওদের বলেছিলেন, আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। হনুমানদাস রামদাস মাঝে একবার খুলেছিল, জয়সোয়াল বলে হাওড়ারই এক কালোয়ার কারখানাটা চালাবার চেষ্টা করেছিল। মাসখানেক কারখানা চলল, লেবাররা পনের দিনের মজুরি পেল, বাকিটা পেল না।

আমি বললাম অবিনাশদা বোধহয় এর কথাই বলেছিল। উনি নটি বরদাভবন কিনতে চেয়েছিলেন—সতের আঠারো কাঠা জমির ওপর পাঁচতলা এ্যাপার্টমেন্ট তৈরি করবার পরিকল্পনা ছিল। কে বেচল, উনিই বা কিভাবে চিনলেন, আমি কিছুই জানি না, ঠাকুরদার বাবার তৈরি বাড়ি, থাকি তার দেড়খানা ঘরে, আমি উচ্ছেদ হয়ে গেলাম।

উজ্জ্বল সমাদ্দার বললেন, ওসব তো পুরনো ব্যাপার। এখন পশ্চিমবাংলাতেও পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। বলতে পারেন গ্যাটের লিবারাইজেশনের ফলশ্রুতি। হলদিয়ায় পেট্রো কেমিক্যাল হচ্ছে, বক্রেশ্বরে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে, শিলিগুড়ি পর্যন্ত এক্সপ্রেওয়ে হচ্ছে, ওদেশের মত একশো কিলোমিটার স্পিডে গাড়ি চলবে। আর এই ট্রানজিশন পিরিয়ডে দু-একটা ছোটখাটো

ঝামেলা লেগেই থাকবে। আপনার মাথা ফাটবে, আস্ত মানুষ বিক্রি হয়ে যাবে, তার শরীরের কলকব্জাগুলোর একসপোর্ট বাজারের জন্য, ঘরের মেয়ে বউ বেশ্যা হয়ে রাস্তায় দাঁড়াবে—পুঁজির উত্তরণ পর্বে এসব হয়ই। এখন গোটা দেশ সমাজ কীভাবে রিয়্যাক্ট করে সেটা দেখতে হবে। বিশবছর ধরে আমাদের ভোটব্যাংক অটুট থেকে গেছেন, অথচ দেখুন পৃথিবী জুড়ে নামজাদা ব্যাংকগুলো ফেল পড়ে যাচ্ছে। পুঁজিবাদ একটা হাতিয়ার সমাজতন্ত্রে অটুট আস্থা রেখে, গমতান্ত্রিক পরিকাঠামোর মধ্যে, মোদ্দা কথা সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে থেকে এখন গ্যাটকে, ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি দেখতে হবে।

আমি উজ্জ্বলকে বললাম, আপনি একইরকম আছেন, সেই হনুমানদাস আপনি যখন আমাদের ফোরম্যান ছিলেন। তখনও দেখেছি—আপনি চমৎকার গুছিয়ে বলতেন। একটু মোটা হয়েছেন। একটু চক্‌চকে—সেটা বাদ দিলে, আপনি আগের মতই। তখনও আপনার কথা শুনে আমি অভিভূত হয়ে যেতাম, এখনও তাই। সবটা যে বুঝলাম তা নয়, তবু মনে হয় আপনি ঠিকই বলছেন। আমার মাথা কাটা কিংবা বন্ধ কারখানার দুপাঁচটা শ্রমিকের আত্মহত্যা এতে খুব একটা বদল হবে না গ্যাট চুক্তির।

সীতাপতি শক্তপোক্ত আগের মতই, পাকানো শরীর, দড়ির মত শক্ত হাতের মাখন। গনগনে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে ও লোহা গলায়। পুড়ে ঝাঁপরা হয়ে দিনের শেষে একটু শীতল হওয়ার জন্য ও মদ খায়, মেয়েছেলের কাছে যায়।

সীতাপতি বলল, উজ্জ্বল সমাদ্দার এখন কেউকেটা লোক। হনুমানদাস ছেড়ে চলে যাবার বছরখানেকের মধ্যেই ফিরে এসেছে। এখন ও একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির পুরো সময়ের ডিরেক্টর—মোটা মাইনে, বাড়ি, গাড়ি—টেলিফোন সব আছে।

উজ্জ্বল একটু লজ্জা পেল, বলল—তেমন কিছু নয়। নিজের জায়গা ছেড়ে বাইরে গিয়ে খুব একটা ভাল লাগছিল না, তারপর দুম করে বিয়েটা সেরে নিতে হবে—কলকাতারই মেয়ে, আগে থেকে চেনাজানা ছিল, মেয়েদের একটা স্কুলে পড়ায়।

নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সীতাপতি একসময় আমার এই ঘরে বসেই অনেকদিন পরে চিৎকার করে বলেছিল, বললেই হল, করত তো তোর শিবুদার দলে রাজনীতি—এস.সি.ই পাশ, হনুমানদাসে ফোরম্যানের চাকরি করত। লক আউটের সময় বড় বড় ঠুলি পেড়ে চলে গেল গুজরাট। মাইনে বেশি, কাজটা ফোরম্যানের নীচে, ফিরে এসে সরকারি আণ্ডার টেকিংয়ের ডিরেক্টর—বাড়ি গাড়ি বউ। ও কাকে বিয়ে করেছে জানিস?

আমি বললাম, না। সীতাপতি কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল—কালিপদ রায়ের মেয়ে। কালিপদ রায় বিশাল নেতা। দিল্লীর উঁচুমহলে যাতায়াত আছে।

ঘুষুড়ির কারখানায় সেদিন উজ্জ্বল সমাদ্দারও হাজির। চোট কারখানা—একটাই পুরনো দিনের ফার্নেশ। ক্যাপাসিটি তিরিশ চল্লিশ টন। নতুন ফার্নেশ বসাবার ব্যবস্থা হয়েছে। ব্যাঙ্কের টাকা, ইনডাসট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের টাকা সব স্যাংশনড্। এমনকি ইলেকট্রিক লাইনের টাকাও জমা পড়ে গেছে। এখন বাদ সাধছে পরিবেশ দপ্তর, হাইকোর্ট। হাওড়ার শিল্পাঞ্চলে নতুন করে ফার্নেশ বসাতে দেওয়া যাবে না।

আমি বললাম, এসব জটিল ব্যাপার, আমার কি করার আছে সীতাপতি দা।

সীতাপতি তার চুপড়ির মত একচিলতে অফিস ঘরের স্টীলের আলমারি থেকে একটা ফাইল এনে টেবিলে রাখল, বলল, আছে—অনেক কিছু করার আছে। পুরনো বন্ধু হিসেবে তো দাবি থাকতেই পারে, আমি তোমাকে পাঁচ পার্সেন্টের পার্টনার করে নিতে পারি আমার রোলিং মিলে। স্টোর দেখবে, বেচাকেনা দেখবে—মাসে হাজার তিনেক টাকা মানিপ্লাস প্রফিটের পাঁচ পার্সেন্ট।

গোটা ব্যাপাবটাই আমার কাছে হেঁয়ালি মনে হল। আমাকে পাঁচ পার্সেন্টের পার্টনার করলে, দূষণ সমস্যা—চিমনির ধোঁয়ার সমস্যা কিভাবে মিটবে আমি বুঝতে পারলাম না। আমার বিহ্বল অবস্থা দেখে উজ্জ্বল সমাদ্দার আমার চোখের সামনে ধবধবে সাদা দামি কাগজে টাইপ করা ফালিটা মেলে ধরলেন, বললেন, নাও লেট আস কাম স্ট্রেট টু বিজনেস্। এটাকে আপনি দলিলও বলতে পারেন—এম্ ও ইউও বলতে পারেন, মানে মেমরেণ্ডাম অব আনডারস্ট্যাণ্ডিং। আপনার ভাই আর আপনার সঙ্গেও আমরা একটা বোঝাপড়ায় আসতে চাইছি।

আমি বললাম, কী নিয়ে, বরদা ভবন নিয়ে। সীতাপতি অধৈর্য হাত নেড়ে বলল, আগে শোন তো ব্যাপারটা। নেহাৎ অবিনাশদা কথা বলতে বলেছিল তোর সঙ্গে, তাই। আমরা তো হাত তুলে বসে গিয়েছিলাম।

উজ্জ্বল বললেন, আসলে এফ.ডি.আই মানে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট কিংবা এন আর আই মানে নন্ রেসিডেন্ট ইণ্ডিয়ান কথাটার মধ্যে যাদু আছে। অজস্র সোনা দানা মোহর লুকনো আছে গুহাটায়—আপনাকে শুধু চিচিং ফাঁক শব্দদুটো বলতে হবে। সম্বাবনার দরজা আপনা থেকেই খুলে যাবে। আপনার ভাই বিদেশ চ্যাটার্জী আমাদের চাবিকাঠি, আমাদের চিচিং ফাঁক মন্ত্র। আড়াই থেকে পাঁচ কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট পেলেন, আমরা একটা ছোটখাটো মোট মডার্ন রোলিং মিলে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি। দেশের সরকার, জনগণ আপনার সঙ্গে আছে—আপনি শুধু দলিলটা একটু মিস্টার চ্যাটার্জী, আপনার এন. আর আই ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিন।

আমি সলিসিটর ফর্ম—মিস্টার ভার্মার কথা বললাম। সীতাপতি বলল দেখিয়ে নিস—তুই বা তোর ভাই তো আর আমার মুখের কথায় কাজ করতে চাইবি না, আমিও বলব না।

এম.ও ইউয়ের দলিলের ফাইলটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে উজ্জ্বল সমদ্দার বললেন, লেট আস সেলিব্রেট।

হাওড়ার জ্যামজট পার হয়ে আমরা পার্কস্ট্রিট সংলগ্ন একটা ছোটো গলিতে ঢুকলাম—গন্তব্য, একটা ছোটোখাটো রেস্তরাঁ, ব্লু হেভেন।

ট্যাক্সিতে আমার একপাশে উজ্জ্বল সমাদ্দার, আরেক পাশে সীতাপতি। উজ্জ্বল বললেন, আমরা নীল স্বর্গে যাচ্ছি।

সীতাপতি বলল—ব্লু হেভেন। ওখানে তোর মালতি আছে, ট্যাক্সিটা ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল। একটা অন্ধলোক, অন্ধজ নিশ্চিত—হাতে লাঠি ঠুক্‌ঠুকে নীল স্বর্গের রাস্তার মোড়টাতে রাস্তা পার হচ্ছে।

উজ্জ্বল সমাদ্দার হিসহিস করে বললেন—বাস্টার্ড, কলকাতায় লোকেদের রাস্তায় সেন্স এত কম, রাস্তা পার হতেও জানে না। এরাজ্যে শিল্পায়ন, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অসম্ভব।

আমি বললাম, আপনি কখনও খড়ের মানুষ দেখেছেন, শরীরের ভেতর থেকে মাল মশলা সব সাফ। ভেতরে শুধু ঘাস—বিচালি? খড়ের মানুষ।

নীল স্বর্গে পৌঁছবার আগেই উজ্জ্বল সমাদ্দারের চোখ ঘোলাঘোলা। আমি ভাবলাম, শুধু এম.ও ইউতেই এই। বিদেশ এখানে এলে না জানি কী হবে? ব্লু হেভেনের ভারি দরজা ঠেলে ঢোকামাত্র ঝিম্‌ঝিম বাজনা শুরু হয়ে গেল, আমার ছোট বেলার কথা মনে পড়ল। বাবা, মা—প্রাণকাকা, সোহাগখুড়ি— বিদেশ, আমি মুকুল পারুল আর মালতি আছে, গা ঘেঁসাঘেঁসি করে গ্যালারিতে— গ্রেট রোমান সার্কাস, শেষ দৃশ্য, ট্রাপিজের খেলা এখনই শুরু হবে। আলো নিভে গেল সব, শুধু আকাশ ছোঁয়া ঝোলানো চারটে ছোট ছোট প্লাটফর্মে নীল আলো এক আশ্চর্য্য, অপার্থিব স্বর্গ রচনা করল। মালতি অনেকক্ষণ ধরেই আমাকে খোঁচা দিচ্ছে কনুই দিয়ে, সোহাগবালা লক্ষ্য করেছেন—মালতি বলল, মামি আমার শরীর খারাপ লাগছে।

মামি, মানে আমার প্রাণকাকার স্ত্রী সোহাগ বলল, সদা—মালতিকে বাইরে নিয়ে যা। তখনই তিরতির রক্ত কাঁপানো রিমঝিম অর্কেস্ট্রা, আর সেই অদ্ভুত মায়াবি আলো—তিনতলা উঁচুতে এক শুচিশুভ্র সন্ধ্যায় ট্রাপিজের দোলনায় ঝুলে পড়ল। মালতি প্রায় দৌড়াচ্ছিল, চিৎকার করছিল সদা, আয়—আয় আমি মরে যাব, মালতি একটা নেটের কাজ করা সাদা ফ্রক পরেছিল। সম্ভবতঃ সাদা ছিল ইজের। টয়লেটে মেয়েদের ছবি আঁকা লেডিজ সাইনবোর্ডের নীচে পৌঁছতে পৌঁছতে, ওর পা বেয়ে রক্তের একটা ধারা নেমেছিল। শেষ শো, বাইরে কেউ কোথাও নেই, মালতীকে নিয়ে সার্কাসের তাঁবুতে ফেরার আগে আমি ওর বাঁ কাঁধের ওপর হাত রেখে আমার ওপর ওর শরীরের ভার ছেড়ে দিতে বলেছিলাম। আর তখনই ওর বড় সাদা মাটা সাদা ফ্রকের নীচে বাঁদিকের স্তনবৃন্ত আমার আঙুলে ঠেকছিল, তপ্ত ছোট্ট হীরের মত— শান্ত নীল স্বর্গের মত। মাইক্রোফোনে একজন কেউ চিৎকার করে বলল, মিস্ সরিতা। রক্তে স্নায়ুতে কাঁপন তোলা অর্কেস্ট্রার মুর্চ্ছনা ব্লু হেভেনের দেয়ালে দেয়ালে ঘাত প্রতিঘাত তৈরি করে, আমাকে ছুঁল—আমার স্নায়ুমগজকে। আমার একটা অদ্ভুত কষ্ট হচ্ছিল—টেবিলে হুইস্কির গ্লাস। ঘোষক আবার চিৎকার করে বললেন, ব্লু ফ্রম বম্বে—মিস সরিতা।

ফিসফিস করে সীতাপতি বলল, তোর মালতি। চড়া মেক আপ, চুলটাও মনে হয় পরচুল, ভালো করে দ্যাখ তোর মালতি।

গননাথ চাটুজ্যের পাঠানো মোটা লেফাফা খুলতেই একরাশ কাগজ বেরিয়ে পড়ল। কিছু বেশ নীল, দামি সাদা কাগজ হলদেটে হয়ে গেছে—মাথায় অশোক স্তম্ভ, আলিপুর রেজিস্ট্রি অফিসের ছাপ উনিশশো তিপান্ন সালের—দলিলের বেশ কিছু বটকৃষ্ণ নস্করের নামে, কিছু গণনাথের নামে। পাওয়ার অব এ্যাটর্নীতে সাক্ষরকারী দুজন বটকৃষ্ণ নস্কর আর তার মেয়ে প্রতিমবালা দাসী। গণনাথের নামে পাওয়ার দেওয়া আছে।

দলিল দস্তাবেজ ব্যাপারটা কোনোকালেই ভালভাবে বুঝি না—কয়েকটা দানপত্র গত এক বছরের বিভিন্ন তারিখ দেওয়া। সলিসিটর ভার্মা আমাকে কাগজগুলো দেখতে বলেছিলেন। সুন্দরবনের ভেড়িতে আমার এন.আর আই ভাই টাকা ঢালবে। চিংড়ির চাষ হবে, তারপর সেই চিংড়ি মাছ বিদেশে চালান যাবে। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরারও একটা প্রকল্প আছে ওদের—কুলপীতে নতুন বন্দর তৈরি হলেই সেখানে এসে বিদেশী ট্রলার নোঙর করবে। গণনাথের দানপত্র, দলিল দস্তাবেজের সুবাদে ভার্মা দেড় দুশো বিঘে ভেড়ি আর কমপক্ষে একশো বিঘে ধানজমি আমার ভাগে পড়বে। ঘন্টাখানেক কাগজপত্র ঘেঁটেও আমার বোধগম্য হল না, গণনাথ চাটুজ্জে, আমার বাবা কিভাবে এত বিশাল সম্পত্তি কবজা করে ফেললেন, তাও কিনা সুন্দরবন এলাকার নাড়ি নক্ষত্র জানা বটকৃষ্ণ নস্করের হাত থেকে। বউ পাগল হয়ে মানকুণ্ডুর উন্মাদ আশ্রমের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে মরেছে, শুনেছিলাম। বিয়ের বছর না ঘুরতেই মেয়ে প্রতিমাবালা বিধবা হয়েছে। খাঁড়িতে ঘাপটি মেরে থাকা ডাকাতরা মা ভৈরবীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এক কোপে বটকৃষ্ণর জামাইয়ের মাথাটা ওর ধড় থেকে আলাদা করে দিয়েছিল ডাকাতরা। মেয়েটাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বাদার জঙ্গলে। গণনাথ দেবের বশে সেখানে গিয়ে কি করে সহসা হাজির হয়েছিল, জানা নেই। শুনেছিলাম, গনাবাবু সন্ধের মুখে মেয়েটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে দু মাইল কাদা ভেঙে বাঁক পেরিয়ে যদি না নিজের বোটে উঠতে পারতেন, তাহলে বটকৃষ্ণর মেয়েকে বাঁচাতে পারতেন না। বাঘে খাবে বলেই এক মানুষ সমান উঁচু হেন্তাল আর গরানগাছের জঙ্গলে ডাকাতরা মালতিকে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। বটকৃষ্ণর জামাইকে পাওয়া গিয়েছিল, সারেংয়ের ঘরের কাঁচের দরজার সামনে। ধুতি পাঞ্জাবি পায়ে পাম্পশু সহ দশাসই শরীরটা যেমনকার তেমনি, একপাশে ডাবল ব্যারেল বন্দুকও যেখানকার সেখানেই—শুধু জামাইয়ের ঘাড়ের ওপর মুণ্ডুটি নেই। জোর জোয়ার ভাঁটা খেলা মাতলার খাঁড়ি—আশা করা গিয়েছিল, মুণ্ডুর খোঁজ পাওয়া যাবে, যায়নি। মৌসুনী না বাঘডাঙার এক বৃদ্ধ মাঝি বলেছিল, মাঝে মাঝে চাঁদনি রাতে বোটের পাশ দিয়ে দাদাবাবুর লঞ্চ মা ভৈরবি জল কেটে হুসহুস করে বেরিয়ে যায়, ওপরের কাঁচঘরে একটা মানুষের মূর্তি স্পষ্ট দেখা যায়—পাঞ্জাবি রক্তে ভেজা কোমর পর্যন্ত, মুণ্ডুটা নেই।

সে বড় উত্তাল সময়, ওইসব নোনা জলের ভেড়ি, বাদার আবাদী জমির আশপাশে কাঁচা হাতের হরফে পোস্টার, দেয়াল লিখন—জোতদারের গলাকাটা চলছে, চলবে। পুলিশ সন্দেহ করে মা ভৈরবীর কয়েকজন মাঝি মাল্লাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু খুন বা প্রতিমার গণধর্ষণের কোনো কিনারা হয়নি। অনুসন্ধানের জন্য মা ভৈরবীকে পুলিশ ডাঙায় তুলে অনেকদিন আটকে রেখেছিল। বছর দুয়েক পরে মা ভৈরবীর তখন কাঠামো ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই বটকৃষ্ণও বলেন, লঞ্চটা বেচে দাও। ওটা যতদিন থাকবে প্রতিমা সুস্থ হয়ে উঠবে না।

আমার বাবা গণনাথ চাটুজ্জে বড় বেশি সাদামাটা মানুষ। চিরকাল একই পোশাকে—হাফসার্ট, খাটো ধুতি—কমদামি পাম্পসু বা চটি আমি তাকে দেখে এসেছি। শরীরের গড়ন মজবুত, খোঁচাখোঁচা কাঁচাপাকা গোঁফ, প্রায় কদমছাঁটের মত করে ছাঁটা চুল। কোনোদিন

তাঁকে খুব হাসি খুশি উচ্ছ্বাসের মধ্যে দেখিনি, মায়ের সঙ্গেও তাঁকে দরকারের বেশি খুব একটা কথা বলতে দেখিনি। একটু বড় হয়ে মা আর বাবাকে পাশাপাশি শুয়ে থাকতে দেখিনি। আমি আর বিদেশ পাশের ঘরে, বাবা থাকলে তিনি তক্তাপোষে, মা মেঝেতে। প্রাণকাকারা অন্যরকম ছিল। কাকা সাজগোজ করে ফিটফাট বাবুটি হয়ে থাকতেন। মাকেও কোনদিন খুব একটা সাজগোজ করতে দেখিনি। দুয়েকটা হালকা পলকা সোনার গয়না ছিল, মা পরত না। বিদেশ খুব ঝুলোঝুলি করলে বলত, তোদের বউ আসুক, তখন পরব।

আমার সামনেই মানুপিসী একদিন বলেছিল, সেটা বোধহয় দুর্গাপুজোর ভাসানের দিন, ঠাকুর বরণ করতে যাচ্ছ, একটু সোনা গলায় দিয়ে যাও। সাজলে তো তোমাকে ভালই দেখায়।

মা বলেছিল, কার জন্য সাজব, এইতো আজ বিজয়া দশমীর দিন, ঠাকুর ভাসান যাচ্ছে, ওনার পাত্তা আছে?

বাবা বলতেন, পুরুষ মানুষের অত বাড়িমুখো হলে চলে না। বাবা চাকরি করতেন জয় কালিমাতা প্রেসে,—যদিও বটকৃষ্ণ নস্করের জমিজমার আদায়, ভেড়ির জমা করার কাজও দেখতেন। কখনও বটকৃষ্ণর সঙ্গে যেতেন, কখনও একা।

মা মারা যাওয়ার পর বাবা পাকাপাকিভাবে বাদার বাসিন্দা হয়ে গেলেন। প্রতিমার সেই ঘটনার পর বটকৃষ্ণও বড় একটা লঞ্চে চড়তেন না, দ্বীপে যেতেন না ধানের আদায় নিতে।

বটকৃষ্ণ বাবাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করে সব ছেড়ে দিয়েছিলেন। এমনকি প্রতিমাকে দেখাশোনার দায়িত্বও গণনাথের ওপরেই ধীরে ধীরে বর্তেছিল। লঞ্চের ডেকে প্রতিমার কোলে বাবা মাথা দিয়ে শুয়ে আছে, আমার মনে আছে। প্রতিমার সঙ্গে বাবার সম্পর্ক কেমন যেন ধোঁয়াটে লাগে। মায়ের সঙ্গেও তো বাবাকে এত ঘনিষ্ঠ কোনোদিন দেখিনি। প্রতিমা নাকি এক সারেংয়ের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। বটকৃষ্ণ বেঁচে থেকে কি করত? গলায় দড়ি দিয়েছে।

দলিল দস্তাবেজের কাগজগুলো আমি গুছিয়ে রাখলাম। ভাবলাম, কী বিড়ম্বনা, ডাণ্ডা খাওয়ার আগে যদি জানতাম? তখন এ দ্বীপ, ও দ্বীপ জয় কালিমাতা প্রেস কোথাও গণনাথ চাটুজ্জের হদিশ পাইনি, বাঁধা মাইনের চাকরি নেই, হনুমানদাস ফাউন্ড্রি নেই, আমি তো তখনই পঞ্চাশ ষাট বিঘে জমির মালিক, দেড় দুশো বিঘে ভেড়ির মালিক। আমি তো নিজেকে বেচে দিয়েছিলাম গণনাথ চাটুজ্জে। মাথার ওপর একটা ছাদ, একটু পেটের ভাত মারুতি ফারুতি তো অধিকন্তু—বাজার দরে আমার দর উঠেছিল বলে, আমি একটু বেশি সুখের আশায় নিজেকে বেচতেও রাজি ছিলাম। হাত বাড়িয়ে আমি সেই বোতলটা তুলে নিই, সীতাপতি বলেছিল, আগাম দিলাম—খাঁটি স্কচ। এন আর আই ভাই ফিরে আসবে, আমাদের ব্যাপারটা মাথায় রেখে বোতলটা খুলো। আমি নিজে নিজেকেই বললাম চিয়ার্স সোনালি তরল চারিয়ে গেল পায়ের পাতায়, শিশ্নে, মগজের কোষে কোষে। আমার শরীরে আগুন ধরল। আর সেই আগুনের মধ্যে গালার পাঁচ সাতটা সীল করা খামটা হাতে তুলে নিলাম। একান্ত ব্যক্তিগত— প্রেরক গণনাথ চট্টোপাধ্যায়, কেয়ার অফ্ ভার্মার

সলিসিটর ফার্ম, আমার নামে চিঠি। বিদেশ নাকি অনেক আগেই একই চিঠি পেয়েছে। বিদেশ বোম্বে থেকে ফিরবে কবে?

এক লিটার আগুন অনেকটা, জ্বলছি—আমি জ্বলছি—জানতাম, কোথাও একটা পোড়া গন্ধ পাচ্ছিলাম। আমার সমস্ত শরীর যখন জ্বলবে, মগজেও আগুন ধরতে। চড়চড় শব্দ করে আমার মাথার খুলি ফাটছে। মা চিতায় পুড়ছে, শ্মশান বন্ধুদের কে একজন উঠে গেল, হাত তিনেক লম্বা একটা পোড়া বাঁশ তুলে নিল, চিৎকার উঠল—বলহরি হরিবোল, মায়ের মাথার খুলি ফেটে চুরচুর—আগুন ধরা মগজের টুকরো ইতিউতি ছড়িয়ে পড়ল। ছাদ থেকে বড় ভয় পেয়ে একাএকা দুড়দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে নেবে এসেছি আমি। তোমার ঘরের দরজা বন্ধ মা। কে ছিল, কে ছিল সেখানে। আমাকে ওরা ফিরিয়ে নিয়ে গেল—কে ছিল সেখানে মা। তুমি বটকৃষ্ণর রক্ষিতা ছিলে?

গণনাথ চাটুজ্জে, আমার বাবা লিখেছেন, সেদিন বটকৃষ্ণ নস্কর তোমার ঘরে ছিল মা—সেই খাটের ওপর, যেখানে আমি মালতিকে শরীরের, সমস্ত শরীরের আওতায় ঘন ভাবে পেয়েছিলাম। সেই প্রথম সেই শেষবার।

বাবা পাসিং শো সিগারেটের টুকরো দেখেই চিনেছিলেন। তুমি আমার জ্বরতপ্ত গালে গাল ঠেকাতে মা—আমি তো চিনতে পারিনি।

সলিসিটর ফার্মের দুই সিকিউরিটি গার্ডকে রাত বারোটায় চমকে দিয়ে আমি কানাগলি থেকে ছুটতে শুরু করলাম। বিটি রোডের মোড়, যেখান থেকে ট্যাক্সির গন্তব্য মালতি। মালতি দরজা খোলা বলে আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

সলিসিটর ভার্মা সেক্রেটারিকে ডেকে বললেন, এই চিঠিটার একটা অথেনটিক পাক্কা ট্রানস্‌লেশন দরকার। চিঠিটা বাংলায়, আমি বুঝব না। অনন্ত রায় বললেন, আমি পড়েছি ফ্যানট্যাসটিক্, এ গুড পীস অব এভিডেন্স। বলা যায় না যে কোনোদিন কাজে লাগতে পারে। আপনি মিস্টার চাটুজ্জে এটার একটা ফটোকপি রাখুন, অরিজিন্যালটা আমরা ব্যাঙ্কের ভল্টে রেখে দেব।

চিঠিটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত চিঠি। গননাথ লিখেছেন তার ছেলেকে, তিনি বিদেশকেও একইরকম একটা চিঠি লিখে স্বীকারোক্তি করেছেন। সাদামাটা একটা লোক, জয়কালি মাতা প্রেসের কর্মচারি, মামুলি। ক্রমে বটকৃষ্ণর সেক্রেটারি, তার ডানহাত—ধীরে ধীরে বাদা অঞ্চলে তিনি দুতিনশো বিঘে ভেড়ির মালিক, শখানেক বিঘে জমির মালিক। যদিও আমার পৃথিবী ছোট, খুব ছোট—কলকাতা আর তার আশপাশের কিছু এলাকা, চল্লিশ বছর ধরে আমি এই এলাকায় পাক খেয়েছি—কত মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের দেখেছি দূর থেকে অথবা একেবারে নিঃশ্বাসের আওতার ভেতরে। গণনাথ

চাটুজ্জকে কেন দেখিনি। ভাসাভাসা অস্পষ্ট একটা লোক সংসারের সঙ্গে তার নাড়ির বাঁধন সেভাবে দেখিনি, বুঝিনি। আমার কান্না পাচ্ছিল—দশপাতা ফুলস্ক্যাপে গণনাথের গোটা গোটা হাতের লেখা অক্ষর আমাকে রাগে, ক্ষোভে অভিমানে পাগল করে দিচ্ছিল। কী দরকার ছিল এই চিঠির, গণনাথ? আমার নিজের মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল। আমিতো ভেড়ির দেড় দুশো বিঘে জমি চাই নি—তুমি মাঝে মাঝে বলতে আমাদের একটা পাঁচ সাত বিঘে ধানজমি থাকলে বেশ হত। আমি তো মাথার ওপর একটু ছাদ—একটু টাকাপয়সার নিরাপত্তার জন্যই নিজেকে বেচে দিয়েছিলাম।

আর তারপরেই আপনি ছুটলেন বাগবাজারে আপনার চেনা ভাটিখানায়। আপনি খেপে গেলেন, ভাঙচুর করলেন—পালালেনও, টালা ব্রিজের কাছে আপনার পকেট ফরসা করে দিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভার আপনার মা বাপ তুলে গালাগাল দিয়ে ট্যাক্সির দরজা খুলে ধাক্কা দিয়ে আপনাকে রাস্তায় ফেলে দিল—ফুটপাতে উল্টে পড়তে পড়তে আপনি মাথায় চোট পেলেন।

আমি বললাম, একটু উনিশ বিশ হতে পারে, কিন্তু এরকমই ঘটেছিল মনে হচ্ছে। আমি চিঠিটা—গণনাথের ওই চিঠিটা পোড়াতে চেয়েছিলাম, পারিনি। আমি পোড়ালেই সব পুড়ে যাবে না। সম্পত্তির তিনভাগের একভাগ বটকৃষ্ণ নস্করের মেয়ে প্রতিমার নামে। প্রতিমার এক জারজ সন্তান, কোথাও এখন বড় হচ্ছে। অবশ্য গণনাথ বলেছে, প্রতিমার সন্তান তারও সন্তান—তিনি বৃন্দাবনে শ্রীশ্রী ১০৮ আত্মানন্দ মহারাজের আশ্রমে বৈষ্ণবমতে কণ্ঠি বদল করে প্রতিমা মানে বটকৃষ্ণ নস্করের মেয়েকে বিয়ে করেছেন। বিয়ের সময় আমার বাবার বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে, প্রতিমার পঁচিশ। প্রতিমার সন্তান যদি বেঁচে থাকে, গণনাথ এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলেননি, তাহলেও তার বয়স তো উনিশ কুড়ি হবে, হবেই।

অনন্ত রায়, ব্যারিস্টার বললেন, এতে কিছুই প্রমাণ বা অপ্রমাণ হল না। গণনাথ নাইনটিন এইটটিতে আত্মানন্দ আশ্রমে বৃন্দাবনে বটকৃষ্ণর বিধবা মেয়েকে সাক্ষীপ্রমাণ রেখে কণ্ঠি বদল করে বিয়ে করেছে। হতে পারে তখন প্রতিমা মানে বটকৃষ্ণ নস্করের মেয়ের ছেলের বয়স পাঁচ ছয় সাত। গণনাথের চিঠির শর্ত পাতার তৃতীয় লাইনটা ভুলবেন না মিস্টার স্বদেশ চ্যাটার্জী—বাঁশবনের আলো ছায়াতে, ইট ওয়াজ ডাস্ক—ঝুঁঝকো অন্ধকার চারজন ডাকাতের গণধর্ষণের পর—ইউসি, প্রতিমা তখন, ইু ক্যান ইম্যাজিন—ক্ষতবিক্ষত বিবস্ত্র, রক্তাক্ত আর গণনাথ সেই দৃশ্যে পঞ্চম ডাকাতের ভূমিকায় অবতীর্ণ। সারা জীবনে যা হয়নি অত্যন্ত সহজভাবে গণনাথ গট ব্যাক হিজ ওন মেল সেলফ—হী হ্যাড এ্যান অ্যাবসলিউট ইরেকশন। গুমগুম করে মেঘগর্জন হল, উনি লিখেছেন চিঠিতে, জোয়ারের জল বাঁধ উপচে ধান জমিকে তিন আঙুল লবণে ডুবিয়ে দিল। গণনাথ নিজের হাফসার্ট খুলে প্রতিমার ক্ষতবিক্ষত দেহে ঢাকা দিলেন—কাদায় হাঁটু পর্যন্ত পা ডুবে যায়, বাঁধ ভেঙে উনি ওঁর বোটে এসে পৌঁছলেন।

ভার্মা বললেন, মাই ডিয়ার আমরা কিভাবে বলব, প্রতিমার বাচ্চা চারজন ডাকাত অথবা তার স্বামী অথবা ইউ ক্যান আনডারস্ট্যাণ্ড—গণনাথ চাটুজ্জের সন্তান।

আমি বললাম আজকাল তো কত কি হয়েছে। ধরুন ডি. এন.এ টেস্ট দিয়ে।

সলিসিটর ভার্মার ঘরে এসি মেসিনের একটা চাপা হুমহুম আওয়াজ নৈঃশব্দকে ভারি করে তুলল। ভার্মা বললেন কী লাভ, আমরা টু থারড্ প্রপার্টি লুজ করতে পারি। ধরুন ডি.এন.এ টেস্টে প্রমাণ হল আপনি আর আপনার এন আর আই যমজ ভাই বিদেশ চ্যাটার্জী গণনাথের ঔরসজাত সন্তান নয়। চিঠি থেকে দেখতে পাচ্ছি, রেলিভ্যান্ট সময়ে, অর্থাৎ আপনাদের জন্মের সময়ে ওঁর চিঠিতেই দেখা যাচ্ছে—হী ওয়াজ এ হোমো সেক্সুয়াল, গণনাথ সমকামী ছিলেন। চিঠি থেকেই বেরিয়ে আসছে—ও কে বছর দেড়েক উনি সহবাস করেছেন, বাট দ্যাট ডাসনট প্রুভ, আপনি বুঝতেই পারছেন। রক্তের গ্রুপ বা ডি. এন এ টেস্টের ঝুঁকি নেওয়া যেত। পুরো সম্পত্তিটাই হাতানো যেত। আমাদের ফার্মের তো সেটাই কাজ—ক্লায়েন্টের ম্যাক্সিমাম ইনটারেস্ট দেখা। কিন্তু ধরুন যদি এই সব টেস্টে প্রমাণ হয় গণনাথের সঙ্গে আপনাদের গ্রুপ মিলছে না।

আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে সেই রাত্রে ফুটপাতে ডিগবাজি খেয়ে পড়ার সময় আমার ফাটা মাথার জোড়ের সেলাইটা ফেটে গেছে, কানের পাশ দিয়ে রস গড়িয়ে পড়ছে, পুরনো ঘিয়ের গন্ধ পাচ্ছি। তবু মরিয়া আমি, গণনাথের চিঠিটা শেষ করতেই হবে।

মা ভৈরবীর ডেকে, প্রায় মাঝি মাল্লাদের সামনে ঠাঠা দুপুরে সে প্রতিমার কৌমার্য হরণ করেছিল। আমি বলেছিলাম, বটাদা—বটকৃষ্ণকে আমি কখনও বড় বাবু, কখনও বটাদা বলে ডাকতাম, বটাদা আমাকে মুক্তি দাও—বাদার এই নোনা হাওয়া, ভেড়ির নোনা জল আমার সহ্য হচ্ছে না। রাতে ঘড়িয়াল, কামোট আমাকে ফালা ফালা করছে। বটকৃষ্ণ নস্কর বলল, সময়টা ভালো নয়, একদিকে শরিকী সংঘর্ষ—অন্যদিকে মুণ্ডুকাটা পার্টি। আমি যেতে পারছি না। মায়ের দেওয়া সম্পত্তি তোমাকেই দেখতে হবে গনা।

কামনায় আমি তিরতির করে কাঁপছি। ভেড়ির নোনা জলে জামাই বাবাজী তিনটে প্রায় উদোম ন্যাংটো জেলেনিকে তাড়া করে ফিরছে, দুই ইয়ার বক্সি সঙ্গে। ডেকের লাগোয়া কেবিনে প্রতিমা শুয়ে আছে। ঠোঁটে আলগা হাসি, বিশ্রস্ত কাপড় হাঁটু পর্যন্ত—গরমের জন্যই হয়ত ব্লাউজের বোতাম খোলা। বাদামি পদ্মর কুঁড়ির মত তার উন্মুক্ত বাম স্তনে নোনা বাতাস খেলা করছে। কীসে যে কী খবর হয়। নোনা জলের ঢেউয়ে খবর আছড়ে পড়ে, নোনা বাতাসে খবর ভাসে। মাঝি মাল্লারা তো আমার বশ। জামাই বাবাজী বলল, শ্বশুর তো ভেড়ুয়া, তুই তার রাণ্ডী, অনেক বেনামী কারবার হয়েছে। সব জানি খানকির ছেলে—বেশি মাতব্বরি করলে টুকরো টুকরো করে কেটে মাতলার জলে ফেলে দেব। জামাইয়ের পূর্বপুরুষ নাকি মগ দস্যু ছিল—হতে পারে। আমি কিন্তু বটাদার জামাইয়ের ঠিক পিছনেই সেই ডাকাতদের দেখেছিলাম। ধড় মুণ্ডু আলাদা হবে, হবেই—আমার মনে হয়েছিল। ধড়টা মা ভৈরবীর সারেংয়ের কেবিনের দরজায় পড়েছিল। মুণ্ডুটা পাওয়া যায়নি। প্রতিমা আটকাবার চেষ্টা করেছিল, পারেনি—পোড়া ঝামার মত চারটে শরীর এক এক করে যখন ওর শরীরের ওপর ঝড় বইয়ে চলে গেল—বাঁশবনের আড়ালে গুম মেরে বসে থাকা বুড়ো বাঘটা নড়েচড়ে বসল। জানোতো একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে রয়্যাল বেঙ্গল অন্য মাংস ছোঁয় না। সেদিনই বোধহয় আমি প্রথম পুরুষ

হলাম, তৃপ্ত বাঘের মত আমার আকাশমুখো গর্জনে বাদার জঙ্গল কেঁপে উঠল। প্রতিমা, বটাদার মেয়ে আমার চেয়ে প্রায় বাইশ তেইশ বছরের ছোট আমার জীবনের প্রথম নারী হয়ে উঠল। আমার ঔরসে প্রতিমার একটি সন্তান আছে। আমার বিবাহ হিন্দু শাস্ত্র অনুমোদিত। বটকৃষ্ণ বা তার জামাইয়ের সম্পত্তির কী পাবে জানি না, প্রতিমার সন্তান আমার সন্তান সে এক তৃতীয়াংশ পাবে।

বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে শ্যামাপদ স্মৃতিতীর্থ মেয়ের হাত ধরে কীভাবে শিয়ালদহ স্টেশনে হাজির হয়েছিলেন আমি জানি না। একজন সোস্যাল ওয়ার্কার দুজনকে কিভাবে কেন জয়কালিমাতা প্রেসে হাজির করল আমি জানি না। দুজনকে বৌবাজারে তার মেসে কয়েকদিনের জন্য জায়গা দিল বটকৃষ্ণ। তারপর কী হল—একান্ন বাহান্নর তাড়া খেয়ে স্মৃতিতীর্থ আর তার মেয়ে—তোমার মা তো শিয়ালদহ স্টেশনে একবছর বাদে পৌঁছয়নি, আমার বিশ্বাস, তিনি বটকৃষ্ণ নস্করের রক্ষিতা ছিলেন। পালটি ঘর বলে বটকৃষ্ণ আমার সঙ্গে তোমার মায়ের বিবাহের প্রস্তাব আনেন, শিয়ালদহে শ্যামাপদ স্মৃতিতীর্থর সঙ্গে যোগাযোগের একবছর পরে।

ফুলশয্যার রাতে আমার ঘরে ফুলে সাজানো খাটে বটকৃষ্ণ গভীর ভাবে নাক ডাকছিল। আর তোমার মা এজমালি গায়ে সাড়ে চার হাত গামছা জড়িয়ে রাত বারোটার সময় বালতি বালতি জল ঢালছিল। উঠোনে কলতলায়। গণনাথ, কেন এসব লিখতে গেল এতকাল পরে?

বন্দর

সলিসিটার ফার্ম থেকে বরদা ভবনের সামনে সিকিউরিটি গার্ড বসানো হয়েছে—দিনে একজন রাত্রে দুজন।

মালতির আজ কোনো শো নেই। বলল, আজ তোমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারব। বরানগর থেকে মাসী, তার ছেলে আর ছেলের বউ গেছে নাকতলার ফ্ল্যাটে, মাকে তাদের ভরসায় রেখে এসেছি।

আমি বললাম, এখনতো সব মিটে গেছে—তা সত্ত্বেও দ্যাখ দুদুটো সিকিউরিটি গার্ড।

মালতি বলল, তোমাকে পাহারা দেওয়ার জন্যও হতে পারে। আবার কখন কি করে বস। মালতি বিদেশের কাছে নিশ্চয়ই কিছু কিছু খবর পেয়েছে, আমার কাছেও ভাসাভাসা অনেকটাই শুনেছে। আমি বললাম, বটকৃষ্ণ নস্কর গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে জানো! কেন বল তো!

মালতি বলেন, কি করবে বল, জামাইটা খুন হয়ে গেল—লাশ যদি বা পাওয়া গেল, মুণ্ডুটা পাওয়া গেল না। বউ মানকুণ্ডুর পাগলা গারদের ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে মরেছে। একটা মাত্র বিধবা মেয়ে প্রতিমা, তার কথা তো জানোই।

আমি বললাম, তুমি এত কথা জানলে কি করে?

মালতি বলল খানিকটা বিদেশের কাছ থেকে, আর খানিকটা ওর সলিসিটর মিস্টার ভার্মার মুখ থেকে।

আমি বললাম, বিদেশ তোমার পাত্তা লাগাল কী করে? বরদা ভবনে রামপদ জ্যাঠারা জানত?

মালতি আমার আঙুল নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, আমি অন্ততঃ দুবার তোমার খোঁজে এসেছিলাম। প্রথম দুমাস রাগ করে আসিনি, ভেবেছিলাম তুমি একটু খোঁজ করবে—বরানগরে পালিত পাড়ায় মাসির বাড়ি যাবে।

আমি বললাম বছর বারো পরে, তা বারো বছর তো হবেই—তুমি কবে বম্বে গেছ?

মালতি সেকথার উত্তর ছিল না। বলল বিদেশ আর তার সঙ্গে আরো দুজন তপন থিয়েটারে আমার নাটকের শোয়ে হাজির। নাটক দেখাটা ছুতো। ভার্মার ফার্মেই কেউ একজন বলেছিল, মেয়েটা নর্থ ক্যালকাটার—বেশ কিছুদিন বোম্বে ছিল—এখন ফিরে এসেছে। শীলা বউদির কাছে বিদেশ খবর পেয়েছে আরও পরে।

শীলা ঢুকে পড়ল—বলল একটু চা দিই? মালতির শরীর একটু ভারি হয়ে গেছে। পিঠে কোমরে বেশ কিছুটা চর্বি, মুখটাও কেমন যেন ভারি ভারি। আমি বললাম, তুমি একটু মোটা হয়ে গেছ মালতি। মদ খেয়ে?

মালতি তার বিশ বছরের পুরনো হাসিটা হাসল। কৈশোরের আশ্চর্য দুষ্টুমি ওর চোখের তারায় চিকচিক করতে লাগল—গোটা মুখে সেই দুষ্টুমির হাসিটা চারিয়ে গেল, বলল আমি মদ খাই তো, প্রায় রোজই। যেদিন শো থাকে না, বারে নাচ থাকে না—সেদিন আমার বাড়িতে ক্লায়েন্টরা আসে। আজ সন্ধ্যেয় তুমি আমার ক্লায়েন্ট। আমি বললাম, কী যাতা বলছ।

মালতি বলল, যা সত্যি তাইই বলছি। শীলা চা নিয়ে এস। মালতিকে বলল এরপর একদিন মানু পিসীকে নিয়ে এস। বরদা ভবনে কতদিন থাকা হবে জানি না। চাকরির জায়গায় অধীর বাড়ি ভাড়ার জন্য খুব চেষ্টা করছে। আসলে শ্বশুরমশায়ের এমন অবস্থা—এখানে চেনা পরিচিত লোকজন ডাক্তার বদ্যির সুবিধে। আমার তো একদম ভাল লাগছে না।

মালতি বলল, অধীরদা এখন কোথায় পোস্টেড, সেই ওষুধ কোম্পানিতেই আছে তো? শীলা বলল, হ্যাঁ কটকে, সেখানেই চলে যাব আমরা। আমি বললাম, বরদা ভবন তো এখন বিদেশের, যতক্ষণ কিছু না হচ্ছে, ততক্ষণ তো থাকার কোনো অসুবিধে নেই। আমারও দুবেলা ভাত জুটছে—চলে গেলে সেটাও পাব না।

মালতি বলল, তুমি সদাদাকে ধর—বাড়ি তো শুধু বিদেশের একার নয়। শীলা একটু চোখ মটকে বলল, ধরব তো বটেই, আমি বিদেশ ঠাকুরপোকেও বলেছি। এখনও তো শরীরটা ঠিক হয়নি সদাঠাকুরপোর, কালকেও বলছিল জ্বরজ্বর লাগছে। সুস্থ হোক, আমিতো ধরবই—আমার শ্বশুরও বলবেন, অন্ততঃ তার মৃত্যু পর্যন্ত। শাশুড়িকে তো নিমতলায় দাহ করা হয়েছিল। ছেলেদুটো রামকৃষ্ণ মিশনের হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে—পিছুটান বলতে তো শ্বশুরমশাই।

কাপ প্লেট তুলে নিয়ে শীলা চলে গেল। আমি বললাম, জনসংযোগের অভাবটা সত্যিই খুব বেশি। এই বাড়িরই পেছন দিকে রামপদ জ্যাঠাকে আমি একবারও দেখতে যাইনি।

মালতি সেদিন অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলল। ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে ছাদে গিয়ে অনেকক্ষণ পাশাপাশি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ বলল, সদাদা সময় কত তাড়াতাড়ি বদলে যায় দ্যাখ—এইতো সেদিনের কথা মনে হচ্ছে। ছাদের ওপর আমরা হুটোপাটি করছি। রুমাল চোর খেলছি। বিদেশটা যা অসভ্য ছিল না—কার্তিক মাসে আকাশ প্রদীপ দেখাতে ছাদে উঠেছি, কোনরকমে মায়ের একটা শাড়ি গায়ে জড়ানো। কোথাও কেউ নেই, হঠাৎ বিদেশ পেছন থেকে এসে—বিদেশকে কত সুন্দর দেখতে হয়েছে দেখেছ, ওর বউ নাকি মেমসাহেব।

আমি বললাম, বিদেশকে তুই ভালবাসতি মালতি? মালতি উত্তর দিল না—আমার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল, বলল—তুমি খুব রোগা হয়ে গেছ। আমার নাকতলার ফ্ল্যাটে গিয়ে কদিন থাক না, মাও সারা সন্ধে একা একা থাকে। আমার কাজের লোক আছে। পাহারার কাজ করতে হবে না মশায়।

অন্ধকার ছাদে মালতি হঠাৎ বাচ্চা মেয়ের মত, একটা ইঁটের ভাঙা টুকরো নিয়ে এক্কা দোক্কা খেলতে আরম্ভ করল। পুরনো বাড়ির ছাদ কাঁপতে লাগল ধুপ, ধুপ ধুপ।

আমি বললাম এই ভর সন্ধেয় ছাদের ওপর এভাবে লাফায় না। তেতুঁলগাছটা এখনও আছে, ওই দ্যাখ—বরদাকান্তর ভূত চলে আসতে পারে। তুই কখনও ভূত দেখেছিস মালতি?

মালতি লাফানো বন্ধ করল, পায়ে পায়ে এগিয়ে এল আমার কাছে, বলল আগে দেখতাম না—এখন মাঝে মাঝে দেখি।

আমি বললাম কার ভূত?

মালতি বলল, সরিতার, বম্বেতে আমার রুম মেট ছিল। আমরা নাম পাতিয়েছিলাম আরব সাগরের জল হাতে নিয়ে। ও আমাকে ডাকত সরিতা বলে, আমি ওকে ডাকতাম মালতি বলে।

ঘরে অল্প হুইস্কির তলানি ছিল—সীতাপতি দিয়ে গিয়েছিল। নিউরো সার্জেন ডাক্তারসারেঙ্গী বলেছিলেন আপত্তি নেই, কিন্তু পরিমাণ ঠিক রেখে। আমার রক্তের চাপ খুব নেমে গেছে, সুগারও ভয়াবহ ভাবে কম—বেঁচে থাকার জৈব প্রক্রিয়া স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে। ডাক্তার সারেঙ্গী আবার সাইকিয়াট্রিস্ট ডাক্তার অজয় বাগচীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বললেন, খড়ের মানুষের ভাবনাটা আমার অবসেসন। খড়ের মানুষ হয় না। মানুষের শরীরের সবকিছু চেঁচে পুঁছে শুধু চামড়ার মধ্যে খড় ভরে দেওয়া—ট্যাক্সিডার্মি যাকে বলে, ডাক্তার বাগচি বললেন অ্যাবসার্ড। জন্তু জানোয়ারের ট্যাক্সিডার্মি হয়, মানুষের হয় না। আদিম মানুষ কোথাও কোথাও ক্যানিব্যাল ছিল—নরমাংসখেত, মড়ার মাথার খুলি সাজিয়ে রাখত কিন্তু মরা মানুষের চামড়ার ভেতরে ঘাস বিচালি ভরে রাখত, এমন কোনো নজির নেই।

আমি গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললাম, মালতি তোর মনে আছে—ডায়মণ্ডহারবারে সেই একবারই বরদা ভবনের সবাই পিকনিক করতে গিয়েছিলাম, শুধু মানুপিসী যায়নি। তুই মন খারাপ করছিলি। আমি বলেছিলাম পরের বার যখন চড়ুইভাতি করতে আসব, তখন মানুপিসীকে সঙ্গে নিয়ে আসব।

সোহাগখুড়ি মাংস রান্না করেছিল। প্রাণকাকা মুকুল, পারুল—শিবুদা।

মালতি বলল মামাই তো ব্যবস্থা করেছিল, মামা তখন সুন্দরবনের অনেকদ্বীপে বোটে করে ঘুরে বেড়াত। আমারও খুব যেতে ইচ্ছে করে। মালতির চোখে একটু লালচে আভা। বলল সামনের সপ্তাহে ডায়মণ্ডহারবারে আমাদের থিয়েটারের একটা শো আছে—আমার তো সেই দুটো ক্যাবারে নাচ। মাঝে মাঝে এত ক্লান্ত লাগে না, বুক দুলিয়ে পাছা দুলিয়ে সেই এক নাচা পাবলিক সিটি দেবে। কুতসিৎ অঙ্গভঙ্গি করবে, খিস্তি দেবে আমাকে আরো বেশি শরীর দোলাতে হবে। হাতে অনেক সময় থাকবে, তুমি যাবে সদাদা।

আমি বললাম, সেতো যেতেই পারি। আমি তোকে যেটা বলছিলাম সেটা অন্য কথা। ডায়মণ্ডহারবারে গঙ্গায় সেদিন সন্ধেয় একটা বিরাট গাটাবোট কলকাতার দিকে আসছিল—খড় বোঝাই। আর বেশ কিছু মানুষ গাধাবোটের উপর চারপাশে, বোঝাই খড়ের ওপর দাঁড়িয়েছিল, বোধহয় আমাদেরই দেখছিল। তোর মনে আছে, তুই জিজ্ঞেস করেছিলি, নাকি আমি, ওরা কারা?

বাবা বলেছিলেন, ওরা খড়ের মানুষ।

ফাঁকা গ্লাস নামিয়ে দিতে দিতে মালতি বলল প্রাণকাকাদের কোনো খবর রাখ। তুমি তো নিজের খবরই ঠিকমত রাখতে পার না।

আমি বললাম মুকুল রেলে চাকরি করে—বিয়ে করেছে বহুদিন আগে। দুদিন পরে ওর মেয়ের বিয়ের পাত্রী দেখতে হবে। পারুলের স্বামী তো ধানবাদে কী যেন একটা চাকরি করে। তার তো এক মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, আরও এক মেয়ে আর এক ছেলে আছে। প্রাণকাকা বাতে না পক্ষাঘাতে পঙ্গু। সোহাগ খুড়ি একইভাবে বেঁচে আছে।

মালতি চোখ বড় বড় করে বলল, বাবা—এত খবর তুমি পেলে কোথা থেকে।

আমি বললাম, খানিকটা বিদেশের কাছ থেকে আর খানিকটা শীলার কাছ থেকে। প্রাণকাকা বোধহয় বরদা ভবনের ব্যাপারেই ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। পারুল আর মুকুলের বিয়ের সময় অবশ্য প্রাণকাকা নিজে এসেছিলেন নেমন্তন্ন করতে। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি।

দাদার কথা মাঝে মাঝে খুব মনে পড়ে, মালতির গলার স্বর ভারি হয়ে এল। আমি ওর দুহাত নিজের হাতে তুলে নিলাম, বললাম ইউনিভার্সালের কাঁচঘরে শুয়ে শিবুদার কথা খুব মনে হত। শিবুদা একটা অন্যরকম পৃথিবীর কথা বলত, সেরকম পৃথিবী আর কী কোনোদিনই আসবে না।

মালতি আমার শরীরের সঙ্গে ঘন হয়ে মুখোমুখি। ধরা গলায় বলল, আমাকে এবার ফিরতে হবে। নাকতলা কী এখানে। বড় রাস্তায় হয়ত এতক্ষণে আমার গাড়ি এসে পড়েছে—আমার নয়, এক ক্লায়েন্টের গাড়ি।

ভেতরের দিকের দরজাটা খোলা ছিল, মালতি ছিটকিনি তুলে দিল, আমার বুকের সঙ্গে মিশে গিয়ে ধীরে ধীরে মুখ তুলল। ওর বুকের মধ্যেকার এক কিশোরীর বুক কাঁপছে আমার নিঃশ্বাসের আওতায় ওর লিপস্টিক দেওয়া ঠোঁট থিরথির করে কাঁপছে।

আমি বললাম এভাবে নয়।

মালতি ছিটকে সরে গেল, বলল তুমি আমাকে ঘেন্না কর সদাদা?

আমি ওকে দুহাতে টেনে নিয়ে বললাম, কী যাতা বলছিস। আমার জীবনের প্রথম চুমুটা আজও বাকি থেকে গেছে। মনে আছে, অষ্টমীর সন্ধেয় ঠাকুর দেখতে যাবে বলে নতুন লাল ডুরে শাড়ি পাট ভেঙে পড়েছিস, লাল ব্লাউজ, গলায় একটা সরু সোনার চেন—চোখে কাজল, কপালে টিপ—ঠোঁটে গাঢ় লাল লিপস্টিক! পাছে লিপস্টিক নষ্ট হয়ে যায়, কাঁচপোকাটিপ নড়ে যায়, আমি খুব সাবধানে তোর কপালে ঠোঁট ছুঁইয়েছিলাম। তুই রেগে গিয়ে বলেছিলি তুমি একটা আস্ত হাঁদা স্বদেশদা। মনে পড়ে। আমার তখন আঠারো উনিশ, তোর কত চোদ্দ, পনের।

মালতির চোখ ছলছল করছিল। এখন আর সেই শাড়ি, সেই ব্লাউজ—কাঁচপোকাটিপ পরতে পারি না স্বদেশদা। আমি তো বুড়ি হয়ে গেছি। ক্যাবারের পোশাকে লোকে চোখ দিয়ে গেলে, কিন্তু আমি তো নিজেই জানি, আমি আর সুন্দর নই।

আমি ওর মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে দিলাম। আঙুল দিয়ে চিবুকটা তুলে ধরলাম, তুই এখনও খুব সুন্দর মালতি!

মালতি ব্যাগ গুছিয়ে নিল, বলল তাহলে যাই—আজ সন্ধের ক্লায়েন্টের কাছ থেকে খালি হাতে ফিরে যাই।

আমি বললাম—না খালি হাতে ফিরে যাবি না। বম্বে থেকে পার্শেলে মিস সরিতার গোটা বারো চোদ্দ ছবি এসেছিল। সরিতা মরে গেছে, তুই ছবিগুলো নিয়ে গিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দিস। খাটের নীচে থেকে ট্রাঙ্কটা টেনে বের করতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। ছবির খামটা হাতে নিয়ে মালতি মাথা নীচু করল। বলল, তুমি চিনেছিলে ওগুলো আমারই ছবি। আসলে ওগুলো আমার নাম পাতানো সই সরিতার সঙ্গে ছিল।

আমি বললাম, চিনতাম না হয়ত, কিন্তু দুই বুকের মাঝখানে কালোজরুলটা, ওটা কী করে ভুলব। যেখানে নিজেকে তুই একটু বেশি এক্সপোজ করেছিস, জরুলটা হয়ত মেক আপে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিস। আমি কিন্তু ধরে ফেলেছি।

মালতি কপট রাগে প্রায় কেঁদেই ফেলল। মুঠো পাকিয়ে আমার বুকে হাল্কা কটা ঘুঁষি মারল, বলল তুমি কী অসভ্য স্বদেশদা—এখনও একই রকম আছ।

আমি বললাম, জীবনের বকেয়া প্রথম চুমু ডায়মন্ডহারবারের জন্য তোলা থাক। তুই লাল শাড়ি, লাল ব্লাউজ—লাল লিপস্টিক আর কাঁচপোকাটিপ পরে আসবি, সেই যেখানে আমরা চড়ুইভাতি করেছিলাম, সেখানে বাঁধের ওপর, আজ আমি শুধু তোর বুকের মাঝখানের ওই জরুলটায় ঠোঁট ছোঁয়াব।

মালতী বাঁ হাতের আঙুলে লোকাট ব্লাউজের বোতামে, ডানহাতের আঙুল আলোর সুইচে। আলো নিভে গেল। বুকের মাঝখানে আমার জ্বরতপ্ত ঠোঁট—মালতির চিবুক আমার মাথার ওপরে। মাথার ফাটা জায়গায় মালতির চোখ থেকে জল পড়ছিল বোধহয়। ঘা শুকোয়নি, কিন্তু মালতির চোখের লবণ জলে আমার জ্বালা করছিল না।

সলিসিটর ভার্মার অফিসে জরুরী তলব পেয়ে পরের দিন গেলাম। অনন্ত রায় ব্যারিষ্টার বললেন, গণনাথের কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি। যতটুকু আন্দাজ করা গেছে, তিনি বৃন্দাবনে শ্রী শ্রী ১০৮ মুক্তানন্দের আশ্রমেই যাবেন। প্রাণকাকার একটা চিঠি এসেছিল সকালে, সেটা অনন্ত রায়কে দিলাম। উনি বললেন, ভাগলপুরে আমরা যোগাযোগ করেছিলাম—আমাদের কাছে কাগজ আছে প্রাণনাথ দু'দফায় গণনাথ চাটুজ্জের কাছে সত্তর হাজার টাকা নিয়ে বরদা ভবনের অংশ ছেড়ে দিয়ে গেছে। সুতরাং তারপরে তিনি জয়সোয়ালকে বরদা ভবন বেচেছেন, না কাজোরিয়াকে, সেটা কোনোভাবেই বরদাভবনে আমাদের ম্যাটার করবে না। প্রাণনাথ এখন চিঠি দিচ্ছে—পনের বছরে জমির দাম পনের গুণ না হলেও দশ গুণ বেড়েছে—এই সময় যদি একটু চাপ দিয়ে আরও কিছু টাকাকড়ি পাওয়া যায়। আমরা স্ট্রেট বলে দিয়েছি জয়সোয়াল আর কাজোরিয়ার সঙ্গে রফায় আসতে, কোর্টের খরচ চালাতে তো কিছু খরচ আছে। প্রাণনাথকে নতুন করে আমরা আর কিছু দেব না। তাছাড়া বেশি বাড়াবাড়ি করলে প্রাণনাথ ক্রিমিন্যাল কেসে পড়ে যাবে না? বরদা ভবনের নিজের অংশটুকু উনি তিনবার বেচেছেন—প্রথমবার গণনাথ চ্যাটার্জীকে

আপনাদের রামপদ জ্যাঠা আর অশ্বিনী খুড়োর সঙ্গেও একটা রফা হয়ে যাবে বিদেশ চ্যাটার্জী বম্বে থেকে ফিরে এলে। আমাদের ইচ্ছে সামনের জুন-জুলাই নাগাদ বরদা এ্যাপার্টমেন্টের কাজ শুরু করা। রথের দিনটা শুনেছি খুব ভালো দিন। বিদেশের বোম্বে থেকে ফিরতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে। একটা ফাইনানসিয়াল নন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপারে কনসালটেন্সি দিচ্ছে।

আমি বললাম, সেটা আপনারা দিলেই তো পারতেন।

অনন্ত রায় বললেন, আমাদের ফিলড্ আলাদা। আমরা আইনগত খুঁটিনাটি বিষয়গুলো দেখব, কোর্ট কাচারি, জমি জমা এইসব আর কি?

দুয়েকটা কাগজে সইসাবুদ করে উঠে যাব অনন্ত রায় বললেন, আপনি সাইকিয়াট্রিষ্ট ডক্টর বাগচির কাছে আর গিয়েছিলেন?

আমি মাথার কাটা জায়গায় হাত বোলালাম, বললাম কাল সন্ধেয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

ইউনিভার্সাল থেকে বেরিয়ে আসার পরও কী আপনি খড়ের মানুষ দেখতে পাচ্ছেন?

আমি উত্তর দিলাম না।

সলিসিটর ফার্মের এয়ার কণ্ডিশনড চেম্বারে অনন্ত রায়ের মুখোমুখি বসে এখন আমি স্বদেশ চ্যাটার্জীর অনন্ত সম্ভাবনার কথা ভাবছিলাম। অর্গান বেচে একটা হাজার বারোশো স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট, মারুতি গাড়ির স্বাচ্ছন্দ্য আর ব্যাংক ব্যালান্সের ওপর নির্ভরশীল একটা অনায়াস জীবন এটুকুই আমার চাওয়া ছিল। এখন আমার সামনে অনেক অনেক মেমোরেণ্ডাম অব আন্ডারস্ট্যাণ্ডিংয়ের হাতছানি। অনেক অনেক সুখের সফেন উচ্ছ্বাস। গণনাথ জমি তৈরি করে দিয়ে উধাও হয়ে গেছে, এন আর আই যমজ ভাই সেখানে টাকার গাছ পুঁতবে। আমার কাজ টুকটাক সই সাবুদ করা আর গাছতলায় টাকা কুড়োনো।

নিস্তব্ধতা ভারি হয়ে আসছে, মাথার ভেতর দপদপ করছে—আমি বললাম ব্যারিস্টার রায়, আপনাদের সলিসিটর ফার্মের সিনিয়র পার্টনার ব্যারিস্টার ভার্মা বিদেশী ক্লায়েন্টেদের হয়ে আমার শরীরের সমস্ত কলকব্জা কিনে নেওয়ার ঠিকে নিয়েছিলেন, আপনি জানেন?

রায় বললেন, ওপেন মার্কেট ইকনমিতে আমরা জাস্ট একটা নতুন ভেঞ্চার নিয়েছিলাম। দ্যাটস অল।

ডক্টর বাগচি বললেন ই.ই.জি আর স্ক্যানিংয়ের রিপোর্টটা দেখলাম। তেমন ভয়ের কিছু না থাকলেও সাবধানে থাকতে হবে। মাথার মধ্যে অনেকগুলো স্পট ডার্ক—শূন্য বলতে পারেন, ব্ল্যাক হোল বলতে পারেন। মাথার ফাটা জায়গা থেকে কী এখনও রস গড়াচ্ছে?

আমি বললাম, আপাততঃ কয়েকদিন তেমন কিছু দেখছি না, তবে দিন তিনেক আগে মনে হয় কানের পাশে সুড়সুড় করছে-আঠা আঠা, ফিকে হলুদ রঙের পুঁজের মত কানের পাশ দিয়ে গড়িয়ে নামছে। সেই পুরনো ঘিয়ের গন্ধ, ইউনিভার্সালে যেরকম গন্ধ পেতাম। আমি ভাবতাম আমার মাথার ঘিলু গলে গলে বেরিয়ে গিয়ে আমার মাথাটা একদিন ফোঁপরা নারকেলের মত হয়ে যাবে। তারপরও হয়ত বেঁচে থাকব কিন্তু আমার মাথা কোনো কাজ করবে না।

মার্থা, মানে ওই মেয়েটা যার রিপোর্ট নিয়ে হৈচৈ, পুলিশ ইউনিভার্সালে তালা মেরে দিল ডাক্তার ভার্গব আরও ছ সাতজন এ্যারেস্ট হয়ে গেল, সেই মার্থা ইউনিভার্সাল নার্সিং হোমে আমাকে বলেছিল, বিজ্ঞান এত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, হয়ত আমার মাথায় কয়েক চামচ বাঁদরের ঘিলু ঢুকিয়ে দিলেই আমার মস্তিষ্ক মানে ব্রেন আবার ঠিকমত কাজ করবে।

ডাক্তার বাগচি বললেন, মার্থা আপনার সঙ্গে রসিকতা করেছে। যদিও জন্তু জানোয়ারের হাড়, কিডনি—হার্ট নিয়ে কিছু কাজকর্ম্ম হচ্ছে।

উজ্জ্বল বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে একটা নীল বাতি জ্বালিয়ে দিলেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাগচি। তারপর প্রজেক্টর দিয়ে দেয়ালে একটা ছবি ফেললেন, বললেন দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা?

আমি বললাম, কুশপুত্তুলি।

ডাক্তার বাগচি বললেন, একজ্যাক্টলি, এফিজি দেখেছেন কখনও?

আমি বললাম কত দেখেছি, কত পুড়িয়েছি। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আগে প্রফুল্ল সেন, তারপর ধরুন জরুরী অবস্থার সময় ইন্দিরা গান্ধী রামদাস হনুমান দাসে রামদাসের নাতি লক্ষ্মণ দাস। সেবার বলা নেই কওয়া নেই যার কাছে আমি স্টোরের লেজারের কাজ শিখেছি সেই পুলিনদাকে আরও কয়েকজনকে ছাঁটাইয়ের নোটিশ ধরিয়ে দিল। ফ্যাক্টরির গেটে ওর গাড়ির কাঁচ ভেঙে দিলাম আমরা ইঁট মেরে। কুশপুত্তুলি দাহ করা তো সমস্ত রাজনৈতিক কর্মসূচীর অঙ্গ। কলকাতার ছেলে—আমি কুশপুত্তুলিকা দেখব না?

দ্বিতীয় একটা ছবি দেখলাম—গমের খেতে কালো হাঁড়ির ওপর আঁকা চোখ নাক মুখ নিয়ে ছেঁড়া জামা পরে একটা খড়ের মানুষ। ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, চিনতে পারেন?

আমি বললাম না, এরকম একটা অদ্ভুত জিনিস আমার চোখে পড়েনি।

ডাক্তার বাগচি বললেন, আপনি তো ক্যানিং, ডায়মন্ডহারবার আরও বেশ কিছু দ্বীপে ঘুরে বেড়িয়েছেন, দেখেননি? ওটা কাকতাড়ুয়া। হাতে একটা তীরধনুক— পাখিদের ভয় দেখাবে, যাতে ঝাঁক বেঁধে গমের ক্ষেতে নেমে না আসে। দূর থেকেমানুষজনও রাত্রিবেলায় হঠাৎ দেখলে ভয় পাবে। এটাও এফিজি খড়ের মানুষ।

পরে দুতিনটে স্লাইড যা দেখালেন, সবগুলোই কুমোরটুলির। কার্তিক ঠাকুরের প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। বাঁশের কাঠামো, খড় বাঁধা হচ্ছে, মাটি লেপা হল—তারপর মুণ্ডু বসানো হল। ডাক্তার বাগচিকে বললাম, পোল পেরিয়ে আমরা হেঁটেই ছোটবেলায় কতবার কুমোরটুলি গেছি। দুর্গাঠাকুর, সরস্বতী ঠাকুরের মূর্তি তৈরি হওয়া দেখেছি।

খড়ের মানুষ হয় না। ডাক্তার বাগচি বললেন, অস্থি মজ্জা, রক্ত মাংস—মাথার ঘিলু—এগুলোর সাবসটিটিউট খড় নয়।

আমি কাতরভাবে বললাম, সেগুলো তো আমি স্বপ্নে দেখেছি।

স্বপ্নেই বা আপনি দেখবেন কেন? বিয়াল্লিশ বছর বয়স হল। বিয়ে করেননি, আপনি ন্যাংটো মেয়েছেলের স্বপ্ন দেখুন আপত্তি নেই। চেম্বারের নরম গদি আঁটা সোফায় আমার পাশাপাশি বসে বললেন, টি এস এলিয়টের নাম শুনেছেন?

আমি বললাম, কবি ছিলেন—নামকরা কবি। তবে আমি ওর লেখা কিছু পড়িনি। বি.এ. ক্লাসে পাঠ্যও ছিল না, আর ওই বি.এ ক্লাসের পরে আমি কোনো কবিতাই পড়িনি। বাংলাই পড়িনি তো ইংরেজি কবিতা।

এলিয়টের একটা লাইন ছিল হলো ম্যান, স্ট্র ম্যান—অন্তঃসারশূন্য মানুষ।

আমি বললাম, তাহলেই বুঝুন, সাহেব কবি—তিনিও খড়ের মানুষদের দেখেছিলেন, স্বপ্নে।

ডাক্তার বাগচি বললেন, খড়ের মানুষের কথা না ভেবে এবার একটা বিয়ে করে ফেলুন। খড়ের নয়, সত্যিকারের রক্ত মাংসের একটা মেয়েমানুষ।

মালতি বলেছিল, সে তার নাটকের দলের সঙ্গে বাসে করে তিনটে সাড়ে তিনটের মধ্যে ডায়মন্ডহারবার পৌঁছে যাবে। তার সঙ্গে বাসে আমাকে নিয়ে যেতে কোনো অসুবিধে ছিল না। বাসে জনা কুড়ি যাবে, অনেক জায়গা খালিও পড়ে থাকবে। তবু মালতি বলল, তুমি ট্রেন ধরে বা ধর্মতলা থেকে এক্সপ্রেস বাসে আলাদা চলে এস। তোমাকে লোকে দেখুক আমি চাই না। তুমি আর আমি দুজনে মিলে ঘন্টাখানেক গঙ্গার ধারে বেড়াব। আমাদের ছোটোবেলায় যে জায়গায় চড়ুইভাতি করতে এসেছিলাম সেই জায়গাটা খুঁজব। সৈকতাবাস হোটেলে আমাদের নাটকের টিমটা উঠবে। এস.ডি.ও বাংলোর পাশের মাঠে প্যাণ্ডেল করে নাটকের প্রোগ্রাম। আমার তো শুধু দুটো নাচের দৃশ্য—একটা ইনটারভ্যালের জাস্ট আগে। আমার ক্যাবারে নাচের পরে বিরতি। তারপর প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ক্লাইম্যাক্সের আগে পোশাক দেখিয়ে আরেকটা ক্যাবারে। তুমি ঠিক চারটের সময় সৈকতাবাস হোটেলের সামনে থেক কিন্তু।

আমি চারটে বাজার অনেক আগেই ডায়মণ্ডহারবারে পৌঁছে গেছি। গঙ্গার ধারে ধারে আমি প্রায় তিরিশ বত্রিশ বছর আগেকার সেই ঝোপঝাড়, ফণিমনসা গোটাকতক কাঠ টগর আর করবী গাছে ঘেরা সবুজ ঘাসে ঢাকা নদীর চর খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। দৃশ্যপটের ব্যাপক বদল হয়ে গেছে। নদীর পাড়ে বেশ খানিকটা জায়গা পর্যন্ত বিস্তৃত উঁচু বাঁধ। তখনও বাঁধ ছিল—মালতি সেই বাঁধে উঠে পড়ন্ত সূর্যের আলোয় স্কিপিং করছিল। সেই বাঁধ এখন নদীগর্ভে। বেশ কিছু জায়গায় বড়বড় বোল্ডার ফেলে নদীর ভাঙন ঠেকাবার চেষ্টা হয়েছে। আমি নিশ্চিত, আমাদের ছোটবেলার সেই জায়গাটা নদী গ্রাস করে ফেলেছে। একটু দূরে লাইটহাউসটা নদীর খানিকটা ভেতরে ঢুকে গেছে। চড়ুইভাতির সময় ডাঙ্গার ওপর হেঁটে হেঁটে আমরা লাইটহাউসটার সিঁড়িতে পৌঁছেছিলাম। কয়েক ধাপ উঠেও ছিলাম। সোহাগ খুড়ি চিৎকার করে বলেছিল, নেমে আয়, নেমে আয় পোড়োবাড়ি সাপখোপের আড্ডা। এখন লাইটহাউসটা পর্যন্ত নৌকো ছাড়া যাওয়াই শক্ত। তার ওপর এখন ভরা জোয়ার।

হঠাৎ সময়ের কথা মনে হতেই সৈকতাবাস হোটেলের দিকে হাঁটা দিলাম। হঠাৎ মনে হয়, মালতি যদি না আসে, তাহলে কি হবে। নদীর ধারে—চওড়া পিচ রাস্তার আশপাশে অজস্র লাউডস্পীকারের শব্দে কানপাতা দায়। চড়ুইভাতি করতে এখনও অনেকেই এখানে আসে। বেলা পড়ে আসছে, লটবহরে গুছিয়ে অনেকেই এখন ঘবের পথ ধরবে। বেশিরভাগই কলকাতার—দুয়েকটা ক্লাবের নাম লেখা ব্যানার দেখলাম—বেলেঘাটা

মানিকতলা, বাগুইআটির নানা সংঘ সম্মিলনীর রঙচঙা ব্যানার লাগানো রয়েছে ম্যাটাডোর ভ্যানে, ট্রাকে— সারি দেওয়া বাস, মিনিবাসে।

একটা চায়ের দোকানে এক ভাঁড় চা হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এত ভিড় কেন, আজকাল এত পিকনিক পার্টি আসে?

দোকানদার বলল, সবে তো শীতের শুরু, আসবেন বড়দিনে, ফাস্ট জানুয়ারিতে রাস্তায় হাঁটতে পারবেন না।

ভিড়ের প্রায় কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আমি সৈকতাবাস হোটেলের সামনের প্রবেশপথের মুখে মালতিকে খুঁজছিলাম। দেয়ালে আজ সন্ধের থিয়েটার শোয়ের বেশকিছু বিজ্ঞাপন— নজরে পড়ে এভাবে বোম্বের চিত্রাভিনেত্রী মিস সরিতার বিশেষ নৃত্যদৃশ্যের বিজ্ঞপ্তি। মালতি আসবেই ধরে নিয়ে আমি ভাবতে শুরু করলাম, মালতি যদি আসেও, এত ভিড়ের মধ্যে সে আমাকে বা আমি তাকে খুঁজে পাব কি করে?

প্রায় সাড়ে চারটের সময় মালতি এল, এবং আমাকে অবাক করে দিয়ে, সে আমাকে খুঁজে পেল। একেবারে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে বলল, আমি এসে গেছি।

বহু বহু যুগ আগের মালতি আমার সামনে দাঁড়িয়ে এখন। ঘন চুলের লম্বা দুটো বিনুনি বুকের ওপর দিয়ে কোমর পর্যন্ত। পাটভাঙা লাল শাড়ি, লাল ব্লাউজ, চোখে একটু ঘন করে কাজল দেওয়া, দুই ভুরুর মাঝে জ্বলজ্বল কাঁচাপোকাটিপ গলায় সরু সোনার চেন— হয়ত সেই চেনটাই, মানুপিসীর। অষ্টমী পুজোর সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে যাবে মালতি। বরদা ভবনে আমার ঘরে তখন আমি একা। মালতি বলল, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে সদাদা। আমার বিহ্বল চোখমুখ দেখেই মালতি এগিয়ে এল আমার নিঃশ্বাসের আওতায়। মুখের কাছে মুখ তুলে ধরে চোখ বুজল। মালতির ঠোঁট কাঁপছিল—ঠোঁটের ফাঁকে অল্প উঁচু সামনের কয়েকটা দাঁত দেখা যাচ্ছিল—আর এই ঘনিষ্ঠতায় আশ্চর্য— একমুঠো শেফালির ঘন গন্ধ সমস্ত ঘরে চারিয়ে যাচ্ছিল।

ঠোঁটের লিপস্টিক নষ্ট হবে বলে আমি আলতো করে, কাঁচপোকাটিপ বাঁচিয়ে মালতির কপালে আমার উষ্ণ ঠোঁট ছুঁইয়েছিলাম। আমার হাত ধরে নদীর পাড়ের দিকে যেতে যেতে মালতি বলল, এখন তো আমি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছি সদাদা, লিপষ্টিক নষ্ট হয়ে যাবে বলে তুমি ভয় পেও না। আমিও অনন্তকাল জীবনের প্রথম চুমুটা ফিরে পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি।

বেশ একটু আবেগ ছিল মালতির ধরা গলায়, আমার মনে হল, নাটক ছিল। আমি আমার হাতের মুঠোয় মালতির একটা হাত ধরে রইলাম। পশ্চিমদিগন্তে লাল আভা ছড়িয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আমি বললাম, আমাদের চড়ুইভাতির সেই পুরনো জায়গাটা আমি অনেক খুঁজেছি, পাইনি।

মালতি বলল, কটা পুরনো জিনিশ আর ফিরে পাওয়া যায় বল? বরদাকান্তর হীরের আংটিটা পাওয়া গেল? আমার মা তো পাগলই হয়ে গেল।

আমি বললাম, বটকৃষ্ণ নস্কর গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে তুমি জানো? কাগজে নাকি বেরিয়েছিল।

মালতি বলল বটা জেঠু কি খুঁজছিল বলতো।

আমি বললাম, হয়ত ওরমেয়ে প্রতিমাকে, আমার বাবা গণনাথকে—শেষদিকে তো এই দুয়ের ভরসাতেই বেঁচে ছিলেন তিনি। প্রতিমা একজন মাঝি মাল্লা না সারেংয়ের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল, তোমাকে বলেছিনা।

মালতি হঠাৎ আমার হাত ছাড়িয়ে নদীর প্রায় কিনারায় ছুটে গেল। আমি একটু হতচকিত।

বাচ্চা মেয়ের মত হাততালি দিয়ে দূরে আঙুল তুলে মালতি আমার দিকে ঘুরে তাকাল বলল, দ্যাখ দ্যাখ সদাদা সাদা রাজহাঁসের মত কী সুন্দর ছোট্ট একটা জাহাজ মোহানার দিকে ভেসে যাচ্ছে।

পশ্চিম দিগন্ত লালে লাল—আর সেই লালের ব্যাকড্রপের সামনে আশ্চর্য মায়াময় সাদা রঙের একটা ছোটোখাটো জাহাজ। মালতিকে বললাম আমাদের চড়ুইভাতির দিন, সেই কতকাল আগে ঠিক এই সময় গাধা বোট কলকাতার দিকে ভেসে যাচ্ছিল। বোটে অনেকগুলো মানুষ ছিল—খড়ের মানুষ। মালতি খানিকটা উত্তেজিতই, তোমার মাথাটা পুরোপুরি গেছে। ভাল করে তাকিয়ে দ্যাখ, সাদা রাজহাঁসের মত কী দূরন্ত গতিতে জাহাজটা ভেসে যাচ্ছে।

আমি বললাম, ওটা ক্যাটামেরন। মালতি বলল, সেটা কি?

আমি বললাম, ছোটোখাটো একটা লাক্সারি জাহাজ বোধহয়। হলদিয়া কলকাতা যাতায়াত করে। আজ রবিবার—হয়ত অন্য কোথাও যাচ্ছে প্রমোদ ভ্রমণে।

আশপাশের পরিবেশ ক্রমশঃ শান্ত হয়ে আসছে। দূর থেকে লাউডস্পিকারে হিন্দি গানের রেশ বাতাসে ভেসে থাকছে। আমি মালতিকে প্রায় বুকের মধ্যে টেনে নিলাম। বললাম—ক্যাটামেরন দেখতে হবে না। আরেকটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে। তখন তুইও আমাকে দেখতে পাবি না, আমিও তোকে দেখতে পাব না। মালতি তুই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাক, আমি তোর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

———